বাঙালীর
রাষ্ট্রচিন্তা
দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম খণ্ডের বিষয়সূচি

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা

দ্বিতীয় খণ্ড

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

জি. এ ই. পাবলিশার্স
কলকাতা-৭০০০০৬

BANGALIR RASTRACHINTA Vol. II

by **Sourendramohan Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮

জি. এ. ই. পাবলিশার্স-এর পক্ষে আনন্দ ভট্টাচার্য কর্তৃক
১৩ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত
এবং দ্য প্যারট প্রেস-এর পক্ষে অসীম সাহা
৭৬/২ বিধান সরণী, ব্লক কে-১, কলকাতা-৬
থেকে মুদ্রিত এবং ইস্টেন্ড ট্রেডার্স-এর
পক্ষে সলিল সাহা কর্তৃক
২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট,
কলকাতা-৯ থেকে
গ্রন্থিত

নি বে দ ন

সাধারণ কৌতূহল নিবৃত্তির প্রয়োজন ছাড়াও উচ্চশিক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে বাংলা ভাষায় পড়াশোনার চলন আজকাল বৃদ্ধি পেয়েছে। সেইসব বিষয়ের অন্যতম হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান। কিন্তু বাংলায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কে উভয় ধরনের চাহিদা মেটানোর উপযোগী বইয়ের অভাব এখনও রয়েছে। সেই চাহিদার সামান্য কিছুটা মিটিয়ে থাকে 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা' নামে এই বইটি।

১৯৬৮ সালে অর্থাৎ এখন থেকে বছর বাইশ আগে বইটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন এটি বিভিন্ন মহলে সমাদর পেয়েছিল। তাই নিঃশেষিত হতে বেশি সময় লাগে নি। বইটির স্থায়ী চাহিদা থাকায় নতুন সংস্করণের প্রস্তাব ওঠে; অন্যান্য মনীষীদের রাষ্ট্রচিন্তার অন্তর্ভুক্তির অনুরোধও থাকে। পরিবর্ধনের প্রধান সমস্যা ছিল প্রয়োজনীয় বইপত্রের অভাব। ক্রমে সে-সমস্যা কাটিয়ে উঠে আরো কয়েকটি নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজন করতে বেশ খানিকটা সময় চলে যায়। পরিবর্ধিত সংস্করণের কলেবর বৃদ্ধির দরুন ক্রেতাদের পক্ষে একসঙ্গে অনেকটা ব্যয়ভার বহনের সম্ভাব্য অসুবিধার কথা ভেবে বইটিকে দু'খণ্ডে প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়।

পরিবর্ধিত সংস্করণের প্রথম খণ্ড ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশনায় বিলম্ব ঘটায় ক্রেতাদের কাছ থেকে নিরন্তর তাগিদ আসে। তাতে অনুমান করি যে, প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত বিষয়গুলি অপেক্ষা দ্বিতীয় খণ্ডের ঘোষিত বিষয়গুলির চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশি।

প্রথম সংস্করণে বিষয় সংক্রান্ত যে-মুখবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেটি পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেজন্যে নতুন একটি মুখবন্ধ এই খণ্ডে অনাবশ্যক। আশা করা যায় আগ্রহী পাঠকেরা উভয় খণ্ড সংগ্রহ করবেন। দু'খণ্ডে প্রকাশের জন্যে প্রথম সংস্করণে ব্যবহৃত সাব-টাইটেল 'রামমোহন থেকে মানবেন্দ্রনাথ' বাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় এই খণ্ডে অতিরিক্ত দু'জন মনীষী—যথাক্রমে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বিনয়কুমার সরকারের রাষ্ট্রচিন্তা সংযোজিত হয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে বাংলায় ক্রয়লভ্য ও পূর্ণাঙ্গ কোনো বই নেই। পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পরিচ্ছেদই এই খণ্ডে অল্পবিস্তর পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে।

উভয় খণ্ডের উপকরণ সংগ্রহ ও লেখার কাজ অনেক কাল আগে থেকে প্রায় একসঙ্গেই শুরু করি। যাঁরা বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রথম খণ্ডেই স্বীকার করি। তার পরেও প্রয়োজনীয় আরো সাহায্য অন্য কারো কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই দিয়ে সহায়তা করেন শ্রীফণিভূষণ রায় ও

শ্রীদেবপ্রসাদ কড়ুরী। তাছাড়া বইপত্র যোগাড় করে দিয়েছেন শ্রীমতী বাণী চক্রবর্তী। মূল্যবান খোঁজখবর ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, শ্রীগণেশ ঘোষ ও 'পুরোগামী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমনোজ দত্ত।

বিভিন্ন যেসব গ্রন্থাগারের বইপত্র ব্যবহারের সুযোগ পাই তার মধ্যে নিজের পূর্বতন কর্মস্থল রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ছাড়াও রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির গ্রন্থাগারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আগের খণ্ডের মতোই এখণ্ডেরও অঙ্গবিন্যাসে এবং মুদ্রণের কাজে সাগ্রহ যত্ন নিয়েছেন জি. এ. ই. পাবলিসার্শের অন্যতম পরিচালক শ্রীআনন্দ ভট্টাচার্য। দ্য প্যারট প্রেসের শ্রীঅবনী সাহা প্রুফ পৌঁছিয়ে দেওয়ানেওয়ার কষ্টস্বীকার করেন। প্রুফ সংশোধনে আমার যথোচিত মনোযোগের অভাবে কয়েকটা ভুল রয়ে গেছে। যেমন ১৭৪ পৃষ্ঠায় উপসংহারের গোড়াতেই 'মানবজীবন' হবে 'মননজীবন'। বাকীগুলি তেমন গুরুতর নয়।

উল্লিখিত সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

এক আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী রাষ্ট্রচিন্তা

দুই. জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী ভাবনা

এক. আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী রাষ্ট্রচিন্তা

পরিপ্রেক্ষিত

মানবতাবাদ বা হিউম্যানিজম কথাটি ব্যাপক ও বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। নানা মত ও আদর্শের মানুষ মানবতাবাদী অভিধায় ভূষিত হন! মানবতাবাদ কারো কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন, যাতে ধর্ম ও ঈশ্বরের কোনো স্থান নেই; আবার কারো চোখে মানুষের প্রতি সদয়, সেবামুখী ও কল্যাণকর মানবিক আচরণ অর্থাৎ হিউম্যানিটারিয়ান মনোভাব প্রদর্শন হল মানবতাবাদ, যার পিছনে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে থাকে ধর্মীয় প্রেরণা। শুরুতে তাই দেখা দরকার যে মানবতাবাদ বলতে মোটামুটি সর্বগ্রাহ্য লক্ষণ কোনগুলি।

প্রথমত, মানবতাবাদ হল এমন এক বিশেষ মনোভঙ্গি যাতে সমাজজীবনের যাবতীয় বিষয়ের বিচারবিবেচনায় মানুষকেই করা হয় কেন্দ্রবিন্দু: মানুষের শক্তি, সত্তা ও গুণসমূহ প্রাধান্য পায়; অগ্রগণ্য হয় মানুষের ইহজীবনসর্বস্ব সুখস্বাচ্ছন্দ্য, আশা ও অভিলাষ। দ্বিতীয়ত, জীবজগতে মানুষের সহজাত অনন্য দুটি বৃত্তি, যথা যুক্তিবোধ ও সৃজনশীলতা মানবতাবাদী পরিবেশে পরিশীলন ও স্ফুরণের অবাধ সুযোগ পায়; বুদ্ধির চর্চা এবং চিন্তা ও কাজের স্বাধীন অবকাশ মেলে। তৃতীয়ত, মানুষের সহজাত বিভিন্ন যেসব কল্যাণকর আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতা মনুষ্যত্ব নামে অভিহিত সেগুলি মানবতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। বিবেক, সহনশীলতা, সম্প্রীতি, সমবেদনা, সহযোগিতা, সমতাবোধ ইত্যাদি মনুষ্যত্বের সেইসব দিকগুলি মানবতাবাদী পরিবেশে নিরন্তর প্রকাশ পায়।

উল্লিখিত লক্ষণগুলির নিরিখে বলা যায় যে মানবতাবাদ মানবসভ্যতার সমবয়সী এবং তা কোনো দেশ বা কালের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকে নি। সভ্যতার অগ্রগতি ও সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে মানবতাবাদ বিকশিত হয়ে এসেছে এবং সেটা আজ সভ্যতার আদর্শ হিসেবে বন্দিত।

দীর্ঘকাল ধরে মানবতাবাদের মধ্যে দুটি ধারা চলে এসেছে। একটি নিরীশ্বরবাদী এবং অপরটি হল ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক। নিরীশ্বরবাদীদের দৃষ্টিতে মানুষই হল সবকিছুর বিচারবিবেচনার মাপকাঠি এবং সে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজেই সে নিজের ভালমন্দের উৎস ও নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা। মানুষের নৈতিকতা ও যাবতীয় মূল্যবোধের উৎস হল তার সহজাত যুক্তিবোধ। মানুষের আদি ও অন্ত, ভাল ও মন্দ কোনো কিছুর পিছনে অশরীরী কোনো

শক্তি বা সত্তা কাজ করে না। অপরদিকে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদীরা মানবাতীত এক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে নেন। তাঁদের মতে সেই শক্তির অংশ হল মানুষ ও বিশ্বচরাচর এবং সেসবের মধ্যে দিয়ে ঐশ শক্তি বা সত্তার প্রকাশ ঘটে।

মানবতাবাদ ও মানবিকতাবাদ এক ব্যাপার নয়। অবশ্য দ্বিতীয়টি প্রথমটির একটি অংশ। অনুকম্পা ও করুণার উপর প্রতিষ্ঠিত মানবিকতাবাদের প্রবণতা পরোপকারের প্রেরণায় নিহিত থাকে। তাতে মানুষ হিসেবে মানুষের পূর্ণ মর্যাদা নেই। মানবিকতাবোধ স্বতঃপ্রণোদিত হতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচরণ তথা পুণ্য অর্জনের আশায় গড়ে ওঠে। তাহলেও মানবিকতাবাদেরও মহত্ত্ব সমধিক। মানবতাবাদের সঙ্গে তার বিরোধ নেই। অবশ্য মানবিকতাবাদী ব্যক্তি বিশেষের আচরণ ও মনোভঙ্গি মানবতাবাদের পরিপন্থী হতে পারে।

নিরীশ্বরবাদী মানবতাবাদ সভ্যতার অন্যতম আদি উৎসভূমি প্রাচীন গ্রীসেও যেমন ছিল, তেমনি ছিল প্রাচীন ভারতে। ইতিহাসের আদিপর্বে ধর্মেরও একটা প্রগতিশীল অর্থাৎ মানবতন্ত্রী ভূমিকা ছিল। কালক্রমে ইউরোপে চার্চের দাপটে ও ভারতে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্যে মানবতাবাদ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ইউরোপে মধ্যযুগ থেকে কয়েক শতকের রেনেসাঁস ও আঠারো শতকের বুদ্ধিবিভাসিত আন্দোলন অর্থাৎ এনলাইটেনমেন্ট-এর ফলে মানবতাবাদ তার আপন স্থান ও মহিমা ফিরে পায়। বিজ্ঞানের আনুকূল্যে মানবতাবাদ ধর্মতন্ত্রের আবেষ্টনী থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়, প্রতিষ্ঠা লাভ করে• মানুষের সার্বভৌমতা।

উনিশ শতকে বঙ্গদেশে যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তাকে অনেকে বঙ্গীয় রেনেসাঁস হিসেবে অভিহিত করেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অন্তত একটি লক্ষণ বঙ্গীয় রেনেসাঁসে কিছুটা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেটি হল প্রথমোক্ত স্থানের রেনেসাঁসী মানবতাবাদ। নবপ্রবর্তিত ইংরেজ শাসনসূত্রে পশ্চিমী শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গে মানবতাবাদী আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল। নিরীশ্বরবাদী ও আধ্যাত্মিক— উভয় ধারায় সেই আদর্শ প্রবাহিত হয়।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসে ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীরা ছাড়াও অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নিরশ্বরবাদীদের সংখ্যা ও প্রভাব ছিল কম। সমান্তরাল ধারায় রেনেসাঁসের অন্যান্য দিকপাল—রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা ধর্মের মধ্যে থেকেই ধর্মের নতুন মূল্যায়ন ও ধর্মের সাহায্যেই সমাজের প্রচলিত অকল্যাণকর বিষয়গুলি সংস্কারের প্রয়াসী হন। তাঁদের চিন্তাভাবনার মুখ্য উপাদান ছিল মানুষ। তাঁরা যে ধর্মচিন্তা করতেন সেটা যত না আনুষ্ঠানিক তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক।

কয়েক দশকের ব্যবধানে রামমোহন ও রামকৃষ্ণের অনুগামীরা যে-দুটি

ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত করেন, সাধারণভাবে তার প্রভাবে লোকের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে চেতনা পরিপুষ্ট হয়। তাঁদের ধর্মচিন্তা ধর্মতন্ত্রে পরিণত হয় নি। সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি ও অসহিষ্ণুতায় তাঁদের সায় ছিল না। গঠন-মূলক ও সেবামুখী কাজের মধ্যে দিয়ে নিম্নবর্গ মানুষের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসে কি বিবেকানন্দ, কি রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন লোকের মানবতন্ত্রী শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতাবোধের উন্মেষ ; এবং সেইসঙ্গে শান্তি, সম্প্রীতি ও সমানুভবতার বিস্তার। দেশ ও জাতিগত গণ্ডি অতিক্রম করে তাঁরা যথার্থই বিশ্বমানবতায় উপনীত হন। রাজনৈতিক আন্দোলনে সারা জীবন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থাকলেও রাষ্ট্রচিন্তায় তাঁদের অবদান অসামান্য।

স্বামী বিবেকানন্দ ॥ ১৮৬৩ – ১৯০২

বাঙালীর বিগত শতকের সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে অনেকে এককথায় বৈদান্তিক পুনর্জাগরণের কাল হিসেবে অভিহিত করেন। কথাটি কিছুটা বিতর্কমূলক হলেও দেখা যায় ঐ শতকের প্রথম দিকে লুপ্তপ্রায় বেদান্তচর্চার পুনঃপ্রবর্তনে রামমোহন তৎপর হয়েছিলেন। তাঁরই নিদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে শতাব্দীর শেষদিকে বেদান্তচর্চায় গতি সঞ্চার করেন স্বামী বিবেকানন্দ —ভগিনী নিবেদিতার দিনলিপি থেকে একথায় সায় পাওয়া যায়।[১] রামমোহন ও বিবেকানন্দের মধ্যবর্তীকালে বৈদান্তিক চেতনা ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ছাড়া আর কারো মনে বিশেষ প্রতিফলিত হয় নি। তত্ত্ববোধিনী সভার বিশিষ্ট সদস্য বিদ্যাসাগর বেদান্তের বিরোধী ছিলেন। রামমোহনের সেই প্রয়াসকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে স্বামী বিবেকানন্দই প্রকারান্তরে পরিপুষ্ট করেন। শতাব্দীর এই দুই প্রধান দিকপাল বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বেদান্তপ্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

বেদান্তপ্রচারে রামমোহন ও বিবেকানন্দ উভয়েরই অভিপ্রায় ছিল ধর্মের নবমূল্যায়নের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চেতনার সঞ্চার।[২] রামমোহন বেদান্তের সাহায্যে বহু দেবদেবী ও মূর্তিপূজার পরিবর্তে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন; শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে তিনি সমাজসংস্কারে উদ্যোগী হন। সমাজসংস্কারের তাগিদেই তিনি প্রথমে প্রচলিত ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের সংস্কার হওয়া প্রয়োজন বলে উপলব্ধি করেছিলেন। ধর্মীয় অনাচার ও প্রথাপীড়নকে তিনি রাজনৈতিক চেতনা ও দেশভক্তির অন্তরায় বলে মনে করতেন। অপরদিকে বিবেকানন্দ বেদান্তের মায়াবাদকে নবাগত পশ্চিমী ইহজীবনসর্বস্ব ভোগবাদী প্রবণতা ও বস্তুবাদী চিন্তার নিরসনকল্পে প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন। উপাদান প্রায় এক হলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। তবে উভয়ের বেদান্তপ্রচারের মূলে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য অস্বীকার করা যায় না। রামমোহনের সংস্কারপ্রয়াস ছিল আইন ও অনুষ্ঠানভিত্তিক। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ মানুষের চারিত্রিক বিকাশ ও বিদ্যাবুদ্ধির উৎকর্ষসাধনকে অধিক উপযোগী ও কার্যকর বলে মনে করতেন। এ-বিষয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুবর্তী ছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে জাতীয়তাবাদের যে-বীজ উপ্ত হয়েছিল তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল দেশের প্রাচীন ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত, নিজের সমাজ সম্পর্কে গৌরববোধ এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের

হিতসাধনার্থে নানাবিধ সংস্কারপ্রয়াস। সমাজ ও ধর্মের নব রূপায়ণচিন্তার সঙ্গে একই সূত্রে গ্রথিত স্বদেশাভিমান ক্রমে জাতীয় চেতনায় পরিবর্তিত হতে থাকে। রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বপ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে কেবল স্বদেশের প্রাচীন ভাবভাণ্ডারের উপর নির্ভর না করে প্রাগ্রসর প্রতীচীর চিন্তাসম্ভার থেকে দেশোপযোগী উপকরণের সন্ধান করেছিলেন। পরবর্তীকালে এদেশের বিদগ্ধমণ্ডলীর একটি শাখা বিদেশের পরিবর্তে স্বদেশের ভাবাদর্শেই বিশ্ববিজয়ে কৃতসংকল্প হন। এঁদের প্রথম ও প্রধান প্রবক্তা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি হিন্দুধর্মের সংমিশ্রণে জাতীয় চেতনাকে উগ্র রূপদান করেন। বেদান্তেই তিনি সমাজতান্ত্রিক মানবতার সূত্র খুঁজে পান। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের পথ পরিত্যাগ করে যুগোপযোগী গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি সারা বিশ্বে হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তারের আদর্শে দেশের মৃতপ্রায় জনমনকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বিবেকানন্দের এই ভূমিকাকে বিশ্লেষণ করে মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> His nationalism was a spiritual imperialism. He called on young India to believe in the spiritual mission of India...on which was subsequently built the orthodox nationalism of the de-classed young intellectuals, organized into secret societies advocating violence and terrorism for the overthrow of British rule.[৩]

সমকালীন শিক্ষিত যুবমানস তাঁর এই আধ্যাত্মিক বিশ্ববিজয়ের আদর্শে উদ্দাম হয়ে ওঠে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকেই তারা ছিল নিরতিশয় বিড়ম্বিত। এই দুর্দশার জন্যে তারা সমাজব্যবস্থাকেই দায়ী বলে মনে করত—যে-ব্যবস্থার মূলে তারা দেখেছিল বিদেশী শাসকদের অবস্থিতি। বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিদ্রোহী যুবসম্প্রদায়ের মনে একাধারে আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র স্বাজাত্যাভিমান দেখা দেয়। সে চেতনার পিছনে সমাজের গতিপ্রবাহের সঠিক প্রত্যয় যত-না ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল রাজনৈতিক নৈরাজ্যবাদ আর অস্বচ্ছ সমাজতান্ত্রিক ভাবাবেগ। ফলে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের পরিবর্তে প্রাচীন আধ্যাত্মিক গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসই প্রাধান্য লাভ করে। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে অপরিসীম ত্যাগ ও ঐকান্তিকতায় তাঁরা জনমানসে যে আত্মপ্রত্যয় ও প্রাণশক্তির সঞ্চার করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে দেশের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানকে গতিসম্পন্ন করে তোলে। বিবেকানন্দের ভাব-ভূমিতেই জন্ম নিয়েছিল চরমপন্থী বিপ্লবী কর্মতৎপরতা।

ছোটবেলা থেকেই সাধুসন্ন্যাসীদের জীবনে তাঁর এক বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মানসিক গঠনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ ও আদর্শবাদী। তাঁর ছাত্র-জীবনকালে দেশের জাতীয় আন্দোলন ক্রমে দানা বেঁধে উঠেছিল। নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান ও 'স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনে' সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতামালা তাঁর মনে জাতীয় আবেগ সঞ্চার করে। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াতসূত্রেই তিনি রামমোহনের বৈদান্তিক আদর্শ, দেশপ্রেমিকতা ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যচিন্তায় অনুপ্রাণিত হন।

তিনি ছিলেন দর্শন ও আইনের ছাত্র। আর্থিক অসচ্ছলতা আর আধ্যাত্মিক অন্তর্জ্বালা তাঁর শিক্ষায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ঐ সময়ে তাঁর এক মানসিক রূপান্তর চলেছিল; সেকথা তাঁর সতীর্থ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের লেখায় জানা যায়—

> ব্রাহ্মসমাজের বহির্বর্তী অংশ থেকে তিনি যে বালসুলভ আস্তিকতা এবং সহজ আশাবাদ অর্জন করেছিলেন, জন স্টুয়ার্ট মিলের *Three Essays on Religion* তাতে বিপর্যয় এনে দিল। সৃষ্টির হেতুবাদী এবং উদ্দেশ্যাভিত্তিক ব্যাখ্যা তাঁর কাছে খড়কুটোর মত নির্ভরের অযোগ্য হয়ে উঠল। তিনি প্রকৃতি ও মানবের মধ্যে অমঙ্গলের অস্তিত্বের সমস্যায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলেন।[৪]

হিউমের সন্দেহবাদ (Scepticism) আর স্পেনসারের অজ্ঞাবাদ (Agnosticism)-এর পরিচয় লাভ করে তাঁর দার্শনিক সংশয় ক্রমশ সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। সম্ভবত ঈশ্বর-বিবর্জিত বস্তুতন্ত্রী মুক্তির প্রত্যয় তাঁর মনে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়ে ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে তিনি তাঁর অন্তর্বিরোধের কথা প্রকাশ করলেন। "বলে গেলেন সংশয়ের যন্ত্রণার কথা, নিত্যবস্তু সম্বন্ধে স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হতে না পারায় নৈরাশ্যের কথা।"[৫] ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনি "শেলীর প্রজ্ঞাময় সৌন্দর্যতত্ত্বের বন্দনা, নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বপ্রেমের তত্ত্ব এবং গৌরবদীপ্ত চিরাশ্রয় মানবসমাজের ভাবদর্শন"[৬] পাঠ করলেন। ফলে ব্রহ্মাণ্ড তাঁর কাছে নিষ্প্রাণ, নিষ্করুণ যন্ত্রের মতো হয়ে রইল না, তিনি তার মধ্যে অনুভব করলেন জাগ্রত আধ্যাত্মিক ঐক্যবোধ। ব্রজেন্দ্রনাথের পরামর্শেই তিনি 'সার্বিক হেতুরূপী (Universal Reason) পরব্রহ্মের অদ্বয়তত্ত্বের' অনুধ্যান করলেন। ফলস্বরূপ সংশয়বাদী ও বস্তুতন্ত্রী মনোভাব তাঁর কেটে গেল। কিন্তু তাতেও তাঁর অনুভূতিপ্রবণ, স্পর্শকাতর মন তৃপ্ত হল না। মরমী বোধের তাগিদে তিনি একজন আচার্য বা গুরুর সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হয়ে পড়েন। কারণ "তাঁর স্বভাবধর্ম গ্রন্থ থেকে আহরণ করার চেয়ে অন্য জীবনের সহযোগ থেকে ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহের পক্ষপাতী" ছিল।[৭]

মনের অতৃপ্তি নিবারণের তাগিদে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন। কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যেও এসেছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের

কোনো তত্ত্বেই তাঁর মন ভরে নি। অবশেষে তিনি "আদর্শের দেহগত বাস্তবতা, সত্যের প্রত্যক্ষতা এবং পরিত্রাণশক্তির সম্ভাব্যতা'-এর[৮] হদিশ পেলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। প্রথমাবস্থায় সেখানেও তাঁর দ্বন্দ্বসংশয়ের নিরসন হয় নি। গুরুর সান্নিধ্যলব্ধ মানসিক প্রশান্তিও তাঁর কাছে মনে হয় যেন মায়া। অনেক পরে অবশ্য তাঁর সংশয় দূরীভূত হয়—"ধীরে এবং অলৌকিক শক্তির প্রশান্ত উন্মোচনের আশ্বাসে"।

কলেজের পড়াশোনা তাঁর অসমাপ্ত থেকে যায়। রামকৃষ্ণের মৃত্যুর (১৮৮৬) পরে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে উত্তর ভারত পর্যটনে যান। শিকাগো ধর্মসম্মেলনে (১৮৯৩) যোগদানের পূর্বাবধি পরিব্রাজকরূপেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে। ভারতের মাটি ও মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ বিবেকানন্দের অভিজ্ঞতা ও মননশক্তির পরিপুষ্টিসাধন করে। পরিব্রাজকজীবনে তিনি যেমন জ্ঞানঋদ্ধ বহু মনীষার সংস্পর্শে এসেছিলেন, তেমনি অনেক রাজন্যবর্গের সখ্যতাও লাভ করেন। অধ্যয়ন ও ধর্মচিন্তার সঙ্গে যুগপৎ রাজনৈতিক অভিলাষও তাঁর মনে উঁকিঝুঁকি মারে। সিস্টার ক্রিষ্টিনকে তিনি ঐ সময়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> বিদেশী শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য আমি ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে একটি শক্তি জোট তৈরী করতে চেয়েছিলাম। সেজন্যই আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছি। সেজন্যই আমি বন্দুক নির্মাতা স্যার হাইরাম ম্যাক্সিমের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম। কিন্তু দেশের কাছ থেকে আমি কোন সাড়া পাই নি! দেশটা মৃত।[৯]

শিকাগোর বিশ্বধর্ম সম্মেলনে যোগ দিতে যাবার পথে স্বামীজী প্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করেন। সতেরো দিন ধরে অনুষ্ঠিত ঐ সম্মেলনের উদ্বোধন অধিবেশন ও বিভাগীয় অধিবেশনগুলিতে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতাগুলিতে এ কথাই সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে—ধর্ম নয়, রুটিই ভারতীয়দের সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

বিবেকানন্দের আমেরিকাযাত্রার পিছনে ধর্মপ্রচারের অভিপ্রায় যত না ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তাগিদ। দেশবাসীর দুঃখদুর্দশা মোচনের উপায় অনুসন্ধানের জন্যই প্রধানত তিনি বিদেশের পথে পাড়ি দেন। স্বামী অখণ্ডানন্দ তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় লিখেছেন যে স্বামীজি আমেরিকাযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে বলেছিলেন—

> দেখ ভাই, এ দেশে যে রকম দুঃখ-দারিদ্র্য, এখানে এখন ধর্মপ্রচারের সময় নয়। যদি কখনও এদেশের দুঃখদারিদ্র্য দূর করতে পারি, তখন ধর্মকথা বলব। সেইজন্য কুবেরের দেশে যাচ্ছি; দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।[১০]

বেদান্ত প্রচারের কোনো অভিপ্রায় তখন তাঁর ছিল না। বিশ্বধর্ম সম্মেলন শেষ হলে তিনি মার্কিনদেশ পরিক্রম করেন। তাঁর ঐসময়কার বক্তৃতাগুলি থেকে

যে বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তা সেখানকার এক সংবাদপত্রের মন্তব্যে বোঝা যায়—

His patriotism was perfervid. The manner in which he speaks of 'My Country' is most touching. That one phrase revealed him not only as a monk but as a man of his people.[১১]

কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর রাজনৈতিক প্রবণতাকে সেসময়ে সযত্নে দমন করেন। প্রথম দিকে তাঁর যেটুকু দ্বিধা ছিল পরে তা সম্পূর্ণ কেটে যায়। ধর্মপ্রচারের পথই তিনি বেছে নেন। এবিষয়ে একটি চিঠিতে স্পষ্টতই লিখেছেন—

I am no political agitator. I care only for the spirit. So you must warn the Calcutta people that no political significance be ever attached falsely to any of my writings or sayings.[১২]

মার্কিন দেশ সফরের পর (১৮৯৫) তিনি লন্ডনে চলে যান। সেখানেও বহু সভায় বক্তৃতা দেন। একটি বৈঠকে মিস মার্গারেট নোবলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। ইনি পরে স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁরই দেওয়া নিবেদিতা নামে পরিচিতি লাভ করেন। ধর্মপ্রচার ও সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার সঙ্গেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিবেদিতার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা সমধিক উল্লেখযোগ্য। মাস তিনেক পর স্বামীজি লন্ডন থেকে আমেরিকায় ফিরে যান এবং সেখানে একটি বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। ঐ বছরেই স্বদেশে ফেরার পথে লন্ডনে কিছুকাল থেকে বিভিন্ন সভায় ভারতের ধর্ম, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বহু বক্তৃতা করেন। ইত্যবসরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পর্যটনকালে জার্মানদেশীয় প্রখ্যাত ভারততাত্ত্বিক মাক্স ম্যুলার ও কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পণ্ডিত ও দর্শনের অধ্যাপক ডয়সেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। লন্ডনেও তিনি একটি প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করেন।

১৮৯৭ সালে ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে কলোম্বো এবং দক্ষিণ ভারতের পথে তিনি কলকাতায় উপনীত হন। সর্বত্রই তিনি বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। কলকাতায় ফিরে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাই হয় তাঁর প্রধান কাজ। মিশন স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল—

১ জনসাধারণের মানসিক ও বৈষয়িক কল্যাণসাধনের উপযোগী শিক্ষাদানের জন্য কর্মীদের শিক্ষিত করে তোলা ; ২ শিল্প ও কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষাদান ; ৩ জনসাধারণকে বেদান্ত ও ধর্মচিন্তায় উৎসাহিত করা ;[১৩] মিশনের কর্মসূচী প্রসঙ্গে একথা স্পষ্টই বলে দেওয়া হয়—

The aims and ideals of the Mission being purely spiritual and humanitarian, it shall have no connection with politics.[১৪]

১৮৯৮ সালের ৯ ডিসেম্বর মিশনের প্রধান দপ্তর বেলুড় মঠে স্থাপিত হয়। প্রচারকার্যের সুবিধার্থে স্বামীজি আলমোড়া থেকে নবপর্যায়ে 'প্রবুদ্ধ ভারত' (১৮৯৯), কলকাতা থেকে 'উদ্বোধন' (১৮৯৯) এবং মাদ্রাজ থেকে 'ব্রহ্মবাদিন'

(১৮৯৫) নামে তিনটি সাময়িকপত্র প্রকাশনার ব্যবস্থা করেন। অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠাও এইসময়ে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

মিশন প্রতিষ্ঠার পর সমাজসেবাই হয় তাঁর প্রধান কাজ। কিন্তু তাতে তাঁর একদল গুরুভাই আপত্তি তুললেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলতে শুনেছেন যে প্রচার, অত্যধিক অধ্যয়ন ও শাস্ত্রপাঠ এবং সেবাকার্য না করে ধ্যান ও প্রার্থনার মধ্যে ঈশ্বরভক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। সেইসব কর্মীরা অভিযোগ করেন যে বিবেকানন্দের দেশব্যাপী সাংগঠনিক প্রচেষ্টা, জনসেবা, সমাজোন্নয়ন ও দেশপ্রেমিকতার মনোভাব তাঁর পাশ্চমী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণেরই কুফল; অথচ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আধ্যাত্মিক মুক্তিকামীদের কেবল ভক্তির পথ প্রদর্শন করেছেন। স্বামীজির সঙ্গে গুরুভাইদের এবিষয়ে তীব্র বাদানুবাদ দেখা দেয়। উত্তেজিতভাবে তখন তাঁকে একথা বলতে শোনা যায়—

> I am not a servant of Ramakrishna or any one, but of him only, who serves and helps others, without caring for his own Mukti [১৫]

এ-বিতর্ক অবশ্য বেশি দূর গড়ায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণেরই নাকি নির্দেশ ছিল বিবেকানন্দের মতামত মেনে নেবার। এই ঘটনায় তাঁর জ্ঞান ও ভক্তির উভয়মুখী ধারার সমন্বয়ে জীবসেবার আদর্শ লক্ষ করা যায়।

বিবেকানন্দ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানমার্গকেই শ্রেয় মনে করতেন। এই চিন্তার পিছনে সেই একই অনুভূতি অর্থাৎ ঈশ্বরানুরাগ অপেক্ষা দেশ ও দশের প্রতি গভীর ভালবাসাই ছিল প্রবল। নতুন শক্তি ও আদর্শে দেশ গঠনের তাগিদেই তিনি ভক্তির পথ অনুসরণ না করে জ্ঞানের পথ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। নির্গুণ অদ্বৈতবাদের কার্যকারিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

> সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাসবান হইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব প্রেমের উচ্ছ্বাস হয়, তাহা আমি জানি। বিভিন্ন সময়ের প্রয়োজনানুসারে লোকের উপর ভক্তির প্রভাব ও কার্যকারিতার বিষয় আমি সবিশেষ অবগত আছি। কিন্তু আমাদের দেশে এখন আর কাঁদিবার সময় নাই—এখন কিছু বীর্যের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এই নির্গুণ ব্রহ্মে বিশ্বাস হইলে—সর্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জিত হইয়া 'আমিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম' এই জ্ঞানসহায়ে নিজের পায়ের উপর নিজে দাঁড়াইলে হৃদয়ে কি অপূর্ব শক্তির বিকাশ হয়, তাহা বলা যায় না।[১৬]

মাতৃভূমির দুর্দশায় বিবেকানন্দ সদাই এক তীব্র অন্তর্জ্বালা অনুভব করতেন। তাই সবকিছুর উপরে তিনি জনসেবাকে স্থান দিয়েছিলেন। মানুষের সেবা করতে হলে, এমনকি রাজনীতি করতে হলেও একটা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে নিজেকে যে যুক্ত রাখতেই হবে সেকথায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। কংগ্রেস প্রসঙ্গে একাধিক উক্তিই তাঁর সে-চিন্তার প্রমাণ। অবশ্য দলীয় রাজনীতি

তাঁর সময়ে তেমন সুস্পষ্টরূপ নেয় নি। নিজেও তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চাইতেন। কারণ তিনি চাইতেন মানুষের প্রকৃত কল্যাণ ক্ষমতা দখল নয়।

১৮৯৭ সালে মে মাসে তিনি প্রচারের কাজে ভারত পরিক্রমণে যান। মিশনের সাংগঠনিক কাজও সেইসঙ্গে চলতে থাকে। পরের বছর অক্টোবরে কলকাতায় ফিরে আসেন। ১৮৯৯ সালে তিনি দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাত্রা করেন। পথিমধ্যে লন্ডনে দু'সপ্তাহ কাটিয়ে কালিফোর্নিয়ায় উপনীত হন। সেখানে তিনি বেদান্ত শিক্ষার একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। ওকল্যান্ড এবং আলামেডাতেও দুটি কেন্দ্র স্থাপন করেন।

আমেরিকায় ব্যস্ততার মধ্যে বছর খানেক কাটিয়ে তিনি প্যারিসে Congress of the History of Religions (প্যারিস প্রদর্শনী নামে পরিচিত)-এর অধিবেশনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে তিনি দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। শালগ্রামশিলা ও শিবলিঙ্গের প্রচলিত যৌন প্রতীক প্রত্যয়ের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখায় জানা যায় যে স্বামীজির সঙ্গে এইসময়ে রুশ বিপ্লবী ক্রপটকিনের সাক্ষাৎ ঘটে। সেসময়ে প্লেখানভ ও লেনিনের দল খুবই সক্রিয় ছিল—তবে স্বামীজির সঙ্গে তাঁদের সংযোগের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।[১৭]

ফ্রান্সে তিনমাস কাটিয়ে তিনি গ্রীস, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশ পর্যটন করে ১৯০০ সালে বেলুড়ে প্রত্যাবর্তন করেন। দেহ ও মনে তখন তাঁর তীব্র ক্লান্তি ও অবসাদ। দুটি বিষয়ে মন তাঁর অস্থির। প্রথমত, জাগতিক বিষয়ে এক তীব্র অনাসক্তি দেখা দিয়েছিল ; জীবনের উপরও তেমনি বিতৃষ্ণা। মিশনের সভাপতি পদ থেকে তাই তিনি ইস্তফা দেন। দ্বিতীয়ত, আমেরিকায় প্রথম বারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় সেখানকার সাম্য, গণতন্ত্র ও ক্রমবর্ধমান বৈষয়িক শক্তি ও উন্নতি প্রত্যক্ষ করে তিনি যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন তা তাঁর দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়বারের ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় তিনি সেখানকার হিংসা, লালসা, শক্তিমত্ততা ও বেনিয়া মনোবৃত্তি প্রত্যক্ষ করেন। তাদের জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ এবং সামাজিক অনাচার তাঁকে ব্যথিত করে।[১৮] স্বাস্থ্য তাঁর আগেই ভেঙে পড়েছিল, সেইসঙ্গে ভগ্ন মন নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তবু তাঁর কর্মব্যস্ততা কিছুমাত্র কমে নি।

বন্ধু সেভিয়ারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্বামীজি বেলুড় থেকে মায়াবতী চলে যান। সেখান থেকে যান পূর্ববঙ্গ ও আসাম পর্যটনে। এই সময়ে তিনি এক সভায় দেশের যুবশ্রেণীকে লক্ষ করে বলেছিলেন—

> you will be nearer to Heaven through football than through the study of the Gita।[১৯]

তাঁর মতে ধর্মচর্চার পূর্বে স্বাস্থ্যচর্চা অধিকতর প্রয়োজন।

শরীরের অবস্থা তাঁর ক্রমেই অবনতির দিকে যায়। মানসিক যন্ত্রণারও উপশম হয় না। কিন্তু কাজকর্ম ও আলাপআলোচনা অব্যাহত থাকে। মাস কয়েক বেলুড়ে বিশ্রাম নেন। এই সময়ে জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ও দার্শনিক কাউন্ট ওকাকুরা (১৮৬২-১৯১৩) স্বামীজিকে টোকিওতে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন। রাজনৈতিক চিন্তায় নিবেদিতার মতো তিনিও ছিলেন একজন বিপ্লবী। বাংলার সমসাময়িক বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে তাঁরও বিশেষ সংযোগ ঘটে। তাঁর ইচ্ছা ছিল টোকিওতে শিকাগো ধর্মসম্মেলনের মতো একটি সম্মেলনের আয়োজন করা। কিন্তু স্বামীজির শরীরস্বাস্থ্য তখন সম্পূর্ণ প্রতিকূল। ওকাকুরার অনুরোধে স্বামীজি তাঁর সঙ্গে বেনারস ও বুদ্ধগয়ায় যান। শরীরের উন্নতি না হওয়ায় বেলুড়ে ফিরে আসেন। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তার জীবনাবসান হয়।

দর্শনচিন্তা

বিবেকানন্দের দর্শনে ভারতের শ্রেষ্ঠ দুজন দার্শনিকের চিন্তার সংমিশ্রণ লক্ষ করা যায়। একজন শংকর, অপরজন বুদ্ধ। শংকরের মায়াবাদ তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। বুদ্ধের চিন্তা স্বামীজিকে পুরোপুরি প্রভাবিত না করলেও বুদ্ধের বৈশ্বিক মানবতা তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলো। বিবেকানন্দের উপর শংকরের প্রভাব মূলত দর্শনগত; পক্ষান্তরে বুদ্ধের প্রভাব ছিল ব্যবহারগত। বিশ্বপ্রপঞ্চের স্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞানের সন্ধান তিমি শংকরের দর্শন থেকে পান। অন্যদিকে বুদ্ধের চিন্তাকে তিনি ব্যবহারিক দিক থেকে গ্রহণ করেন—অর্থাৎ ইহজীবনে মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ।[২০] বিবেকানন্দের হৃদয় ছিল বুদ্ধের, আর মস্তিষ্ক শংকরের।

বিবেকানন্দ নিজস্ব কোনো দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন নি। শংকরের বেদান্তকেই তিনি হৃদয়গ্রাহী করে প্রচার করেছেন; মায়াবাদের ভাষ্য রচনা করেছেন। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বিবেকানন্দের বৈদান্তিক চিন্তা একটি মৌল ও নতুন দিকের সন্ধান দেয়। মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুময় বিশ্ব যেখানে অসার ও অর্থহীন, সেখানে মানবিক প্রবৃত্তি, সমাজসেবার প্রয়োজন ইত্যাদিও অনুরূপ অর্থহীন—তাহলে বিবেকানন্দের চিন্তা ও কাজের সঙ্গতি কোথায়? কেন তাঁর মধ্যে হৃদয় ও মস্তিষ্কের এই সংঘাত?

মায়াবাদ সম্পর্কে সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। বস্তুত এই ছোট্ট বিবৃতি থেকে বিষয়টির পরিপূর্ণ অর্থ ব্যক্ত হয় না। মায়াবাদের অর্থ এই নয় যে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহুবিশ্লিষ্ট ও

বহুসমন্বিত দুনিয়াটা সর্বৈব মিথ্যা—সেটাও সত্য, তাতেও ব্রহ্ম বিরাজ করেন। দেখার ভ্রমেই কেবল তাকে বহুরূপ ও বৈচিত্র্যে দেখা হয়। বিশ্বপ্রপঞ্চ মিথ্যা নয়, ব্রহ্ম ও বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিচ্ছেদ্যভাবে একই—ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে জগতের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না।[২১] দর্শনের বাতবিতণ্ডায় বিষয়টি বরাবরই অত্যন্ত জটিল।

আপাতদৃষ্টিতে বিশ্ব অসংখ্য অসম্পৃক্ত বহুর সমন্বয় মাত্র। কণাদ, ও গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস তাঁদের আণবিক তত্ত্বে বিশ্বকে বিশ্লেষণযোগ্য অণুর সমষ্টিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। দীর্ঘদিনের জ্ঞানের আলোয় মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে যে দৃষ্টিগতভাবে যা বহু ও বিচিত্র তা মূলত এক সুসংবন্ধ, সুনিয়মিত ধারায় সমন্বিত। এই অভিজ্ঞতা মানুষকে এক নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে—যার মর্ম হল বিশ্ব বহুকে নিয়ে এক ও অখণ্ড। সে-একত্ব জ্যামিতিক সরলরেখায় রচিত নয়, বক্রজটিল পথে ঐক্যবন্ধ।[২২] তার মধ্যে বহুত্ব লুক্কিত হলেও সেই বহুত্বের মধ্যে সুসংবন্ধ অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। প্রথমোক্ত বহুবাদ ও শেষোক্ত বিশিষ্ট জটিল একবাদ যাকে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ বলা হয়, তা শংকরের অদ্বৈত প্রত্যয় থেকে ভিন্ন। শংকরের মতে বিশ্ব একটি অখণ্ড সত্তা—তার মধ্যে কোনো ভাঙাচোরা নেই। সেই সত্তাকেই তিনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপে অভিহিত করেছেন—যার প্রকৃতি হল চিৎশক্তিবিশিষ্ট। সেই চেতনা বা চিন্ময়রূপ নির্বিশেষ ও নিত্য বিরাজমান। সেই চিন্ময়, অবিভাজ্য ও একক সত্তাকে বহু ও বিচিত্ররূপে আমাদের কাছে তুলে ধরে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি। সেগুলি সত্তার যে পরিচয় বহন করে তা অলীক ও ভ্রান্ত। প্রকৃত রূপ থেকে এই ভিন্নরূপে দেখাকেই মায়া বলা হয়। যেমন স্বপ্ন দেখা, কিংবা মরীচিকাকে জল মনে করা—তবে তাও যে ভিত্তিহীন বা সম্পূর্ণ অবাস্তব তা নয়—তার ভুল ব্যাখ্যা করা হয় মাত্র। যা নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে এক তাকে বহুরূপে বিকৃত ও বিচিত্ররূপে দেখার কারণ এক বিশেষ শক্তির ক্রিয়াশীলতা। লাঠি জলে ডোবালে বাঁকা দেখায়—তার কারণ আর কিছু নয়, জলের মধ্যে আলোকে বিকৃত করার শক্তি থাকায় জলই এই বিভ্রম ঘটায়। উপলব্ধি যদি ভ্রান্ত হয় তাহলে তার পিছনে থাকে ভুল ব্যাখ্যা। যে-শক্তির বলে একক ব্রহ্ম বহুধা বিভক্ত হয়ে আমাদের কাছে পরিদৃশ্যমান হয় তাকেই শংকর মায়া বলেছেন।[২৩] শংকরের অদ্বৈত বেদান্তকেই বিবেকানন্দ নানাস্থানে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন।

অদ্বৈতবাদের মূল প্রত্যয় ত্রিবিধ: এক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি সত্তাই বিরাজমান, যিনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, দুই, তিনিই জ্ঞাতা—তাঁর কোনো রূপ ও নাম নেই; তিন, বহুরূপে ও নামে যা আমাদের কাছে সদাই দৃশ্যমান তা সর্বময় ব্রহ্মের মধ্যেই আশ্রিত, ভিন্নরূপে স্বপ্নের মত দেখার কারণ হল মায়া। মায়াবাদকে বিবেকানন্দ বিজ্ঞানসম্মতভাবেই দেখেছেন। তাঁর মতে বিশ্ব যদি

অবিমিশ্র একই সত্তায় গঠিত হয়ে থাকে তাহলে ইন্দ্রিয়লব্ধ বহুত্বের ধারণা মায়া ছাড়া আর কিছু নয়।[২৪]

এবার বিবেকানন্দের দর্শনে ব্যবহারিক দিকটা দেখা যাক। আগেই বলা হয়েছে যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীর কাছে সংসারের প্রতি দৃষ্টিদান, মানুষের দুঃখ মোচনের চিন্তা প্রভৃতি মায়াবাদী দর্শনের বিরোধী মনে হতে পারে। এখানে যেন যুক্তিবোধ ও হৃদয়দৌর্বল্যের এক বিরাট দ্বন্দ্ব।

বিবেকানন্দ এই সিদ্ধান্তেই পেঁৗছেছিলেন যে যখন জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রকাশ তখন সকলেই আপনজন। "ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইব" বলে তিনি অনুভব করেন। ঈশ্বর সকল বস্তুতেই ছড়িয়ে বিরাজ করেন; সর্ববস্তু ও জীবেই ঈশ্বর আছেন এবং মানুষের কাছে তিনি মানুষরূপেই প্রকাশমান। এ-তত্ত্ব বেদান্তেরই। বেদান্তে সত্তাকে তিন ভাবে দেখা হয়েছে, যথা: ১ প্রাতিভাসিক অর্থাৎ বাস্তব না হয়েও বাস্তবরূপে প্রতীয়মান, যেমন স্বপ্ন দেখা; ২. ব্যবহারিক অর্থাৎ অবাস্তব অথচ সাংসারিক বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মূল্য আছে এমন; ৩. পারমার্থিক, অর্থাৎ পরম সত্য বা ব্রহ্ম সংক্রান্ত—যেটা ব্যবহারিকের বিপরীত। সাধারণ মানুষের পারমার্থিক চেতনা বিশেষ দেখা যায় না।[২৫] শংকর তাই ব্যবহারিক জীবনে বেদবিহিত পন্থা অনুসরণের নির্দেশ দেন। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ মানুষের নিষ্কাম কর্ম ও সেবাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এখানে আরও উল্লেখ্য যে হিন্দুদর্শনের ন্যায়শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে সত্যের স্তরভেদ আছে—ব্যক্তিমানুষের ধীশক্তি অনুযায়ী তা ক্রমশ উন্মোচিত হয়। তদনুযায়ী স্বামীজিও মনে করতেন যে জানার অধিকার সকলের সমান নয়।

বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদরবৃত্তির সমন্বয় সাধন করে বিবেকানন্দ আরও দেখিয়েছেন যে বুদ্ধির দ্বারাই হৃদয়ের পরিমার্জন তথা মানবিক মূল্যবত্তার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি দেখা দিলে বৈশ্বিক কল্যাণবোধ স্বতঃই সঞ্চারিত হয়।[২৬] বুদ্ধের প্রেম, প্রীতি ও করুণার বাণীকে তিনি শংকরের অদ্বৈত প্রত্যয়ে সংমিশ্রিত করেন।

ইতিহাসচিন্তা

অদ্বৈত বেদান্তে বিশ্বাসী বিবেকানন্দের উপর সাংখ্যের প্রভাবও কম ছিল না। তিনি মনে করতেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ধারা নিয়তই প্রবহমান, তার আদি বা অন্ত নেই। পশ্চাতে আছে তিনটি সত্তা। প্রথমটি হল অসীম ও পরিবর্তনশীল প্রকৃতি। সমগ্র প্রকৃতি অনাদি ও অনন্ত, কিন্তু তার ভিতরে চলে বিবিধ পরিবর্তন। দ্বিতীয়ত আছেন ঈশ্বর, অপরিবর্তনীয় শাস্তা। তৃতীয়ত

আছে আত্মা, যা ঈশ্বরের মতোই অপরিবর্তনীয় ও শাশ্বত ; কিন্তু সেই শাস্তার অধীন। ঈশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কার্য, কারণ ও উপাদান।[২৭] বিশ্বের বিকাশ ও অভিব্যক্তির কর্তা ঈশ্বরের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে যেন বিশ্ব প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। কারণবিহীন সৃষ্টিশক্তি নিয়তই ক্রিয়াশীল এবং মন ও বাহ্য প্রকৃতির গতি একই নিয়মে নির্দিষ্ট। অখণ্ড বিশ্ব ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জড়রূপে, বুদ্ধির মাধ্যমে জীবরূপে এবং আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃতি ও জীবের বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় আত্মা বিকাশ লাভ করে। নিম্নতম পর্যায় থেকে মানব পর্যন্ত আত্মা নিজের বিকাশ সাধন করে চলে।[২৮] বিবর্তনের সমগ্র প্রক্রিয়ায় আত্মা নিজেকে ব্যক্ত করার জন্য সংগ্রাম করে। সে সংগ্রাম প্রকৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম। প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে নয়, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই মানুষ বর্তমান অবস্থা লাভ করেছে। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা বা তার অনুগত না থেকে মানুষের এই নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামই হল প্রগতি। মুক্তিপ্রবণতাই আত্মার শ্রেষ্ঠ লক্ষণ—সে চায় অনন্ত মুক্ত সত্তার উপলব্ধি।[২৯]

অতীন্দ্রিয়বাদী হিসেবে তিনি পরব্রহ্মের অঙ্গীভূত আত্মার গতিপ্রকৃতির দিক থেকে সবকিছু বিচার করেছেন। বৈদান্তিক দৃষ্টিতেই তিনি সভ্যতার ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে প্রাচীন ভারতের সমাজব্যবস্থায় দ্বান্দ্বিক প্রণালীতে (dialectical) শ্রেণী সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণরা ছিলেন সনাতন ধর্ম ও দর্শনের রক্ষক। দৃষ্টিতে তাঁরা ছিলেন রক্ষণশীল। শাস্ত্রীয় অনুশাসনে বাঁধা লোকাচার, সামাজিক প্রথা, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির তাঁরাই ছিলেন ধারক ও বাহক। পক্ষান্তরে ক্ষত্রিয়রা ছিলেন উদারনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থার পরিপোষক ; মুক্তি ও উন্নয়নকামী অবদমিত মানুষের প্রতিভূ। ক্ষত্রিয় জাগরণের পথপ্রদর্শক ছিলেন গৌতম বুদ্ধ। রামচন্দ্র ও কৃষ্ণও ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত। কুমারিল, শংকর, রামানুজ ব্রাহ্মণ্য-যাজকীয় আধিপত্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন। চতুর্বর্ণের প্রত্যয়ে স্বামীজি বিশ্বসমাজ বিবর্তনেরও ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণ্য, রোমসাম্রাজ্য বিস্তারে ক্ষত্রিয়, ইংরেজের বেনিয়া আধিপত্য সম্প্রসারণে বৈশ্য এবং উদীয়মান মার্কিন গণতন্ত্রে তিনি শূদ্র আধিপত্যের লক্ষণ দেখতে পান।[৩০] স্বামীজি পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রগতিমূলক ভূমিকার উল্লেখ করেছেন—

> পুরোহিত-প্রাধান্যে সভ্যতার প্রথম আবির্ভাব, পশুত্বের উপর দেবত্বের প্রথম বিজয়, জড়ের উপর চেতনের প্রথম অধিকার বিস্তার, প্রকৃতির ক্রীতদাস জড়-পিণ্ডবৎ মনুষ্যদেহের মধ্যে অস্ফুটভাবে যে অধীশ্বরত্ব লুক্কায়িত, তাহার প্রথম বিকাশ। পুরোহিত রাজা-প্রজার মধ্যবর্তী সেতু।[৩১]

অন্যান্য দেশেও তাঁর মতে পুরোহিতেরা অনুরূপ প্রগতিশীল ভূমিকা

একসময়ে গ্রহণ করেছিল। পুরোহিতেরাই মানুষকে সর্বপ্রথম অতিমানসের সন্ধান দেয়, দেখায় বিশ্বাতীত সত্তা।[৩২] কিন্তু ক্ষমতাই মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। তাই পুরোহিতেরা ক্ষমতা পেয়ে নানা বিধিব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাহায্যে সকলকে পদানত রাখতে সচেষ্ট হয়। ফলে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ক্ষত্রিয়রা জয়ী হয়। বাহুবল তাদের আগেই ছিল, এবার হল বুদ্ধিবল। তাদের অনেকেই যাগযজ্ঞাদির উপর সংশয়ী হয়ে ক্রমে বস্তুবাদী হতে শুরু করে।[৩৩]

ক্ষত্রিয়রাও বলদর্পী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ে, তবে তারা পুরোহিতদের মতো ছুঁৎমার্গে অবস্থান করত না। বিজ্ঞান ও কলা ক্ষত্রিয়দের আনুকূল্যেই উৎকর্ষ লাভ করে। ক্ষত্রিয়দের পর শুরু হয় বৈশ্যদের আধিপত্য। অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গেই ব্যবসাবাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ভাবের আদানপ্রদান বিস্তার-লাভের সুযোগ পায়। কিন্তু বৈশ্যরা সাংস্কৃতিক বিষয়ে নিষ্ক্রিয় থাকায় তাদের আমলে জ্ঞান ও কলার গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এরপর যে-শ্রেণীর আধিপত্যের তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেই শূদ্রদের আমলে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু মানবিক মূল্যবত্তার অবনতি ঘটবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

স্বামীজি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের কালক্রমে আধিপত্য ও অবক্ষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে চতুর্বর্ণের সমন্বয়ে এক আদর্শ সমাজব্যবস্থার কল্পনা করেন —তা হল এমন এক সমাজব্যবস্থা যেখানে একাধারে থাকবে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান ও বিদ্যা, ক্ষত্রিয়দের সাহস, শৌর্য ও সংস্কৃতিবোধ, বৈশ্যদের ক্রিয়াকলাপে ভাবের বিনিময় ও সম্প্রসারণ এবং শূদ্রদের সাম্যের আদর্শ।[৩৪]

বর্ণাশ্রমের মধ্যে দিয়ে তিনি সামাজিক ঐক্য ও সমন্বয়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। বর্ণাশ্রমের মাহাত্ম্যে বিশ্বাসী হলেও জাতির অনড় নিগড়ে মানুষকে আমরণকাল বেঁধে রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন—তিনি চাইতেন সবাই যেন ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করে।[৩৫] যাজকতন্ত্রকে তিনি পরিহার করেন—কারণ তাতে মানুষ নিপীড়িত ও অবদমিত হয়। ভারতের সনাতন ধারা ও ঐতিহ্যের অনুরাগী হলেও বিবেকানন্দ রক্ষণশীল জাত্যভিমানের মুখে কুঠারাঘাত করেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণদের অধিকারবাদেরও তিনি নিন্দা করেছিলেন; তাতে শূদ্রদের শাস্ত্রপাঠ ও পরমজ্ঞান অর্জন নিষিদ্ধ। এই অগণতান্ত্রিক ধারার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন শংকর। অধ্যাত্মমার্গে বিবেকানন্দ চাইতেন সাম্যের প্রতিষ্ঠা—বলতেন যে, পরম তত্ত্বানুসন্ধানে মানুষ নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার আছে। প্রচলিত ধারার বিপরীতে বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের চিন্তা প্রগতি-বাদী মনের পরিচয় দেয়। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপে উচ্চবর্ণের একচেটিয়া অধিকারবাদ উপনিষদেও স্বীকৃত। বিবেকানন্দ প্রাচীন চিন্তার সবকিছুকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করেন নি।[৩৬]

অস্পৃশ্যবাদেরও তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন। হাঁড়ি ও হেঁসেলবাদ তাঁর কাছে পরিহাসের বিষয় ছিল। মানুষের আত্মোপলব্ধির আধ্যাত্মিক পরিশীলন, সংযম ও সর্বাত্মক মঙ্গলই তিনি কায়মনোবাক্যে কামনা করতেন। তিনি অনুভব করেন যে দুনিয়ায় পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন মতাবলম্বী শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সংঘাত ও দ্বন্দ্ব নিত্যই বিরাজমান। নিজ দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার তাগিদে সমাজমঞ্চে সবাই যেন রণোন্মাদনায় মত্ত।

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি ছিলেন নরমপন্থী। সামাজিক অনুশাসন মানুষের জীবন ও বিত্তরক্ষার প্রয়োজনেই গড়ে ওঠে। ঐসব অনুশাসন মৌরুসী স্বত্ব হয়ে গেড়ে বসে থাকলে সমাজের অবক্ষয় হয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অচল সমাজব্যবস্থার নিরসন সংঘর্ষের পথে হওয়াটা তাঁর মনঃপূত ছিল না।[৩৭] রাতারাতি আমূল ওলটপালটের পরিবর্তে সমাজের পরিবর্তন-প্রয়াস জৈব (organic) প্রণালীতে হওয়াই ছিল তাঁর কাম্য।

ভারতের দুর্গতির জন্য তিনি ইংরেজের উপর দোষারোপ না করে এদেশের সমাজপতি ও পূর্বপুরুষদের অভিযুক্ত করেছেন। অভিজাত বিত্তবানেরা সাধারণকে শোষণ ও নিপীড়নের সময় ভুলে যায় যে নির্বিত্ত দরিদ্রও মানুষ। যুগ যুগ ধরে সাধারণ মানুষকে পদানত রেখে তাদের মনে এই কথাই গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে দুঃখভোগের জন্যেই তাদের জন্ম। সেই ভয়েই হয়তো তিনি বলেছিলেন যে এদেশের ক্রীতদাসরা মুক্তি চাইছে, অপরকে ক্রীতদাস করার জন্য।[৩৮] ভারতের অবনতির অন্যান্য কারণের মধ্যে অপর জাতের সঙ্গে মেলামেশা না করা, ঐক্যবদ্ধ কাজে অনীহা, নারীকে অবনত রাখা, নির্বিত্ত ও সাধারণ মানুষকে অবহেলা ইত্যাদি কৃতকর্মগুলি তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায় এগুলি "প্রবল জাতীয় পাপ"।[৩৯]

বিবেকানন্দ মনে করতেন যে আর্যাবর্ত থেকে পৃথক দ্রাবিড় সভ্যতার প্রচলিত তত্ত্ব ভ্রান্তিপূর্ণ। ভারতের সবাই আর্য; আর্যরা আর্যাবর্ত থেকে দাক্ষিণাত্যেও গিয়েছিল; কাজেই সমগ্র ভারতই আর্যময়, এখানে আর কোনো জাত নেই। তাই তিনি একথাও মানতেন না যে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণরা আর্যাবর্তের ব্রাহ্মণদের মধ্যে উৎপন্ন ও দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য জাত থেকে স্বতন্ত্র। ভারতে আর্যদের আগমন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকেও তিনি ভ্রান্ত মনে করতেন; কারণ প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে ঐ মতের সমর্থনে কিছু পাওয়া যায় না। উপহাস করে তিনি লিখেছেন—

> ইউরোপীয় পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হ'তে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ও-সব আহাম্মকের কথা।[৪০]

স্বামীজী মনে করতেন মানুষের রঙ শাদাকালো হওয়ার কারণ মূলত বংশগত—গরম দেশভেদে পার্থক্য সামান্যই। দৈহিক গঠন ও বর্ণস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে

ভারতবহির্ভূত আর্য জাতির উৎপত্তির মতবাদ পরবর্তীকালে রাজনীতির অঙ্গ হয়ে হিটলারী নাৎসিবাদে রূপ নিয়েছিল।

তাঁর মতে প্রাচ্য জীবনধারায় ত্যাগের যেমন প্রাধান্য, অন্যদিকে প্রতীচ্যের জীবনধর্মে সংগ্রাম ও উদ্দামতাই প্রবল। মঙ্গোলীয় জাতিকে তিনি শক্তি ও শৌর্যের জন্য প্রশংসা করেছেন; তেমনি ককেশিয় ও নর্ডিক উপজাতিদের সংঘবদ্ধতার তারিফ করেন। রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের জন্য চেঙ্গিজ খাঁকেও তিনি কৃতী পুরুষ বলে মনে করতেন। আলেকজান্ডার, চেঙ্গিজ খাঁ, নেপোলিয়ন প্রমুখ রণবীরদের তিনি বিশ্বঐক্যের সাধকরূপে অভিহিত করেছেন। চীন ও জাপান ভ্রমণকালে সেখানকার অনেক মঠমন্দিরে তিনি প্রাচীন বাংলা লিপিতে সংস্কৃত পুঁথি দেখেছিলেন, এবং জাপানের মন্দিরগাত্রে বাংলা লিপিতে মন্ত্র লেখা দেখে এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মধ্যযুগে এক সময়ে ভারত ও দূরপ্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে সংযোগ ছিল।[১] বৈদিক ও রোমান ক্যাথলিক পূজাপার্বণে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন যে খ্রীষ্টানরা হিন্দুধর্মের শাখা বৌদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে আসায় ঐ সাদৃশ্য ঘটে। প্রাচীন গ্রীক ও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় চিন্তা ও দর্শনে ভারতীয় প্রভাবের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। আরবদের মাধ্যমে স্পেনেও ভারতীয় চিন্তার প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে স্বামীজি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে বর্তমান ইউরোপে জার্মানি চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতের কাছে অনেকাংশে ঋণী।[২]

'হিস্টরিক্যাল এভলিউশান অফ ইন্ডিয়া' প্রবন্ধে স্বামীজি লিখেছেন যে শিখ ও মারাঠা সাম্রাজ্যের উত্থানের প্রাক্কালে যে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় তা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল, এজন্যে যে প্রতিভা ও বুদ্ধিদীপ্তি তথা মানসিক উৎকর্ষের দিক থেকে ঐ দুই সাম্রাজ্য ছিল নিষ্প্রভ। কারণ তারা মুসলমান শাসকদের সঙ্গে সদাই সংগ্রামে ব্যস্ত থাকায় নতুন আদর্শ ও কর্মপ্রবৃত্তি হারিয়ে ফেলেছিল। তাঁর মতে ভারতে তখন চলেছিল গাঢ় অন্ধকারের যুগ।[৩]

রাষ্ট্রদর্শন

রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ নিজস্ব কোনো ধারা প্রবর্তন করেন নি। এবং রাষ্ট্রতত্ত্বের প্রত্যয়গুলি সম্পর্কেও তিনি নিজ মতামত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন নি। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে প্রবেশের সুপ্ত আবেগকে তিনি সযত্নে দমন করেছিলেন। তবুও রাষ্ট্রদর্শনের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তাঁর চিন্তায় বিক্ষিপ্ত অজস্রতায় ছড়িয়ে আছে, জাতীয় আন্দোলনের উপর যার প্রত্যক্ষ প্রভাব অসামান্য। তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা *Lectures from Colombo to Almora*, *East and West* এবং *Modern India* গ্রন্থ তিনটিতেই বিশেষ পাওয়া যায়। তাঁর চিন্তার

প্রণালী ছিল ঐতিহাসিক ও আরোহী (inductive)। ঐতিহাসিক ঘটনা ও অভিজ্ঞতা থেকে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। স্বতঃসিদ্ধ ও সাধারণভাবে তিনি কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন নি। অতীত ও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে তিনি ভারত ও বিশ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থার বিচারবিশ্লেষণ ও সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে সুন্দর কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যেগুলি উত্তরকালের ঐতিহাসিক ঘটনা-প্রবাহে নির্ভুল প্রমাণিত হয়।

বিবেকানন্দের মানসিক গঠন প্রক্রিয়ায় ত্রিবিধ উপাদান ও প্রভাব লক্ষণীয়। প্রথমত, তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গভীরে অবগাহন করেন; ধর্ম ও দর্শনের মতো সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানেও তাঁর সমধিক দখল ছিল। কথিত আছে যে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রতিটি খণ্ড (সে সময়ে ১১ খণ্ড) তাঁর নখদর্পণে ছিল। ফলে তাঁর মনন ধারা পূর্ণতা ও পরিপুষ্টি অর্জন করে। দ্বিতীয়ত, গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সবিশেষ প্রভাবিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অতি স্বচ্ছ ও সরল কথায় তাঁর বাণী ও উপদেশ প্রচার করেছিলেন—যেগুলি ছিল বিবেকানন্দের মানসিক গঠনের মূল উপাদান। বস্তুত গুরুর সরল কথা-গুলিকেই তিনি দার্শনিক ভাষা ও ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত করেছেন। তৃতীয়ত, স্বলব্ধ আজীবন অভিজ্ঞতা তাঁর মননশক্তিকে উৎকর্ষ দান করে। বিশ্ব পরিক্রমায় তাঁর চিন্তা ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। তাই তাঁর চিন্তা ও দর্শন দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বলা হয়ে থাকে যে দার্শনিক আলোচনা, সাধারণত বিমূর্ত ভাব ও ভাষার কচকচানিতে ভরা; প্রতীকী পরিভাষায় সেগুলি অতীব দুর্বোধ্য; জীবনের সঙ্গে সেগুলির সংযোগ ও সার্থকতা ক্ষীণ। সেদিক থেকে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা সুস্পষ্ট, সজীব ও গতিসম্পন্ন।

রাষ্ট্রচিন্তায় বিবেকানন্দের উপর হেগেলের প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখা যায়। হেগেল ব্যক্তির স্বার্থ ও স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সঙ্গে একীভূতরূপে বিবেচনা করতেন; মনে করতেন রাষ্ট্রই মানুষের একমাত্র কল্যাণসাধনকারী; কারণ মানুষের উন্নত বৃত্তি রাষ্ট্রেই প্রতিফলিত হয়। সেজন্যে রাষ্ট্রের কল্যাণই ব্যক্তির কল্যাণ। বিবেকানন্দও সেই দৃষ্টিতে লিখেছেন—

> সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য।[১৪]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে বর্জন করেই একদিন ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ প্রভৃতি সমষ্টিবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বৈদান্তিক বিবেকানন্দ সমষ্টির প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দেন নি। সমষ্টির ভাল চাই বলে ব্যষ্টির মন্দ করতে হবে এমন কথার তিনি বিরোধিতাই করেছেন। গ্রীন ও মিলের চিন্তার সঙ্গে নিজের মতকে তিনি খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন।

হেগেলের আদর্শ ছিল রাষ্ট্রের অধীনেই ব্যক্তি ও জনজীবনের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। সমষ্টির বেদীমূলে ব্যক্তি সেখানে উৎসর্গীকৃত। বিবেকানন্দ ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণকল্পে সমষ্টির জন্যে ব্যষ্টির আত্মত্যাগের কথা বলেছেন; সেই-সঙ্গে একথাও বলেছেন যে, স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রথম শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থ-রক্ষার জন্যই সমষ্টি-কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টি দেওয়া দরকার বলে তিনি অনুভব করেন।[৪৫] ব্যষ্টিস্বার্থ তথা ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশ ও মুক্তিই ছিল তাঁর কামনা। হেগেলের মতো তিনি ব্যক্তিকে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের যন্ত্রাংশ করতে চান নি। বিবেকানন্দ রাষ্ট্রের চেয়ে ব্যক্তি ও সমাজের উপরই অধিক মূল্য আরোপ করেছেন। রাষ্ট্র তাঁর কাছে অভীষ্ট লক্ষ্যে পেঁছিবার অন্যতম পথ-মাত্র। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রসঙ্গে তাই তাঁকে বলতে দেখা যায়—

> পার্লেমেন্ট দেখলুম, 'সেনেট' দেখলুম, ভোট ব্যালট মেজরিটি, সব দেখলুম...শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে, সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।[৪৬]

হেগেলের মতো তিনিও নেশনকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে করতেন। একটি সর্বব্যাপী সুরে সকল নেশনই যেন অনুরণিত; যে সুরে ভারতীয় ইতিহাসের তন্ত্রীগুলি বাঁধা তাহল ধর্ম। তাঁর কথায়—

> In each nation, as in music there is a main note, a central theme, upon which all others turn. Each nation has a theme, everything else is secondary. India's theme is religion. Social reform and everything else are secondary.[৪৭]

জাতীয়তাবাদের যে আধ্যাত্মিক রূপ তিনি দর্শিয়েছেন তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, বিপিনচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়। জাতীয়তা-বাদের আবেগময় আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমি তিনিই প্রথম প্রস্তুত করেন। তিনি মনে করতেন যে ভারতের আগামী দিনগুলিকে উজ্জ্বল করে তুলতে হলে চাই অতীত গরিমার অনুধ্যান। অতীতকে অস্বীকার করার অর্থ বর্তমান অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা। বিগত দিনের ভাবভূমিতেই ভারতের ভাবী-দিনের ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ হবে। অতীতেও ভারতের গরিমা ও প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল আধ্যাত্মিক পথেই। আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় জীবনের ধারক। আধ্যাত্মিকতাই চিরদিন ভারতীয় সমাজকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল এবং জনজীবনের বন্ধন কখনও শিথিল হয়ে পড়লে তাকে পুনরাবন্ধ করত। তিনি মনে করতেন অন্তরের দিব্য অভিব্যক্তিই হল সভ্যতা এবং জাতীয় জীবনকেও ঐ দিব্য আদর্শে গড়ে তোলা দরকার। আধ্যাত্মিক জীবনাচার শাশ্বত আদর্শেরই অনুসরণ মাত্র—কতকগুলি সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অসার প্রথা নয়—আধ্যাত্মিক ভূমিতে সমাজ-জীবন প্রতিষ্ঠিত—সেজন্য সামাজিক বিধিব্যবস্থার রদবদল জনচিন্তানুসারী

আধ্যাত্মিক উপায়েই হওয়া সমীচীন।[১৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বিবেকানন্দের হৃদয়পটেও মাতৃরূপে দেশের চিত্র কল্পিত। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা ও মাতৃশক্তির বোধনপ্রয়াস পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কর্মী ও বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করে তোলে। তাঁর মতে দেশকে মাতৃরূপে ভক্তি ও সেবা করলে একদিন দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন ঘটবে। সেজন্যে তিনি বলেছিলেন—

আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন, এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—তোমার স্বজাতি—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন।[১৯]

বিবেকানন্দের মতে জাতীয়তাবাদের প্রচলিত চেতনা হল দ্বিবিধ। প্রথম, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহানুভূতিবোধ এবং দ্বিতীয়, অপর জাতির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ। অন্ধ স্বজাতি-বাৎসল্য ও বিজাতি-বিদ্বেষকে তিনি আদৌ সমর্থন করেন নি। বিশ্বজনীনতাই ছিল তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান অঙ্গ। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ একটি পবিত্র ও নিষ্কলুষ প্রত্যয় হলেও মানবিক সত্তার গুরুত্ব তার চেয়েও বেশি। জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়ের পশ্চাতে বিরাজ করে প্রকৃত মানুষ। সে-মানুষ বিশ্বজনীন। সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধি বৈশ্বিক চেতনার সহায়ক। সারা বিশ্ব যখন নৈতিবাদ, জড়বাদ, সংশয়বাদ প্রভৃতি বাতবিতণ্ডায় মত্ত তখন বৈদান্তিক বিবেকানন্দ বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক ভাবের উন্মেষে সচেষ্ট হন। ভারতের মুক্তি ও নবজাগরণ একদিন বিশ্বপ্রেম ও মৈত্রীর পথকে আলোকিত করে তুলবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

তিনি চাইতেন মানুষের সৎ ও শুভ প্রবৃত্তিগুলির যথোচিত কর্ষণ। সে-কর্ষণ পুরুষত্বের, মানসিক মূল্যবত্তার ও সম্ভ্রমবোধের। মনুষ্যত্বের প্রধান অঙ্গ পাড়া-পড়শীর প্রতি সহৃদয় মনোভাব প্রদর্শন। নিঃস্বার্থ সেবার প্রবৃত্তি গড়ে তোলার আগে দেশ ও জাতির কল্যাণে গালভরা কথা না বলাই ভাল। তাই সর্বাগ্রে চাই নিজ স্বার্থের সঙ্গে দেশ ও জাতির স্বার্থকে মিলিয়ে দেওয়া। ব্যক্তির নৈতিক বিকাশের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সমন্বয়ে জাতীয় প্রগতির পথ রচিত হবে। ব্যক্তিকে নিয়েই নেশন; তাই ব্যক্তির সুস্থ, নীতিনিষ্ঠ ও সহৃদয় মন গড়ে না উঠলে জাতির অগ্রগতি ও প্রাধান্যের প্রশ্ন অর্থহীন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ ও দেশের কল্যাণে নিঃস্বার্থ সেবার নীতিই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বনিয়াদ। বিবেকানন্দ সেই আদর্শ ও নীতিগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

রাষ্ট্রদর্শনে বিবেকানন্দের একটি মূল্যবান অবদান হল তাঁর স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির প্রত্যয়। এবিষয়ে তাঁর চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব ও মৌলিক।

বিশ্বের অবিরাম গতির মধ্যে মুক্তির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা সদাই নিহিত থাকে —মুক্তির কামনাই মানুষের বিকাশসাধনাকে বেগবান করে। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে তিনি জনসাধা[illegible] বা মায়ার বন্ধনমোচনই শুধু চান নি, উপরন্তু মানুষের বৈষয়িক ও স[illegible]মক উপস[illegible]ও তাঁর কাম্য ছিল। মুক্তিকে তিনি মানুষের জন্মগত অধিকার বলে মনে করতেন। তিনি বলেছেন—

> উন্নতির মুখ্য সহায় স্বাধীনতা, যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়াদাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়। আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোন বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকারের ইচ্ছা, সে প্রকারে ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের সমান সুবিধা যাহাতে সকল সামাজিক ব্যক্তির থাকে তাহাও হওয়া উচিত।[৫০]

দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক তথা পূর্ণাঙ্গ মুক্তির কথা উপনিষদেও লিখিত আছে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ঔপনিষদ দৃষ্টিতে মুক্তির প্রত্যয় বিশ্লেষণ করলেও সাধারণত শব্দটি মনে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তাঁর মুক্তির বাণী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ কার্যকর হয়েছিল।

দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা বিবেকানন্দ সরাসরি বলেন নি এবং জাতীয় আন্দোলনেও নিজেকে তিনি জড়াতে চান নি। কারণ প্রথমত, তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং রাজনৈতিক বাতবিতণ্ডা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক আলোকে মানুষের মনের অন্ধকারকে দূর করাই অধিক কার্যকর হবে বলে অনুভব করতেন। দ্বিতীয়ত, তিনি একথাও উপলব্ধি করেন যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা সরাসরি তুললে হয়তো তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হবে—ফলে সময় ও শক্তিক্ষয় ছাড়াও যে কাজে তিনি ব্রতী ও উদ্যোগী অর্থাৎ দেশবাসীর মনে নীতিবোধ ও আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষসাধন—তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সংগ্রামী নেতৃত্বে প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ না হলেও লাঞ্ছিত ও অবদমিত মানুষের দাবি তিনি নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেন। বস্তুত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক স্বাধিকারের দাবিকে তিনি পরোক্ষে ত্বরান্বিত করে তোলেন। যে প্রত্যয়টির ব্যঞ্জনায় তিনি সংগ্রামী আন্দোলনকে গতিসম্পন্ন করেন তাহল শক্তির সাধনা। শক্তিবিনা কোনো অধিকারই অর্জন করা যায় না। ব্যক্তি ও জাতির জীবনসংগ্রামে একাধারে চাই নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস ও নিরন্তর অধ্যবসায়; এবং সকল বাধা চূর্ণ করে জাতীয় চরিত্র গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান হল শক্তি। বিবেকানন্দ জনমনে শক্তি ও সাহসিকতার বীজ বপন করেন। বৈদান্তিক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বল ও বীর্যের সঞ্চারে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি বলেন যে পরম সত্তার

অংশ যে- আত্মা তা সর্বশক্তির আধার— তার কাছে পার্থিব সকল বাধাবিপত্তি নগণ্য। জাতীয় চরিত্রের ভিতকে সুদৃঢ় করার জন্যে তিনি বেদান্তের পথ অনুসরণ করেন। 'অভয়ম' হল বেদ ও বেদান্তের মর্মমাতৃর ; গীতার মর্মও হল পুরুষত্ব ও শক্তির উন্মেষ ; আত্মার বল ও বিঘ্নবাধনপ্রয়াসে আত্মশক্তিকে অদম্য করে তোলা যায় ; শক্তির প্রতিষ্ঠায় জাতি শৌর্যেবীর্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। অত্যাচার ও উৎপীড়নের শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক হল আত্মশক্তি। সমকালীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নেতিবাচক নিন্দাবর্ষণের কার্যকারিতা সম্পর্কে তিনি সংশয়ী ছিলেন। আত্মশক্তির উন্মেষপ্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। পরাধীন দুর্বল জাতির মনে তাঁর সেদিনের বাণী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশধারায় কেন্দ্রানুগ শাসনব্যবস্থা ও রাজতন্ত্রের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে অপরিণত অবস্থায় সমাজের পরিচালন রাজার হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয় ; সমাজ ও রাষ্ট্রের বিকাশের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজ শাসনের ঐতিহাসিক প্রয়োজনবোধও তাঁর মনে প্রচ্ছন্ন ছিল। তিনি বলেছেন—

> রাজা প্রজাদিগের পিতামাতা, প্রজারা তাঁহার শিশুসন্তান। প্রজাদের সর্বতোভাবে রাজমুখাপেক্ষী হইয়া থাকা উচিত এবং রাজা সর্বদা নিরপেক্ষ হইয়া আপন ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু যে নীতি গৃহে গৃহে প্রযোজিত, তাহা সমগ্র দেশেও প্রচার। সমাজ—গৃহের সমষ্টিমাত্র। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে' যদি প্রতি পিতার পুত্রকে মিত্রের ন্যায় গ্রহণ করা উচিত, সমাজশিশু কি সে ষোড়শবর্ষ কখনই প্রাপ্ত হয় না?[11]

স্বামীজি এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন যে সকল সমাজই একদিন যৌবনদশায় উপনীত হয় এবং শক্তিমান শাসনকারীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। "এ যুদ্ধে জয়পরাজয়ের উপর সমাজের প্রাণ, বিকাশ ও সভ্যতা নির্ভর করে।" মার্কসের শ্রেণী সংগ্রাম তত্ত্বের সঙ্গে এর কিছুটা মিল দেখা যায়। ভারতের সামাজিক বিবর্তন ধারায় একটি বিপ্লব বারংবার দেখা গিয়েছে। ধর্মভিত্তিক ভারতীয় সমাজে সে বিপ্লব স্বভাবতই ধর্মবিপ্লবের রূপ নিয়েছে। তাঁর কথায়—

> ভারতবর্ষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মই এদেশের ভাষা এবং সকল উদ্যোগের লিঙ্গ। বার বার এ বিপ্লব ভারতেও ঘটিতেছে. কেবল এ দেশে তাহা ধর্মের নামে সংসাধিত। চার্বাক. জৈন, বৌদ্ধ, শঙ্কর, রামানুজ, কবীর, নানক, চৈতন্য, ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মুখে ফেনিল বজ্রঘোষী ধর্মতরঙ্গ, পশ্চাতে সমাজনৈতিক অভাবের পূরণ।[12]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো স্বামীজিও মনে করতেন যে কি হিন্দু কি বৌদ্ধ আমলে ভারতের সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজনীতির বিশেষ কোনো সংস্রব ছিল না।

কাজেই রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তাদের অংশ গ্রহণেরও কোনো প্রশ্ন উঠত না। পরবর্তী কালে অনেক পণ্ডিত ও গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে প্রাচীন কালে 'সমিতি' নামে জনসাধারণের এক প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা এবং তার শাখা হিসাবে 'সভা' নামক উপসমিতি রাষ্ট্রশাসনে নিযুক্ত থাকত। বস্তুত ঋগ্বেদে সমিতি শব্দটি সভাস্থল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীনকালে মামলামোকর্দমার জন্যে ধর্মসভা, যজ্ঞের স্থানে কর্মসভা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির উচ্চস্তরের রাজকীয় পুরুষ ও কর্মচারীদের নিয়ে রাজসভা বসত। এগুলির কোনো-টিতেই স্বামীজির 'সাধারণ প্রজার' স্থান ছিল না। একথা রাষ্ট্রতত্ত্ব ও গণতন্ত্রের উৎস গ্রীসদেশেও প্রযোজ্য। সেখানকার রাজকার্যেও সাধারণ শ্রমজীবীদের কোনো স্থান ছিল না ; কারণ তাদের প্রায় সবাই ছিল ক্রীতদাস পর্যায়ের।[৫৩]

জনগণের স্থান ও মান উঁচুতে তুলতে না পারলে রাজনৈতিক উন্নয়নপ্রয়াস তাঁর দৃষ্টিতে ছিল অর্থহীন। নিজের মোক্ষলাভের প্রচেষ্টাও অর্থহীন যখন দেশবাসী সীমাহীন দুঃখ, দুঃসহ দুর্দশা ও নৈরাশ্যে মুহ্যমান থাকে। তিনি তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসকে সহানুভূতির সঙ্গেই সমালোচনা করতেন। কংগ্রেসের কার্য-সূচিতে তিনি গণকল্যাণমুখী সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কাজের কোনো নিদর্শন দেখতে পান নি। তিনি অনুভব করতেন যে আইন বা রাজনীতির মাধ্যমে মানুষকে ধার্মিক করা যায় না। রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মের উপকারিতায় তাঁর অধিক আস্থা ছিল। ভারতের নবজাগরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বাইরের লোক সাধারণত কংগ্রেসের আন্দোলন ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রেই নবজাগরণ প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রেই ঐ জাগরণ অধিক কার্যকর হয়েছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রাজনীতিকগণের বিবাদ বড় অদ্ভুত। রাজনীতির ভিতর ধর্ম ঢুকাইতে অনেক যুগ লাগিবে।"[৫৪]

বিবেকানন্দ নিজেকে 'সোসালিস্ট' বলে ঘোষণা করেছিলেন।[৫৫] সেজন্যে তাঁকে এদেশের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বলে মনে করা হয়। বস্তুত সমাজতন্ত্রের সঙ্গে এদেশবাসীর পরিচয় এর বহু পূর্বেই ঘটেছিল। 'সোসালিজম' শব্দটি প্রথম যিনি ব্যবহার করেছিলেন সেই ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিক রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহনের সংযোগ ও পত্রবিনিময়ের কথা সুবিদিত। তৎকালীন ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক মতাবলম্বী সিসমঁদি প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের সঙ্গেও রামমোহনের সংযোগ ঘটে। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রও এবিষয়ে অবহিত ছিলেন, তাঁর লেখায় 'ইন্টারন্যাশনাল'-এর উল্লেখও পাওয়া যায়। কাজেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিবেকানন্দের সংযোগই প্রথম ঘটেনি। তবে সরাসরি নিজেকে 'সোসালিস্ট' বলে ঘোষণা হয়তো তিনিই প্রথম করেন।

বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা তাঁর বিভিন্ন উক্তি ও দার্শনিক প্রত্যয়-গুলির মধ্যে পাওয়া যায়। রাজনীতির অঙ্গ বলেই হয়তো তিনি সমাজতন্ত্র সম্পর্কে একত্র বিস্তারিতভাবে কিছু আলোচনা করেন নি। তবে সমাজতান্ত্রিক

চেতনার প্রধান লক্ষণগুলি বিবেকানন্দের চিন্তায় স্পষ্টই দেখা যায়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজির চিন্তাকে মার্কসের সমগোত্রীয় বলে মনে করতেন। মার্কসীয় সাহিত্যের সঙ্গে স্বামীজির কোনো পরিচয় ছিল কিনা তা জানা যায় না। প্যারিসে অনুষ্ঠিত Congress of History of Religions-এর সময় তাঁর সঙ্গে ক্রপটকিন ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সংযোগ ঘটে। তখনও অ্যানার্কিজম, সোসালিজম, কমিউনিজম কার্যত মাতৃগর্ভে।

মার্কসবাদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক অমিল এই যে তিনি ধর্মকে লেনিনের ভাষায় "opium of the people" বলে মনে করেন নি। দ্বিতীয়ত, মার্কসের দ্বান্দ্বিক (dialectics) প্রণালীতে বস্তুতন্ত্রী বিচারবিশ্লেষণও তাঁর মতের পরিপন্থী। তৃতীয়ত, প্রয়োজনে হিংসাত্মক কাজকে কিছুটা সমর্থন করলেও বিবেকানন্দের চিন্তায় মার্কসীয় শ্রেণী সংগ্রাম ও রক্তঝরা বিপ্লবের স্থান ছিল না। তবে মার্কসের সঙ্গে তাঁর কিছু মিল থাকা খুবই স্বাভাবিক; কারণ প্রাক-মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক চিন্তা উভয়েরই মনকে স্পর্শ করে।

প্রচলিত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে বিবেকানন্দের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পর্যালোচনার পূর্বে ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে তাঁর কি মনোভাব ছিল তা প্রথমে দেখা যাক। তিনি লিখেছেন—

> যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরেজী নাম সোসালিজম, ব্যক্তিত্ব সমর্থক মতের নাম ইনডিভিজুয়ালিজম।[৫৬]

বিবেকানন্দ সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যষ্টির স্বার্থত্যাগের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু ব্যক্তির নিরঙ্কুশ বিকাশ ব্যতিরেকে সমাজের উন্নতি যে অর্থহীন সেকথাও অদ্ব্যর্থ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তিনি যে সমর্থন করতেন ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখতেন তা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায়—

> For writing a few words of innocent criticism, men are being hurried to transportation for life, others, imprisoned without any trial; and nobody knows when his head will be off.'[৫৭]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে তাঁর প্রবণতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই অনুকূল ছিল। প্রশ্ন হতে পারে যে তবে কেন তিনি সমাজতন্ত্রের সমর্থক হয়েছিলেন। তার উত্তর তাঁর অপর একটি চিঠিতে মেলে—

> I am a socialist not because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread.[৫৮]

স্বামীজী ইউরোপের সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থার বহু ত্রুটিবিচ্যুতি তাঁর চোখে পড়েছিল। সেজন্যে তিনি ভারতেরই একটি প্রাচীন চিন্তা বেদান্ত দর্শনকে আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত করে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয়, সমষ্টি

ও ব্যষ্টিস্বার্থের মধ্যে তিনি সামঞ্জস্য চেয়েছেন। তাঁর এই চাওয়ার মূলে ছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। মুক্তির অন্তরায়রূপে তিনি দারিদ্র্য, অনাহার, ধর্মীয় অনাচার ও শ্রেণীশোষণকে প্রত্যক্ষ করেন ; এগুলির অবসানেই মানুষ নিজ সত্তায় ভাস্বর হয়ে উঠবে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তামসিক জীবনের মোহমুক্তির জন্যে তিনি সোসালিস্ট হয়েছিলেন। পরাধীনতা ও সামাজিক অবিচার মানুষকে যে তামসিকতায় আবদ্ধ রাখে, তারই বিমোচনকল্পে আত্মসত্তার উন্মেষ ও রাজসিক সমাজকর্মের প্রতি তিনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

বেদান্তকে তিনি ব্যবহারিক (Practical Vedanta) দিক থেকে গ্রহণ করেছিলেন বলে দার্শনিক প্রত্যয়েই তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তায় উপনীত হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, অদ্বৈত বেদান্ত জীব ও ঈশ্বরে কোনো প্রভেদ নেই এবং এদেশের অধোগতিকে রোধ করতে হলে চাই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ; মানুষকে জানাতে হবে যে তারই মধ্যে ব্রহ্ম বিরাজ করেন—যেমন করেন সমস্ত জীবেরই মধ্যে ; অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে জীবের শক্তি ও সম্ভাবনা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক অনগ্রসরতা, অনুন্নত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, মানুষে মানুষে সংঘর্ষের ধ্বনি জীবকে সসীম জীবনে আবদ্ধ রেখেছে। বর্ণ-বৈষম্য, ধর্মের নামে ভণ্ডামি প্রভৃতি যাবতীয় অনাচার জীবকে ভুলিয়ে দিচ্ছে যে সে নিজেই পরম ব্রহ্মের অঙ্গ। সত্যের প্রতিষ্ঠা তথা জীবের স্বীয় অসীম সত্তা ও সম্ভাবনার উদ্ঘাটনের জন্যে চাই সমাজের পুনর্গঠন। প্রাত্যহিক জীবনে ছন্দের স্পন্দন জাগানোর জন্যে বিমূর্ত বেদান্তকে প্রাণবন্ত করে তোলা দরকার। তাই বিবেকানন্দ অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে মানুষই স্বয়ং ভগবান ; যে ভগবানকে মানুষ মঠমন্দির মসজিদ চার্চে খুঁজে মরছে, পর্বতগুহা নদী অরণ্যে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে সে ভগবান সে নিজেই—মানুষই ইতিহাসের নায়ক। এখানে মার্কসের সঙ্গে তাঁর আংশিক মিল লক্ষণীয়। হেগেল আত্মবিচ্যুতি ও আত্মাবিষ্কারের যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, ফয়েরবাক তাকে তাঁর নৃতাত্ত্বিক ধর্মপ্রত্যয়ে বিশ্লেষণ করেন যে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন। মার্কস সেই মানবিক প্রত্যয়কে আরো একটু এগিয়ে এনে বলেন যে, মানুষকে ঈশ্বরের মর্যাদা দিতে হবে—সেজন্যে চাই সমাজব্যবস্থার নবরূপায়ণ। তাতেই আত্মবিচ্যুত মানুষ নিজেকে সঠিক সত্তায় খুঁজে পাবে—তাতেই হবে তার মুক্তি। মার্কসের মতে মানুষের এই আত্মবিচ্যুতি ঘটেছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে, তাই প্রয়োজন অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান—চাই সমাজতন্ত্র—তাতেই মানুষ নিজেকে আবার খুঁজে পাবে।[৫১]

বিবেকানন্দ যে-নবজাগ্রত মাতৃভূমির কল্পনা করেছিলেন তার রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে তিনি মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সমানাধিকার কামনা করেন। তিনি যে-বন্ধনমুক্ত মানুষের কল্পনা করেন সে-মানুষ জ্ঞানে,

কর্মে, স্বাস্থ্যে, হৃদয়বৃত্তিতে মহান। মুক্ত মানুষের সমবায়ে গঠিত নতুন সমাজব্যবস্থা দেশপ্রেম, বিজ্ঞানচেতনা এবং সত্ত্ব ও রজের সংমিশ্রণে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক—এই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। তিনি মানুষকে জীবনবিমুখ ও বস্তুভোগ্য উপকরণে উদাসীন করতে চান নি। তিনি স্পষ্টই বলেন—

> আমরা নির্বোধের মতো বস্তুবাদী সভ্যতার বিরোধিতা করি, আঙুর ফল টক ; বস্তুবাদী সভ্যতা, এমন কি বিলাসিতারও প্রয়োজন আছে বিত্তহীনের অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে। রুটি চাই—যে-ঈশ্বর কেবল স্বর্গের চিরন্তন সুখের কথা বলে, অথচ রুটি জোগাতে পারে না তার প্রতি আমার কোনো বিশ্বাস নেই।[৬০]

তিনি মনে করতেন যে, "first bread and then religion"। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের নীতিকথা শোনানো নির্বুদ্ধিতার সামিল। তিনি যে-জীবন-বোধের কথা বলেন তাতে খাদ্য বস্ত্র শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থানের নিশ্চয়তার প্রশ্ন নিহিত।

বিবেকানন্দ একথাও উপলব্ধি করেন যে দুনিয়ার বুভুক্ষু মানুষের মন ও গতি সমাজতন্ত্রের দিকে নিবদ্ধ—এবং সেদিকে যে রাশিয়া ও চীনই প্রথম অগ্রসর হবে তাও ভবিষ্যদ্বাণী করেন।[৬১] মার্কসীয় মতে কিন্তু শিল্পে প্রাগ্রসর দেশগুলিতেই সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রাদুর্ভাব হবার কথা। শ্রেণী সম্পর্ক বিশ্লেষণ ও দরিদ্রের আরও দরিদ্র হয়ে পড়ার যে প্রক্রিয়া তিনি নিজ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তার সঙ্গে মার্কসীয় মতবাদের মিল সুস্পষ্ট। নিরন্ন মানুষের দুঃসহ জীবন তাঁর মনে যে-বেদনার সৃষ্টি করে তারই ফলস্বরূপ তাঁর সাম্যচিন্তা দেখা দেয়।

শিক্ষাচিন্তা

স্বামীজির চিন্তায় শিক্ষাতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। তিনি অনুভব করতেন যে উপযুক্ত শিক্ষা ও চেতনা ব্যতিরেকে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। বলা বাহুল্য শিক্ষা বলতে তিনি পুঁথিগত বিদ্যা মনে করতেন না। মনের যথোচিত মার্জনা হলে মানুষের যুক্তিপ্রবণতা ও বুদ্ধিবৃত্তি উন্মেষ লাভ করবে—ফলে সৃষ্টিশক্তির বিকাশ, সদাচার, ঔদার্য ও সমবায়ী মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। রাজনীতির সার্থকতা ও সুষ্ঠু সমাজবিন্যাসের মূলে শিক্ষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে উত্তরকালে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, মানবেন্দ্র-নাথ প্রমুখ ভারতীয় রাষ্ট্রদার্শনিকেরা অনুরূপ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা তাঁর বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতা ও রচনা একত্র 'শিক্ষাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা হল—

Education is the manifestation of the perfection already in man।[৬২]

তিনি মনে করতেন—

জ্ঞান মানুষে অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসে না, সবই ভিতরে···যেমন একখণ্ড চকমকিতে অগ্নি অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান মনের মধ্যেই রহিয়াছে, উদ্দীপক কারণটি ঘর্ষণস্বরূপে সেই অগ্নিকে প্রকাশ করিয়া দেয়।[৬৩]

মানুষের সহজাত জ্ঞানশক্তি ও সম্ভাবনা ছাই চাপা আগুনের মতো আবৃত থাকে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সেই আবরণকে অপসারণ করা।

শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও শক্তিকে সাহায্য করাই শিক্ষকের কর্তব্য ; তার বেশি নয়—অর্থাৎ শিক্ষকের নিজ খেয়ালখুশি অনুযায়ী কতকগুলি বিষয় শিক্ষার্থীর মস্তিষ্কে গুঁজে দেওয়া অনুচিত। শিক্ষায় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা স্বামীজির শিক্ষাতত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে যে thought control এবং cultural regimentation বর্তমানকালে কোনো কোনো রাষ্ট্রে চলেছে তার বিরুদ্ধ-মনোভাব বহুপূর্বেই বিবেকানন্দের লেখায় ব্যক্ত হয়েছে—

আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে ? আমার প্রভুর এইসব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে ? এসব জিনিস আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে ? হইতে পারে ঐগুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার রাস্তা উহা না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ শিশুকে এইরূপে নষ্ট করা হইতেছে।[৬৪]

ছোটবেলা থেকেই মানুষকে স্বাধীন চিন্তায় প্রবৃত্ত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ছোটদের উপর অসঙ্গত শাসনেরও তিনি তীব্র নিন্দা করতেন। এ বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর মিল দেখা যায়।

তাঁর মতে শিক্ষার লক্ষ্য চরিত্রগঠন তথা মানুষ তৈরি করা। তিনি মনে করতেন যে সুখ ও দুঃখ উভয়ই মানুষের মহান শিক্ষক—সে শুভ হতে যেমন, অশুভ থেকেও তেমনি শিক্ষা পায়—সুখদুঃখ মনের উপর একটা চিত্র রেখে যায়—এই চিত্রের সমষ্টিফলই মানবচরিত্র—সুখদুঃখের উপাদানেই চরিত্র গঠিত হয়। সর্বশক্তিময় ইচ্ছা, মার্জিত সংস্কার ও সৎ অভ্যাস চরিত্রকে পুষ্ট করে।

মানুষ গড়তে স্বামীজি যে-পন্থা দর্শিয়েছেন তার প্রাথমিক উপাদান দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অটুট স্বাস্থ্য ও কুসংস্কারমুক্ত মন। ঘরকুনো মনোবৃত্তি ত্যাগ করে দেশবিদেশে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে বেরিয়ে পড়া উচিত। সর্বোপরি থাকা চাই স্বাজাত্যবোধ। সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি তিনি শ্রদ্ধাভাববর্জিত ও নেতিভাবপূর্ণ বলে মনে করতেন। বিকল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর অভিমত হল—

১. আত্মনির্ভরশীল ও জীবনসমস্যা সমাধানকারী শিক্ষা চাই। বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবধারাকে এমনভাবে আয়ত্ত করা দরকার যাতে তা চরিত্রে ও জীবনে আদর্শ মানুষ গড়ার সহায়ক হয়। পাঁচটা ভাব হজম করে জীবন ও চরিত্র গ্রঠন একটি আস্ত লাইব্রেরি মুখস্ত করার চেয়েও অধিক সার্থক ও কার্যকর। চাকুরিসর্বস্ব মুখস্ত বিদ্যাগত পরীক্ষা পাশের সামাজিক মূল্য নগণ্য।

২ পরার্থপরতা ও মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া। স্বাধীনভাবে জাতীয় বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজি ও বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা। কারিগরি বিদ্যা ও শিল্পশিক্ষার বিস্তার। বহির্বিজ্ঞান, দলগঠন ও পরিচালন দক্ষতা অর্জনের জন্যে বিদেশের শিক্ষারও উপযোগিতা আছে। চারিত্রিক দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও শিল্পবাণিজ্যে নৈপুণ্য অর্জনের জন্যে বিদেশভ্রমণ বিশেষ কার্যকর।

৩. সনাতন পদ্ধতির অনুসরণ। ভারতের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সকল প্রকার শিক্ষা আয়ত্ত করা সমীচীন। সনাতন শিক্ষা অপরের প্রতি ঘৃণা ও নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তে সবল সহিষ্ণু চিত্তবৃত্তি গঠন করে।[৬৫]

বিবেকানন্দ মনে করতেন যে সকল জাতিরই মেরুদন্ডস্বরূপ একটা মৌল আদর্শ থাকে—কারো রাজনীতি, কারো সামাজিক উন্নতি, কারো মানসিক উন্নতি বিধান, কারো-বা অন্য কিছু। সেদিক থেকে ভারতীয় জীবনের মূলভিত্তি হল ধর্ম। ধর্মই শিক্ষার সার। ধর্ম অর্থে তিনি কোনো সম্প্রদায়গত মতামত বলে মনে করতেন না। তাঁর কথায়—

> মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব পূর্ব হইতেই বর্তমান তাহার প্রকাশসাধনকে বলে ধর্ম। যে ভাবধারা পশুকে মানুষ এবং মানুষকে দেবতায় পরিণত করে তাহাই ধর্ম।[৬৬]

ধর্ম মানুষের অনন্ত শক্তি ও বীর্যের আধার। সুযোগসুবিধা পেলে সে শক্তি বিকশিত হয়। বিকশিত হোক বা না হোক সে শক্তি প্রতি মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে। তিনি প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। গুরুর সান্নিধ্যে থেকে শিষ্যের চারিত্রিক গঠন যে সুষ্ঠুই হয় তাই নয়—শিষ্য নিজ রুচি ও কৌতূহল অনুযায়ী গুরুর কাছে থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জনেরও সুযোগ পায়। সহানুভূতি, সেবাপরায়ণতা ইত্যাদি গুরুর সান্নিধ্যেই সহজে অর্জন করা যায়। সহজবোধ্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়াই ছিল স্বামীজির অভিমত। তাঁর মতে বিদ্যালয়ে ক্রমশ শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

দেশের জনশিক্ষার বিষয়ে বিবেকানন্দের আগ্রহ খুব বেশি দেখা যায়। যে-সমাজের চিত্র তাঁর অহরহ অনুধ্যানের বিষয় ছিল তার সার্থক রূপায়ণ একমাত্র জনশিক্ষার মাধ্যমেই যে হওয়া সম্ভব সেসম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। এবিষয়ে

তাঁকে অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্রের অনুবর্তী বলা যায়। জনশিক্ষা প্রসঙ্গে তাঁর চিন্তা আজ যেন অতি বেশি জরুরী বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন—

> যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সমর্থও হই তবু দরিদ্র-ঘরের ছেলেরা সেসব স্কুলে পড়িতে আসিবে না। কারণ, ভারতে দারিদ্র্য এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া তাহার পিতাকে কৃষিকার্যে সহায়তা করিবে অথবা অন্য কোনরূপ জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা করিবে ; সুতরাং যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সকল স্থানে পেঁছিতে হইবে।[৩৭]

জনশিক্ষার সঙ্গে নারীশিক্ষার বিষয়েও স্বামীজির সজাগ দৃষ্টি ছিল। এক্ষেত্রেও তিনি বৈদান্তিক চেতনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যখন একই চিৎসত্তা সর্বভূতে বিদ্যমান তখন নারীকে পৃথকভাবে দেখা অযৌক্তিক। বৈদিককালে অধিকারগত ব্যাপারে নারীপুরুষের মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রমুখ বিদুষীরা মান ও মর্যাদায়, বিদ্যায় ও জ্ঞানে মুনিঋষিদের সমকক্ষ ছিলেন। প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাপরিষদ সমূহেও বালক ও বালিকাদের অধিকার ছিল সমান। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা ব্রাহ্মনেতর জাতিকে কোণঠাসা করার সময় নারীকেও তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। স্বামীজি মেয়েদের বেশি বয়সে বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন ; তবে বিধবা বিবাহে তাঁর বিশেষ সমর্থন ছিল না। অন্যান্য বিষয়ে নিজ মতামত ব্যক্ত করার মতো বিবাহেও স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অধিকার নারীকে দেওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। স্ত্রী-জাতির অভ্যুদয় না হলে ভারতের কল্যাণ সম্ভাবনা সদূর পরাহত বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। স্বামীজি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে আদর্শ স্ত্রী-মঠ স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তিনি স্ত্রী-বিদ্যালয়ে পুরুষের সংশ্রব চাইতেন না। তাঁর মতে স্ত্রীলোকদের গৃহকর্মেই নিযুক্ত থাকা ভাল। প্রয়োজনে যাতে তারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় সেশিক্ষাও মেয়েদের থাকা উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

উপসংহার

দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারকরূপে পরিচিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত পরিচয় যে তিনি মূলত একজন মানবদরদী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। প্রেমের সাধনাতেই তাঁর জীবন ও মননের বিকাশ ও পরিপূর্ণতা ঘটে।

প্রচলিত ধর্মীয় অনাচার ও পৌত্তলিকতার অবসানকল্পে এবং হিন্দুধর্মের প্রতি খ্রীষ্টান পাদরিদের বিরূপ সমালোচনাকে প্রতিরোধ করার জন্যে রামমোহন বেদান্তপ্রচারে তৎপর হয়েছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি নবাগত পশ্চিমী সংস্কৃতির মূল্যবোধকেও সাদরে অভ্যর্থনা করেন। একদিকে স্বদেশের সনাতন ঐতিহ্য তথা ইহবিমুখ বৈদান্তিক মায়াবাদের আকর্ষণ, অন্যদিকে যুক্তিবাদী ঐহিক আদর্শের স্বাঙ্গীকরণ রামমোহনের অন্তর্বিরোধকে ফুটিয়ে তোলে। লর্ড আমহার্স্টকে লেখা তাঁর বিখ্যাত পত্রটিই একথার প্রমাণ। পক্ষান্তরে রামমোহনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত স্বামী বিবেকানন্দ বৈদান্তিক সাধনায় পৌত্তলিকতাকে বর্জন করেন নি। উপরন্তু পাশ্চাত্ত্যের মূল্যবোধকে ইহসর্বস্ব ও বস্তুবাদী বলে একপ্রকার পরিহারই করেছেন। পশ্চিমকে তিনি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার আদর্শে জয় করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য স্বদেশের রাজনৈতিক পরাধীনতা ও হীনমন্যতা থেকেই তাঁর এই প্রবণতার উৎপত্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তাঁরই সহজ ও সরল উপদেশগুলিকে স্বামীজি দার্শনিক ব্যঞ্জনায় প্রচার করেছিলেন বটে, কিন্তু গুরুশিষ্যের মধ্যে দৃষ্টিগত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। গুরু জীবের মধ্যে শিবকে দেখতে পেয়েছিলেন; আর শিষ্য জীবসেবার মধ্যে দিয়ে শিবকে পেতে চেয়েছিলেন; গুরুর মধ্যে সেবাব্রতের স্থান ছিল প্রচ্ছন্ন ও গৌণ। কিন্তু শিষ্য সেই সেবাব্রতকেই জীবনের মুখ্য আদর্শ করে তোলেন। গুরু ঈশ্বরকেই একমাত্র সত্য বলে মনে করতেন এবং তাঁর দৃষ্টি ছিল মূলত পারমার্থিক। বুদ্ধের প্রেমধর্মে উদ্বুদ্ধ শিষ্য মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্যে পারত্রিক চিন্তার পরিবর্তে বুদ্ধের মতো জীবের কল্যাণে আত্মনিয়োগের আহ্বান জানান। স্বামীজি বলেন—

> I do not believe in a God who cannot give me bread here, giving me eternal bliss in heaven ![১৮]

মানবপ্রেমের জন্যেই তাঁর মননধারায় প্রবল অন্তর্বিরোধ দেখা দেয়; সেইসঙ্গে গুরুনির্দিষ্ট আদর্শ ও নিজের আচরণেও। তাঁর মানবপ্রেমের মধ্যে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে তাঁর আদর্শে সবার উপর মানুষ সত্য একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয় নি। তিনি সর্বোপরি পরম সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। বস্তুত জীবসেবার মধ্যে দিয়ে তিনি শিবকেই সেবা করতে চেয়েছিলেন। শিবকে পাবার জন্যেই মানুষকে সেবা করা। সেক্ষেত্রে মানুষ একটা মাধ্যম (medium) মাত্র, চূড়ান্ত লক্ষ্য (end) নয়।

যুক্তিতর্কে স্বামীজির বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কিন্তু যুক্তিবাদকে তিনি পরিহার করেন। তাঁর কাছে যুক্তির সীমারেখা ছিল নির্দিষ্ট; সেই সীমাকে অতিক্রম করে তিনি অনুভূতি ও অতীন্দ্রিয় চিন্তাকে প্রাধান্য দেন: এবং মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়কেই বড় করে দেখেন। শংকরের কঠোর মায়াবাদে সম্পূর্ণ

প্রভাবিত হয়েও হৃদয়াবেগের ফলে তিনি মানবসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে বেদান্তপ্রচার অপেক্ষা সেবাব্রতই তাঁর কাছে বড় হয়ে ওঠে।

তিনি চাইতেন মোক্ষ (emancipation), মুক্তি (freedom) নয়। সেই কারণেই তিনি একসময়ে ঈশ্বর বিমুক্ত মানবকল্যাণ অসম্ভব উপলব্ধি করেই অধীর হয়ে পড়েছিলেন। নিখাদ বস্তুতন্ত্রী যুক্তিবাদী প্রত্যয়ের আশ্রয়ে গঠিত নীতিতত্ত্ব তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। মঙ্গলময় ঈশ্বরের শাশ্বত শুভ অভীপ্সার সঙ্গে মানবিক কল্যাণকে সমন্বিত করে তিনি মানুষের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশসাধনে ব্রত হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন ঐহিক উন্নতি ব্যতীত আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্ভব নয়। সেই দৃষ্টিতেই তিনি সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু স্বতন্ত্র মত ও পথে। তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও মানবতন্ত্রী আদর্শের মূলে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি সুপরিস্ফুট।

কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পূর্বসূরীদের মতো স্বামীজীও মনে করতেন যে আধ্যাত্মিক ভিত্তিতেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তাৎপর্যপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করবে। মানুষের নীতিবোধ আর আত্মিক উন্নতির মূলে আধ্যাত্মিক প্রেরণা নিহিত থাকে। তাঁর মতে যান্ত্রিক প্রণালীতে গঠিত জাতীয়তাবাদী কর্মতৎপরতা স্থায়িত্ব লাভ করবে না; নেশনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে জনচিত্তে ত্যাগ, নিষ্ঠা, পবিত্রতা ও নিস্পৃহ মনোভাব সঞ্চার করা দরকার। স্বামীজি পরমতে সহিষ্ণু ছিলেন; ধর্ম, লোকাচার বা শ্রেণীবিশেষের আধিপত্য ও উৎপীড়নকে কখনই ভাল চোখে দেখতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশে—সমাজ বা ধর্মের অনুশাসনে নয়।

স্বামীজির রাষ্ট্রচিন্তায় ভারতীয় সমাজবিবর্তনের এক নতুন বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সমকালীন রাষ্ট্রীয় দুর্গতির তিনি নানা প্রতিকার দর্শিয়েছেন। তাঁর আধ্যাত্মিক মুক্তির বাণী যেমন দেশের সংগ্রামী কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তেমনি তাঁর উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রভাব উত্তরকালে অরবিন্দ, টিলক, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ জননেতাদের মনে প্রতিফলিত হয়েছিল। সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা না করলেও স্বামীজির আদর্শ ও আচরণ প্রকারান্তরে ইংরেজ শাসনেরই প্রতিকূল মনোভাব সঞ্চার করে। উত্তর-কালে পরাধীনতার গ্লানি থেকেই দেশবাসীর ইংরেজ বিদ্বেষ পাশ্চাত্ত্যবিদ্বেষে পরিণত হয়। ক্রমে সেই বিদ্বেষ আধুনিকতার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

দেশ যখন আত্মগ্লানি, নিস্পৃহা ও হতাশায় নিমজ্জমান সেসময়ে বিবেকানন্দ লোকের বুকে আশা, আত্মশক্তি ও নির্ভীকতার ভাষা যুগিয়েছিলেন, নিশানা দিয়েছিলেন নতুন পথের। বিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের গতি সহসা যে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে, তার পিছনে বিবেকানন্দের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস-গবেষণায় স্বামীজির চিন্তা ও ভূমিকা মূল্যবান উপাদান।

উৎস নির্দেশ

১ Si ter Nivedita. *The Complete Works.* Vol. 3. 1967. p 286

২. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙ্গলায় ঊনবিংশ শতাব্দী'। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ। পৃ ২৩০।

৩. Manabendra Nath Roy. *India in Transition.* 1922. p. 193.

৪. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। "বিবেকানন্দের রূপান্তর"। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শংকর সম্পাদিত 'বিশ্ববিবেক'। ১৯৬৩। পৃ ৯৭।

৫ তদেব। পৃ ৯৮।

৬. তদেব।

৭. তদেব।

৮. তদেব। পৃ ১০১। এই বইয়ের ১ম খণ্ডের ১৫৩ পৃষ্ঠায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পরিচ্ছেদে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দের দীক্ষাগ্রহণ প্রসঙ্গে তাঁর সহপাঠী ব্রজেন্দ্রনাথের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'স্বামী বিবেকানন্দ'। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। ৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

১০. স্বামী অখণ্ডানন্দ। 'স্মৃতিকথা'। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ। পৃ ১০৮।

১১ *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples. 1960. p. 331.

১২. *Letters of Swami Vivekananda.* p. 175

১৩. *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples. 1960. p. 501.

১৪. *Ibid.* p. 502.

১৫. *Ibid.* p. 507.

১৬. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। খণ্ড ৫। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পৃ ২৬। ('ভারতে বিবেকানন্দ')।

১৭. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'স্বামী বিবেকানন্দ'। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। পৃ ৫।

১৮. R. C. Majumdar. *Swami Vivekananda : A Historical Review.* 1965. pp. 64-85.

১৯. *The Complete Works of Swami Vivekananda.* Vol. 3. 1960. p. 242.

২০. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। খণ্ড ২। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পৃ ১০৮। ('জ্ঞানযোগ')।

২১. তদেব। পৃ ৬।

২২. তদেব। পৃ ২৯৫-৬।

২৩. তদেব। পৃ ৪৪৬-৭।

২৪. তদেব।

২৫. সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। 'ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা'। পৃ ১১-১২।

২৬. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। খণ্ড ২। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পৃ ২৩৫-৬। ('জ্ঞানযোগ')।

২৭. তদেব। পৃ ৩৪৫।

২৮. তদেব। পৃ ৩০৮।

২৯. তদেব। পৃ ৩৫১।

৩০. তদেব। খণ্ড ৬। পৃ ২৩১-২৪৫। ('বর্তমান ভারত')।
৩১. তদেব। পৃ ২৩২। ৩২. তদেব। পৃ ২৩১।
৩৩. তদেব। পৃ ১৮, ২৬। ৩৪. তদেব। পৃ ৩৭।
৩৫. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol. 5. 1955. pp. 317, 406.
৩৬. *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples. 1960, p. 624. ৩৭. *Ibid.* p. 619.
৩৮. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol. 4. 1955. p. 368.
৩৯. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। পৃ ২৭২।
৪০. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। খণ্ড ৬। ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ। পৃ ২০৯। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')।
৪১. *The Life of Swami Vivekanada* by his Eastern and Western Disciples. 1960. pp. 291, 582.
৪২. *Ibid.* p. 586.
৪৩. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। খণ্ড ৫। ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। পৃ ৩৯৪।
৪৪. তদেব। খণ্ড ৬। পৃ ২৩৮। ('বর্তমান ভারত')।
৪৫. তদেব। পৃ ২৪৩।
৪৬. তদেব। পৃ ১৬১। ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য')।
৪৭. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol 5. 1955. p. 210.
৪৮. *The Life of Swami Vivekananda* by his Eastern and Western Disciples. 1960. p. 575.
৪৯. 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা'। ১৩৭১। বঙ্গাব্দ। পৃ ১৯৮-১৯৯।
৫০. তদেব। খণ্ড ৭। পৃ ৯ ('পত্রাবলী' খণ্ড ১। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ. পৃ ২৮১-৮৩)।
৫১. তদেব। খণ্ড ৬। পৃ ২৩৬। ('বর্তমান ভারত')।
৫২. তদেব। পৃ ২৩৭। ৫৩. তদেব। পৃ ২০৮, ২২২-২২৪।
৫৪. তদেব। খণ্ড ৯। পৃ ৪৫১। ('কথোপকথন')।
৫৫. স্বামী বিবেকানন্দ। 'পত্রাবলী'। খণ্ড ২। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। পৃ ৪৪৮।
৫৬. তদেব।
৫৭. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol. 8. 1955. p. 476.
৫৮. *Ibid.* Vol. 6. p. 342.
৫৯. সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। "বিবেকানন্দ ও সোসালিজম", অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য সম্পাদিত 'বিশ্ববিবেক'। ১৯৬৩। পৃ ২৯২।
৬০. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol. 4. 1955. p. 368.
৬১. রোমাঁ রোলাঁ। 'বিবেকানন্দের জীবন ও বিশ্ববাণী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। পৃ ১৪৪।
৬২. স্বামী বিবেকানন্দ। 'শিক্ষা প্রসঙ্গ'। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
৬৩. তদেব। পৃ ৩। ৬৪ তদেব। পৃ ১১। ৬৫. তদেব। পৃ ৫৯-৬৩।
৬৬. তদেব। পৃ ৬৬। ৬৭. তদেব। পৃ ১৪৩।
৬৮. *The Complete Works of Swami Vivekananda*. Vol. 8. 1955. p. 476.

শ্রীঅরবিন্দ ॥ ১৮৭২-১৯৫০

রামমোহনের মনন ও সাধনার অভিঘাত উনিশ শতকের শেষ থেকেই শক্তিহীন হতে শুরু করে। অরবিন্দের চিন্তায় রামমোহনের বিশেষ প্রভাব লক্ষিত হয় না, যদিও তিনি তিন পুরুষে ব্রাহ্ম ছিলেন। মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব তাঁর মনে আংশিকভাবে প্রতিফলিত হয়। বিবাহ করার আগে তিনি হিন্দুমতে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাই ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। 'আনন্দ মঠ'-এর আদর্শে অরবিন্দ ভবানী মন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের যোগদর্শন ও বৈদান্তিক চিন্তা তাঁর মনে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। অরবিন্দ বৈদান্তিক ভাবধারার সঙ্গে পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনকে সংমিশ্রিত করেন। তাঁর রাজনৈতিক বৈদান্তিকতা শুধু উপনিষদের পুনরুক্তি নয়—উপরন্তু তাকে পরাধীন দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভ্যুন্নতির উপযোগী এক সুস্পস্ট জীবনদর্শন বলে মনে করা হয়।

উচ্চ শিক্ষার জন্যে শৈশবেই অরবিন্দকে বিলাতে পাঠানো হয়েছিল। আই. সি. এস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েও অশ্বারোহণে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবতীর্ণ না হয়ে তিনি সার্ভিসে যোগদানের অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। মন তখন তাঁর রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট। বিলাতে দাদাভাই নৌরজির পার্লামেন্টে নির্বাচনদ্বন্দ্বে অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মতো তাঁরও মন উদ্দীপিত হয়। কেমব্রিজের ভারতীয় মজলিশে তিনি রাজনীতির উপর বক্তৃতা দিতেন। ঐসময়ে তিনি সেখানে Lotus and Dagger নামে গঠিত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের এক গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হন।

প্রবাসজীবনের চোদ্দটি বছর তাঁর কাটে গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যচর্চায়। ইউরোপের অন্যান্য ভাষাতেও তাঁর সমধিক জ্ঞান থাকায় তিনি সমুদয় ক্লাসিক গ্রন্থ মৌলিক রচনায় অধ্যয়ন করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বরোদা রাজ্যে প্রথমে প্রশাসনকার্যে এবং পরে বরোদা কলেজের সহ-অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কলেজে তিনি ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন।

বরোদায় অবস্থানকালে (১৮৯৩-১৯০৬) তিনি দেশের রাজনৈতিক দুর্গতি উপলব্ধি করে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় 'New Lamps For Old' শীর্ষক প্রবন্ধ-মালায় নিজের নাম গোপন রেখে লেখা শুরু করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কংগ্রেস তখন শৈশবাবস্থায়। তদানীন্তন কংগ্রেসের কর্মপন্থা তাঁর কাছে রুচিকর ছিল না। তাকে তিনি 'political mendicancy' এবং কংগ্রেসকে 'unnational Congress' বলে অভিহিত করেন। তিনি লিখেছিলেন—

a body like the Congress, which represents not the mass of

the population, but a single and very limited class, could not honestly be called national.[১]

সে সময়ে শুধু প্রবন্ধ লিখেই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। ঠাকুর সাহেব নামে পরিচিত জনৈক রাজপুতের অধিনায়কত্বে গঠিত একটি গুপ্ত বিপ্লবী দলে অরবিন্দ যোগ দিয়েছিলেন। সেইসূত্রেই তিনি মধ্যভারত ও বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক সংগঠনকর্মে প্রবৃত্ত হন (১৯০২)। বরোদা থেকে ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী)-কেও সেই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মতৎপরতার তিনটি দিক ছিল। প্রথমত স্বাধীনতা-আদর্শের প্রচার ও সর্বহারাদের স্বার্থে কংগ্রেস দখল করা; দ্বিতীয়ত, বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ভিত্তিতে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রয়াস; তৃতীয়ত, বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন।[২] আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসংবাদের ফলে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি গঠন ও বৈপ্লবিক তৎপরতার প্রথম প্রয়াস (১৯০২-০৪) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

রাষ্ট্রচিন্তায় ইংরেজদের অনুসরণ না করে ফরাসিদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ গ্রহণেরই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। আইরিশ বিপ্লবী চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল (১৮৪৬-৯১)-এর তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং স্বাধীন আয়াল্যান্ড আদর্শের দাবিতে গঠিত (১৮৯৯) 'সিন ফিন' আন্দোলন সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তবে উক্ত আন্দোলনের পূর্বেই অনুরূপ চিন্তা তাঁর মনে অংকুরিত হয়েছিল এবং তাঁর কর্মপদ্ধতি 'সিন ফিন' আন্দোলন থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ছিল। ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, মধ্যযুগে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের অনমনীয় মনোভাব এবং ইতালির মুক্তি সংগ্রাম থেকে অরবিন্দ প্রেরণা লাভ করেন। যোয়ান অব আর্ক ও মাৎসিনি ছিলেন তাঁর আদর্শ। বঙ্কিমের জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রচিন্তা তাঁর মনকে বিশেষ আকর্ষণ করে; তাঁর মতে দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান। বরোদায় অবস্থানকালে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ (১৮৯৪) লিখেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বহু গ্রন্থের অনুবাদ ও কাব্যরচনায় আত্মনিয়োগ করে তিনি চিরায়ত শিল্পীর খ্যাতি অর্জন করেন। অধ্যাপনা ও সাহিত্যসেবার মধ্যে দিয়ে যে-সুর অনুক্ষণ তাঁর হৃদয়ে অনুরণিত হত তাহল দেশের জনশক্তিকে জাতীয় ঐতিহ্যে, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে ও স্বাধিকার অর্জনে উৎসাহদানের আবেগ। স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার আগে স্ত্রীকে লেখা এক পত্রে (১৯০৫) তাঁর তখনকার মনোভাব জানা যায়—

১. আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই ভগবানের, যাহা পরিবারের ভরণপোষণে লাগে আর যাহা নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার

অধিকার, যাহা বাকি রহিল, ভগবানকে ফেরৎ দেওয়া উচিত...ভগবানকে দেওয়ার মানে কি, মানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করা।.. এই দুর্দ্দিনে, সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রিত, আমার ত্রিশ কোটি ভাইবোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনাহারে মরিতেছে, অধিকাংশই কষ্টে ও দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের হিত করিতে হয়...।

২. আজকালকার ধর্ম্ম, ভগবানের নাম কথায় কথায় মুখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে দেখান আমি কি ধার্ম্মিক! তাহা আমি চাই না। ঈশ্বর যদি থাকেন তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার, কোন না কোন পথ থাকিবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আমি সে পথে যাইবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া বসিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মে বলে, নিজের শরীরের নিজের মনের মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, সেই সকল পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছি ...।

৩ অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলো মাঠ ক্ষেত্র বন পর্ব্বত নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি; ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপব বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্তভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার পায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত...।[৩]

বোম্বাই কংগ্রেসে (১৯০৪) যোগদান থেকেই অরবিন্দ প্রকাশ্য রাজনীতিতে ক্রমশ অগ্রসর হন। সেবারই চরমপন্থীদের অস্তিত্ব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। চরমপন্থীরা একটি জাতীয় আবেগের ভিত্তিতে আরো প্রত্যক্ষ ও সংগ্রামী কর্মপন্থা গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তখন তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য, শক্তিতে ক্ষীণ। বেনারস কংগ্রেস (১৯০৫)-এর পূর্বে তাঁদের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও জনপ্রিয়তা নরমপন্থীদের সচকিত করে দেয়। কিন্তু কলকাতা কংগ্রেস (১৯০৬)-এ চরমপন্থীরা নরমপন্থীদের সঙ্গে রণভঙ্গ দিয়ে অধিবেশন থেকে বেরিয়ে আসেন। কলকাতা কংগ্রেসে অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের পুরোধা। চরমপন্থীরা অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলেও তাঁদের চাপে চারটি বিষয়ে নরমপন্থীদের সম্মতি দিতে হয়েছিল। প্রস্তাবাকারে গৃহীত সেই বিষয়গুলি ছিল স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশী পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশী বস্তু বয়কট।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে অরবিন্দের গুপ্ত সমিতি গঠন ও বৈপ্লবিক প্রয়াস

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল (১৯০২-০৪)। বঙ্গব্যবচ্ছেদের (১৯০৫) ফলে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে প্রজ্জ্বলিত বাংলার বৈপ্লবিক আবেগবহ্নি প্রত্যক্ষ করে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চয়ের জন্যে তিনি বরোদায় ফিরে যান এবং 'ভবানী মন্দির' নামে এক পুস্তিকায় তিনি তাঁর কর্মপন্থা ব্যক্ত করেন (১৯০৫)। অতঃপর সেখানকার কাজে বরাবরের মতো ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে দৈনিক 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সম্পাদনাকার্যে যুক্ত হন এবং বাংলার বিপ্লবীদের ঐক্যবদ্ধ করেন (১৯০৬)। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে বহু ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সমুদয় কলেজ বর্জন করে। তাদের জন্যে জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ' গঠিত হয়। অরবিন্দ তার অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দায়ে সরকার কর্তৃক আনীত এক মামলার দরুন তিনি পর্ষদের অধ্যক্ষপদ কিছুকালের মতো পরিত্যাগ করেছিলেন।

সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭)-এ নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। তার আগে বাংলাদেশে মেদিনীপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে একটা মহড়া হয়ে যায়। অরবিন্দ সদলবলে সুরাটে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি টিলক, খাপার্দে প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে একই মতাবলম্বীরূপে পান। সুরাট কংগ্রেস ভণ্ডুল হয়ে গেলে অরবিন্দের সভাপতিত্বে চরমপন্থীরা স্বতন্ত্র এক সম্মেলনে মিলিত হন। এখন থেকে অরবিন্দের নেতৃত্ব ও জনপ্রিয়তা ক্রমে সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়।

সুরাট থেকে ফেরার পথে অরবিন্দ বরোদায় তাঁর দীক্ষাদাতা বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন। পথিমধ্যে বিভিন্ন জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে ভক্তি, ত্যাগ ও সাহসিকতার মধ্যে দিয়ে আত্মোপলব্ধি ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব দেখা দিলে ত্রিশ কোটি মানুষের ভিতর ঈশ্বর প্রকাশমান হয়ে উঠবেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি গতানুগতিক রাজনৈতিক কর্মধারা থেকে পৃথক পথ রচনার উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে দেন। 'বন্দেমাতরম'-এ (১২ জানুয়ারি, ১৯০৮) তিনি লেখেন—

> The old organizations have to be reconstituted to adapt themselves to the new surroundings. The death complained of is only a transition. The burial ground of the old Congress, as the Saxon phrase goes, only God's-Acre out of which will grow the real, vigorous, popular organization.[8]

তবে তিনি কংগ্রেসের বিবদমান দুটি দলের মিলনসাধন চিন্তায় যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না তা তাঁর ঐসময়কার বক্তৃতাগুলি থেকে জানা যায়। নীতিগতভাবে তিনি শান্তির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু দেশের পুনরুজ্জীবনকল্পে হিংসাত্মক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন। তাঁর নীতির প্রেক্ষাপট ছিল গীতার 'ধর্মযুদ্ধ'।

বঙ্গভঙ্গোত্তর স্বদেশী আন্দোলন ক্রমেই যখন তীব্র আকার ধারণ করে তখন সরকারি নিপীড়ন ও দমননীতি নিরঙ্কুশ গতিতে এগিয়ে চলে। ফলে দেশের যুবশক্তি সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবী কর্মনীতি গ্রহণ করে। কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে দেশের তিনটি রাজনৈতিক দলীয় ধারা লক্ষণীয় : ১. নরমপন্থী ধারা : নেতা—সুরেন্দ্রনাথ। লক্ষ্য— ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অর্জন। প্রণালী— সভাসমিতি, বক্তৃতা ও আবেদন-নিবেদন ; ২. চরমপন্থী ধারা : নেতা— বিপিনচন্দ্র। লক্ষ্য— পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রণালী— নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ; ৩ বৈপ্লবিক ধারা : নেতা— অরবিন্দ ও নিবেদিতা। লক্ষ্য—ইংরেজ বিবর্জিত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। প্রণালী— বোমারিভলভারযুক্ত বৈপ্লবিক গুপ্তহত্যা ও ডাকাতি।[৫]

অরবিন্দ রাজনৈতিক ডাকাতি ও গুপ্তহত্যা কর্মতৎপরতার অধিনায়করূপে অভিযুক্ত হয়ে বৎসরকাল (১৯০৮-০৯) বিচারাধীনে কারারুদ্ধ থাকেন। তাঁর এই কারাজীবন পরবর্তীকালের চিন্তাভাবনার দিক থেকে বিশেষ অর্থবহ। মুরারিপুকুর ষড়যন্ত্র নামে খ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ শেষাবধি নির্দোষ সাব্যস্ত হন।

কারামুক্তির পর অরবিন্দ প্রত্যক্ষ করেন যে দেশের আগের সেই উদ্দীপনা আর নেই—দীপান্তর, কারাদণ্ড, নির্বাসন, রাজনীতি পরিত্যাগ প্রভৃতি নানা কারণে পুরাতন সহকর্মীরাও পাশে অনুপস্থিত। তাই উত্তরপাড়া ভাষণে তাঁর কণ্ঠে এক করুণ সুর বেজে ওঠে—

I looked round when I came out, I looked round for those, to whom I had been accustomed to look for counsel and inspiration. I did not find them. There was more than that. When I went to jail the whole country was alive with the cry of Bandemataram, alive with the hope of nation, the hope of millions of men who had newly risen out of degradation. When I came out of jail I listened for that cry, but there was instead a silence.[৬]

দেশের তখনকার সেই নিস্তেজ ও নিস্তরঙ্গ পরিস্থিতি দেখে তিনি একটুও বিচলিত হন নি। ঐশ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সম্পর্কে বলেন যে দমননীতি যেন ঈশ্বরের হাতুড়ি— যাদিয়ে পিটিয়ে তিনি আমাদের একটি শক্তিশালী নেশনে পরিণত করতে চান এবং আমাদের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে বিশ্বকে পরিচালনা করাই তাঁর ইচ্ছা। তিনি আমাদের ধ্বংস চান না, ছাঁচে লোহা পেটানোর মতো তিনি আমাদের নবরূপে সৃষ্টি করতে চান।[৭]

বাংলাদেশে চরমপন্থা 'ন্যাশন্যালিস্ট' দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় অরবিন্দ

নতুন কর্মসূচি হিসেবে ১৯০৯ সালে ইংরেজিতে 'কর্মযোগিন' ও বাংলায় 'ধর্ম' নামে দুটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। কর্মযোগিনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন যে সাপ্তাহিক সংবাদ পরিবেশন অপেক্ষা জাতীয় পরিস্থিতির পর্যালোচনাই হবে তার প্রধান কাজ। সমকালীন জনমন ও জাতীয় জীবন গঠনের অনুকূল অথবা প্রতিকূল সংবাদই কেবল তাতে পরিবেশিত হবে আর কর্মযোগ প্রচারই হবে তার আদর্শ। জীবনে বেদান্ত ও যোগাদর্শ প্রয়োগই হল কর্মযোগ। দেশের প্রতিটি মানুষ যাতে প্রাত্যহিক জীবনে কর্মযোগ অভ্যাস করে সেই আদর্শ তুলে ধরাই হবে তার কাজ।

রাজনৈতিক বাতবিতণ্ডা থেকে তিনি সম্পূর্ণ সরে থাকেন নি। মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার (১৯০৯) প্রয়াস যে পরিণামে আরও অনৈক্য ও ক্ষতির কারণ হবে সে বিষয়ে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। দেশবাসীর কর্তব্য সম্পর্কে তিনি পাঁচ দফা এক কার্যক্রম উপস্থাপিত করেন: ১. নিরন্তর প্রয়াস; ২. আইন মেনে চলা; ৩. শান্তিপূর্ণ উপায়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া; ৪. কংগ্রেসের ঐক্যসাধন ও তার নবরূপায়ণ; ৫ পূর্ব অনুসৃত বয়কট প্রভৃতি কর্মপন্থা অন্যান্য প্রদেশে সম্প্রসারণ।

দেশের মধ্যে বিশেষ সাড়া না পেয়ে তাঁর উৎসাহ নিষ্প্রভ হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও ১৯০৯ সালে হুগলী প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি তাঁর অভিমত গ্রহণ করাতে সক্ষম হন। এই সময়ে অরবিন্দের উপর পুলিশের আবার বিষনজর পড়ে। প্রথমে কিছুদিন চন্দননগরে আত্মগোপন করে থেকে পরে সবার অলক্ষ্যে পণ্ডিচেরি চলে যান। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। সেখানে তিনি গভীর যোগসাধনায় নিমগ্ন হন এবং 'আর্য' (১৯১৪) নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন।

অরবিন্দের সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে যাওয়াকে অনেকে পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করেন। বস্তুত রাজনীতিকে আমরণকাল যথোচিত গুরুত্ব দিতে তিনি পশ্চাৎপদ হন নি। গোড়া থেকেই তাঁর জীবনাদর্শ ছিল ভিন্ন এবং রাজনৈতিক জীবনেও তাঁর সেই আদর্শের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। মানসিক প্রবণতা তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার প্রতিকূল ছিল। প্রকাশ্য আন্দোলনের অন্তরালে থেকে নির্দেশদান ও মানুষ গড়াই ছিল তাঁর প্রকৃত অভিপ্রায়। প্রত্যক্ষ রাজনীতির নিষ্ফলতা ও জীবনাদর্শ পূর্তির ক্ষীণ সম্ভাবনা উপলব্ধি করে তিনি রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করেন এবং বলেন যে ভগবানই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করবেন, আর যথাসময়েই স্বাধীনতা অর্জিত হবে; এখন সকলের কর্তব্য যোগস্থ হয়ে কাজ করা—ভগবানে আত্মসমর্পণ করাই হল যোগসাধনার প্রথম পদক্ষেপ। কারাগারে তিনি বাসুদেবের এই মর্মেই "আদেশ" পেয়েছিলেন। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেও তিনি খুব বড় করে দেখেন নি। স্বাধীনতা মানুষের যে

একটি মৌল প্রয়োজন এবং সে-অধিকার যে ভারতীয়রা অচিরেই পাবে সে-সম্পর্কে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মন মানুষের বৃহত্তর প্রয়োজন ও সমস্যার চিন্তায় নিমগ্ন থাকত। নিছক জৈব অস্তিত্বেই মানুষের জীবন পরিপূর্তি লাভ করে না; তাকে আয়ত্তে এনে অতিক্রম করা এবং উন্নততর অতিমানসের পর্যায়ে উন্নীত হওয়াই তাঁর মতে মানুষের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। সেই লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবার জন্য অধিকতর কর্মশক্তি অর্জনকল্পে তিনি বহু আগে থেকেই যোগসাধনার প্রয়োজন অনুভব করেন (১৯০৪)। তাই তাঁকে সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭) থেকে ফেরার পথে গুরু বিষ্ণু ভাস্কর লেলে-র সঙ্গে পরিভ্রমণ ও যোগসাধনায় রত থাকতে দেখা গিয়েছিল। কারামুক্তির পর উত্তরপাড়া ভাষণেও তাঁর জীবনাদর্শ ও কর্মপন্থার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছিলেন। তাছাড়া পশ্চিমী ধাঁচের রাষ্ট্রস্বাধীনতায় তাঁর আস্থা ছিল না। আত্মার প্রকৃত মুক্তি ও প্রেরণার উৎসের সন্ধানই ছিল তাঁর কামনা। তিনি বলেন—

> We do not believe that by changing the machinery, so as to make our society the ape of Europe we shall effect social renovation···It is the spirit alone that saves, and only by becoming great and free in heart can we become socially and politically great and free.[৮]

আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিষয়ে গভীর অনুধ্যান এবং 'দিব্যজীবন' দর্শন প্রচারই শ্রীঅরবিন্দের পরবর্তীকালে প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। ১৯২৬ সালে পন্ডিচেরিতে অরবিন্দ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমটি কোনো সন্ন্যাস-ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কেন্দ্র নয়। সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের কোনো আদর্শ সেখানে প্রচারিত হয় না। যোগসাধনা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই অনাড়ম্বর আশ্রম-জীবনের উদ্দেশ্য। যোগসাধনায় শ্রীঅরবিন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ নামক এক প্রাচীন যোগী এবং বিষ্ণু ভাস্কর লেলের কাছে প্রেরণা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে পন্ডিচেরিতে শ্রীমার (মাদাম মিরা রিশার) সাহচর্যে সংগঠিত-প্রয়াসস্বরূপ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলিক চিন্তাপ্রসূত, সুদূরপ্রসারিত ও জ্ঞানগর্ভ যেসব গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন সেগুলির অধিকাংশই তাঁর সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর (১৯১০) গ্রহণের পর লিখিত। *Life Divine, Essays on the Gita, Synthesis of Yoga, Savitri* প্রভৃতি গ্রন্থের নাম সুবিদিত। ভারতীয় দর্শনের আশ্রয়ে তাঁর মননজীবন গঠিত হলেও পাশ্চাত্ত্য চিন্তাভাবনারও তিনি সমধিক গুণগ্রাহী ছিলেন।

প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে থাকলেও রাজনৈতিক আলাপআলোচনা ও পরামর্শদানে তিনি কোনো দিনই পরাঙ্মুখ হন নি। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসে মধ্যে বিখ্যাত লখনৌ প্যাক্ট (১৯১৬)-এর অপরিণামদর্শিতা সম্পর্কে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। মন্টেগু সংস্কারের সময়ে (১৯১৯) তিনি তার

শুভ লক্ষণ প্রত্যক্ষ করেন। ফ্যাসিবাদকে তিনি যাবতীয় গণতন্ত্রী মূল্যবোধের পরিপন্থী এবং সভ্যতার সংহারক বলে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়ে মানবেন্দ্রনাথের মতো ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে নিঃশর্ত সহযোগিতা করাই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত। তাই সেসময়ে তিনি ক্রিপ্‌স প্রস্তাব গ্রহণের উপদেশ দিয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তাঁর শুভেচ্ছাবাণীতে শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন যে জীবনের চারটি স্বপ্ন তাঁর বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে—

১. ভারতের স্বাধীনতা ; ২. এশিয়ার মুক্তি ; ৩. বিশ্বসংঘের মাধ্যমে বিশ্বজনীন ঐক্যের প্রয়াস ; ৪. সারাবিশ্বে ভারতীয় ভাবাদর্শের প্রসার।

তাঁর পঞ্চম ও শেষ যে-স্বপ্নটি ছিল তাহল জৈব বিবর্তনধারায় মানুষকে আর একটি ধাপে উন্নীত করা—অর্থাৎ, পশুত্বের স্তর অতিক্রম করে বুদ্ধিজীবীর স্তরে উপনীত মানুষকে দিব্য প্রক্রিয়ায় অতিমানসের স্তরে বিকশিত ও উন্নীত করা।[১]

শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে ভারতের অতীন্দ্রিয় ভাববাদ যেমন প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি প্রতীচ্যের বস্তুতন্ত্রী চিন্তাও সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তাঁর মতে ভারতীয় দর্শনে একাধারে ভাববাদ ও চার্বাক প্রমুখ দার্শনিকদের বস্তুবাদ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পার্থিব জীবনের সঙ্গে আধ্যাত্মিক চিন্তার অসংগতি ক্রমে ভারতীয়দের মনে জাগতিক বিষয়ে বৈরাগ্যের সৃষ্টি করে ; ইহজীবনের অনিত্য প্রত্যয় সেই মনোভাবকে দৃঢ় করে তোলে। ফলে জনমন ও তার শক্তি হীনবীর্য ও ক্ষীণ হয়ে পড়ে ; বাস্তব দুনিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশকে ক্রমে পেছিয়ে পড়তে হয়। মায়া, মোক্ষ, নির্বাণ প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্যে মানুষ জীবনযুদ্ধে রিক্ত হয়ে পড়ে। তিনি লিখেছেন—

> ভাবের উপর ভর করে চৈতন্যের ধর্ম্ম গড়ে উঠেছিল, কিছুদিনের জন্য চৈতন্যধর্ম্মের intensity খুবই প্রবল হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞান সাধনার অভাবে উহা টিঁকে নাই ; বুদ্ধের ধর্ম্ম শুধু জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু সেখানেও ছিল না higher বিজ্ঞান।[১১]

পৃথিবীর প্রাচীন সকল সভ্যতাতেই ভাববাদের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ভারতভূমিই যেন এই চিন্তার উর্বরতম স্থান ; ইউরোপে ডিমোক্রিটাস থেকে মার্কস অবধি বহু বস্তুতান্ত্রিক দার্শনিককে পাওয়া যায়—এঁর মধ্যে সবাই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না—তাহলেও বিজ্ঞানমুখী চিন্তার আধিক্যে পাশ্চাত্ত্যে

নাস্তিক বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাভাবনারই আধিপত্য বেশি। একদিকে সেখানে চলেছে প্রকৃতিকে জয় করার অভিযান, অন্যদিকে যুক্তিনিষ্ঠ সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা। এই বিজ্ঞানচেতনা মানুষের কাছে প্রাকৃতিক ও সামাজিক বিবর্তনের রহস্য ক্রমেই উদ্‌ঘাটিত করে দিচ্ছে; সেই প্রণোদনাতেই সভ্যতার সম্পদ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র প্রভৃতির মাধ্যমে মনুষ্যত্ব ও মানবতন্ত্রী আদর্শের রথ এগিয়ে চলেছে; জয়যুক্ত ও বিকশিত হচ্ছে মানুষের সৃজনী ধর্ম। কিন্তু তবুও কেন যেন মানুষের অন্তরাত্মা সদাই কেঁদে মরছে। বস্তুতন্ত্রী মনস্তত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে যে জৈব বিবর্তনের সর্বোচ্চ ধাপ হল আত্মা—সেই আত্মার পবিত্র পরিতৃপ্তি বর্তমান পরিবেশ জনিত কারণে বিঘ্নিত হচ্ছে। কই, আজ আরতো কোনো বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট জন্মাচ্ছেন না! শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেছেন যে, প্রতীচ্যের সঙ্গে ভারতও এখন অবক্ষয়ের পথে চলেছে। সেজন্যে তিনি চেয়েছেন এমন এক জীবনদর্শন যা হবে প্রতীচ্যের নাস্তিক বস্তুবাদ ও ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের হরগৌরীমিলনস্বরূপ। জড় ও আত্মা—উভয়কেই যা দেবে সমান গুরুত্ব। তিনি তাঁর যুগান্তকারী দর্শনে এই সমন্বয়ের কথা বলেছেন।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে আধ্যাত্মিকতা শুধুমাত্র এক স্থিতিশীল, অপরিবর্তনীয় ও চিরন্তন বিষয়ই নয়; তন্মধ্যে গতিশীল পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের গুণও নিহিত। এক ও বহু উভয়ই সত্য। বিশ্বচরাচর চিরন্তনী সত্তার (real being) দ্বারা সৃজিত—তা কেবল অন্তর্মুখী কল্পনার ছায়া নয় কিংবা এক বিরাট শূন্যতা অথবা নিরস্তিত্বও নয়। তাঁর চোখে জড় ও আত্মা অভিন্ন। জড় আত্মারই আধার। জাগতিক ও জৈব বিবর্তনের ধারায় সীমিত চেতনার ফলে আত্মা প্রথমে নিশ্চেতন রূপই নেয় এবং নিশ্চেতন বিবর্তন ধারায় ক্রমপর্যায়ে জড়, জীবন ও মনের উদ্ভব ঘটে। 'দিব্য-জীবন' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—

> জড়বাদও যেমন আজ দিব্য-পুরুষের দিব্য ক্রতুর-সাধন; বৈরাগ্যবাদও যে একদিন তার চেয়ে উৎকৃষ্টতর সাধন ছিল, সে কথা স্বীকার করতেই হবে অকপটে। জড়বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধি ও ঋদ্ধিকে সংহরণ ও বর্জন করতে হবে ভবিষ্যতে, হয়তো বা ঘটাতে হবে তার আমূল রূপান্তর; কিন্তু তবুও তার মাঝে যা কিছু সত্য ও শ্রেয়স্কর বৃহৎ-সাম্যের সাধনায়, তাকে বাদ দিলে তো চলবে না।[১১]

তাঁর মতে মানুষ সবকিছুকে খণ্ডদৃষ্টিতে দেখে বলে বিরোধের সৃষ্টি হয়। জড়ের মধ্যে যেমন প্রাণ ও মন প্রচ্ছন্ন থাকে তেমনি "অতিমানস"ও নিহিত থাকে। ব্রহ্ম শুধু জড়ের আধারে আবরিত নন; সেই আবরণে চেতনা ও আনন্দও আচ্ছাদিত থাকে।

শ্রীঅরবিন্দ স্বজ্ঞায় (Intuition) বিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য সেইসঙ্গে জ্ঞানোন্নতির জন্যে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি। তাঁর মতে

স্বজ্ঞার কাজ হল সত্য আবিষ্কার করা, আর যুক্তির কাজ ভুলভ্রান্তি থেকে রক্ষা করা। বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত এবং গীতার সাহায্যে তাঁর দর্শন রচিত হলেও বস্তুত তাঁর দর্শনের মূলভিত্তি নিজজীবনের অনুভূতি। বিবর্তনের ধারায় একদিন যে পৃথিবীতে দেবমানবের আবির্ভাব ঘটবে এই প্রত্যয়ই তাঁর দর্শনের অন্যতম মূলকথা।

জগৎসৃষ্টির প্রসঙ্গে তিনি সাংখ্যের প্রকৃতিগত স্বভাবসৃষ্ট প্রত্যয়ের পরিবর্তে বেদান্ত ও গীতার সৃষ্টিতত্ত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে ঈশ্বরের লীলা এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় বিশ্বাস করতেন। তিনি ছিলেন লীলাবাদী। জগৎসৃষ্টি তিনি লীলাবাদী প্রত্যয়ে ব্যাখ্যা করেছেন ; অর্থাৎ সৃষ্টির পিছনে আছে পরমাত্মার আনন্দের খেলা। তাঁর মতে যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরকে জানা যায় না বটে, কিন্তু ঈশ্বর সর্বার্থে অজ্ঞেয় নন ; ঈশ্বর প্রচ্ছন্ন ও জ্ঞেয়। জীব ও ব্রহ্মের সম্পর্ক নির্ণয়ে শ্রীঅরবিন্দ শংকরের অদ্বৈতবাদ পুরোপুরি গ্রহণ করেন নি ; আবার দ্বৈতবাদে বিশ্বাস না করলেও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার কিছুটা মিল আছে। বস্তুত অদ্বৈত বেদান্ত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র। তিনি মনে করতেন সত্তার দিক থেকে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন ; কিন্তু কর্মের দিক থেকে ভেদ আছে ; কারণ প্রত্যেক জীব পরমাত্মার এক একটি পৃথক কর্মকেন্দ্র। সকল জীবের স্বাতন্ত্র্য-বোধ ও অহংবুদ্ধি থাকে ; নদী যেমন পরিণামে সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনি পূর্ণজ্ঞান অর্জিত হলে জীবও ব্রহ্মে লীন হয়ে যায় ; অহংবোধের পরিসমাপ্তি ঘটে। 'পুরুষোত্তম'-এর সঙ্গে অঙ্গীভূত হলে ভক্তিও সম্ভব হয়। শ্রীঅরবিন্দ শংকরের মতো জগৎকে মিথ্যা মনে করতেন না।[১২]

তিনি সন্ন্যাসের বিরোধী ছিলেন। শিল্প সাহিত্য রাজনীতি কোনো কিছুকেই তিনি ভোগ্য জীবন থেকে বাদ দেন নি। অবশ্য তাঁর মতে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণে বাধা নেই। তিনি মনে করতেন কর্মই সাধনার সবকিছু এবং মুক্তিরও উপায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে প্রচলিত মানবধর্ম (Religion of Humanity) অর্থাৎ প্রেম, প্রীতি, পরার্থে আত্মত্যাগ, জনসেবা, কল্যাণকর্ম কাম্য হলেও মনের ঊর্ধ্বতর অতি-মানসের বিষয় নয়। ঈশ্বরনিরপেক্ষ জনকল্যাণকরকর্মে তিনি বিশ্বাস করতেন না। ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজ করেন। যারা দরিদ্র, নিরন্ন, নিরক্ষর ও পাপী নয় তাদের কি মুক্তির প্রয়োজন নেই? তাই এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কর্মকে সীমাবদ্ধ রাখা অনুচিত। এখানে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর অমিল দেখা যায়। স্বামীজি চাইতেন জীবের সেবা আর শ্রীঅরবিন্দের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাম্য ছিল দিব্য অভিপ্রায় ও নির্দেশ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করা। তাঁর কর্মযোগের প্রথম সোপান হল সকল কাজের মধ্যে দিয়ে অন্তরস্থিত পরমাত্মার অনুধ্যান এবং দ্বিতীয় স্তর হল কর্মের ফলাফলে আসক্তিত্যাগ। তৃতীয় সোপানে অহংবোধ

বা কর্তৃত্বাভিমান চলে যায়।[১৩]

শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক চিন্তার প্রধান অবদান হল তাঁর 'অতিমানস' (Supermind) তত্ত্ব। সচ্চিদানন্দের সঠিক জ্ঞান ও পূর্ণশক্তির উপলব্ধিকেই অতিমানস বলা চলে—সেই উপলব্ধির সাহায্যে জগৎ ও জীবনের ঈপ্সিত দিব্য পরিবর্তন সাধিত হয়। যোগী হিসেবেই শ্রীঅরবিন্দের প্রধান পরিচিতি। যোগের সহজ অর্থ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলন সাধন। যোগসাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজের অন্তরে পরমাত্মার ঐক্য উপলব্ধি করে। ঐশ লীলার ফলে জীবাত্মা তার আপন স্থান ও উৎস পরমাত্মা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। যোগের কাজ উভয়কে আবার যুক্ত করা। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মার্গ ছাড়াও শ্রীঅরবিন্দের যোগসাধনায় হঠযোগ, রাজযোগ ও তন্ত্রসাধনাও সমধিক স্থান লাভ করেছে। বিভিন্ন যৌগিক সাধন প্রণালীর সমন্বয়ে তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন তাকে 'Integral Yoga' বলা হয়েছে।[১৪]

তাঁর যোগসাধনায় বিশেষ কোনো ধর্মমত গ্রহণের বাধ্যবাধকতা নেই। তিনি কোনো নতুন ধর্মমত প্রচার করেন নি। এমনকি ঈশ্বরে নিস্পৃহ মানুষও যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হতে পারে। তবে সাধকের এইটুকু শ্রদ্ধা থাকা চাই যে মানুষই একদিন দেবমানব হয়ে উঠবে। তার অর্থ হল মনের আমূল পরিবর্তন। শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যজীবন' প্রত্যয়ের তাৎপর্য এই যে, মানবমনের স্বভাবগত অহংবোধ ও ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে অর্থাৎ মানস-স্তর হতে অতিমানসের স্তরে উঠে চরম সত্য ব্রহ্মকে জানা। জীবনের আদর্শ কি সে-সম্পর্কে প্রচলিত দুটি ধারার তিনি উল্লেখ করেছেন। তার প্রথমটিতে মানুষের জৈব অস্তিত্বকে বড় করে দেখা হয়। তাদের মধ্যে একদল ঐহিক উন্নতির আদর্শে মানুষের অন্তর্নিহিত বৃত্তি সমূহের ভারসাম্য পূর্ণ বিকাশ, আর সেইসঙ্গে বহির্জীবনের সামঞ্জস্যপূর্ণ মানবতন্ত্রী বিকাশে বিশ্বাসী। বস্তুবাদী এই আদর্শে দেহ, প্রাণ ও মনের পর চতুর্থ সত্তা আত্মার কোনো স্থান নেই। কাজেই এই জীবনাদর্শ তাঁর কাছে সমর্থনীয়। দ্বিতীয় ধারায় ধর্মবোধ প্রণোদিত মানুষের স্বভাব-পরিবর্তনের আদর্শ তাঁর কাছে অনেকাংশে গ্রহণযোগ্য। কারণ দ্বিতীয়টিতে জৈব অস্তিত্বের সঙ্গে আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদি স্বীকৃত।[১৫]

তাঁর মতে 'দিব্যজীবন' লাভের প্রথম সোপান হল মনুষ্য স্বভাবের পরিবর্তন। জীব ঈশ্বরের অংশ; কিন্তু অজ্ঞানে তার মন আচ্ছন্ন থাকে; নিজেকে পাপী মনে করে নিরাশ হওয়া যেমন অর্থহীন, তেমনি ইহকালের পরিবর্তে পরকালের ভরসায় থাকাও অনুচিত। তিনি মনে করতেন এই বিশ্বেই মানুষ একদিন দিব্যসত্তা অর্জন করবে। পূর্ণ বা দিব্যমানব হওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট ধর্মীয় অনুশাসন ও আচারানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নেই। মানুষের অভীষ্ট বস্তু হল দিব্যজীবনের পূর্ণতা লাভ করা—কেবল দেহ, প্রাণ ও মনের উন্নতিই নয়। তাই মানুষকে একদিকে যেমন দিব্যজীবনের জন্যে

সচেষ্ট হতে হবে, তেমনি ইহজীবনেও দিব্যজীবনকে প্রকাশমান করে তোলা দরকার। দিব্যজীবন লাভের জন্যে মানুষকে চারটি গুণ আয়ত্ত করতে হবে : ১. সর্বভূতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস, ২ দেহ, প্রাণ ও মনের শক্তিবর্ধন, ৩. বীর্যের বিকাশ এবং ৪ পরমতত্ত্বে শ্রদ্ধা। দিব্য রূপান্তরের পথে শ্রীঅরবিন্দ তিনটি স্তর অতিক্রম করার কথা বলেছেন : Psychic Awakening, Spiritual Awakening এবং Supramental Awakening।

অন্তরাত্মা অর্থেই তিনি 'Psyche' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। প্রথম স্তরে অন্তরাত্মার সঠিক উপলব্ধি ঘটলে সাধক নিজেকে নিজের দেহ, প্রাণ ও মনের অতিরিক্ত চেতনায় অনুভব করেন। দ্বিতীয় অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্মেষের স্তরে উন্নীত হলে এই চেতনা দেখা দেয় যে সর্বভূতে একই আত্মা বিদ্যমান। ফলে শান্তি ও আনন্দে সাধকের অহংবুদ্ধি আর থাকে না। তৃতীয় অর্থাৎ অতিমানসিক উন্মেষের স্তরে সাধকের আত্মসমর্পণের ফলে পৃথিবীতে দিব্যশক্তির অবতরণ ঘটবে ও মানুষ দেবত্ব লাভ করবে। অতিমানসের অবতরণে সমাজেরও রূপান্তর ঘটবে। তবে সবাই একসঙ্গে এবং সমগ্র সমাজ রাতারাতি রূপান্তরিত হবে একথা মনে করা ভুল। উন্নত মানুষ অপরের আদর্শ হয়ে ক্রমে সকলকে উন্নীত করবে।[১৬]

ইতিহাসচিন্তা

শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে প্রগতি বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান ঊর্ধ্বাভিমুখী পথে আবর্তিত হয়। সেই বৃত্তের কেন্দ্র সদাই গতিশীল—কখনও পশ্চাতে ফেরে না। এই প্রক্রিয়ায় অতীত তার বেশ পরিবর্তন করে মাত্র—অবগুণ্ঠিত শক্তি ও সত্তার ক্ষয় হয় না—নিরন্তর ভবিষ্যতের পথে তা পদক্ষেপ করে।

তাঁর ইতিহাসচিন্তায় মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিচক্রের আবর্তনপ্রত্যয় জার্মান দার্শনিক কার্ল ল্যামপ্রেক্ট (১৮৫৬-১৯১৫)-এর দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ-চিন্তার অংকুর বেদান্ত ও পুরাণেও আছে। ইতিহাসাশ্রয়ী রাষ্ট্রতত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬)। ল্যামপ্রেক্ট ও র‍্যাঙ্কে উভয়ে একই পথে অগ্রসর হলেও ল্যামপ্রেক্ট ভিন্ন মত পোষণ করতেন। র‍্যাঙ্কের চিন্তাসূত্র ছিল—কিভাবে ঘটেছে (how it happened); পক্ষান্তরে ল্যামপ্রেক্টের সূত্র ছিল কিভাবে রূপায়িত হয় (how it became)। ল্যামপ্রেক্ট জার্মানির রাষ্ট্রীয় বিবর্তনকে পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন : ১. আদিম প্রতীক যুগ, ২. মধ্যযুগের সূচনা, ৩. মধ্যযুগের সমাপ্তি, ৪. নবজাগরণের শুরু থেকে জ্ঞানোৎকর্ষ কালাবধি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ এবং ৫. রোমান্টিক যুগ থেকে শিল্পবিপ্লবের যুগ পর্যন্ত অন্তর্মুখী চিন্তার যুগ। শ্রীঅরবিন্দ

ল্যামপ্রেক্টের স্তরবিন্যস্ত (typology) পদ্ধতি ভারতে প্রয়োগ করেন। ল্যামপ্রেক্ট তাঁর পদ্ধতিকে সর্বদেশে প্রযোজ্য মনে করতেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর *The Human Cycle* গ্রন্থে বৈদিক যুগকে প্রতীক যুগ বলেছেন। বর্ণাশ্রম প্রথাকে একটি 'typical social institution' এবং জাতিভেদ প্রথাকে একটি সামাজিক ধারারূপে দেখেছেন। তাঁর মতে পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে যুক্তিপ্রবণতা ও মুক্তিকামিতার সমন্বয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সূচনাও প্রাচ্যে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সনাতন সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচ্য মানসে যুক্তিবাদ গ্রহণযোগ্য হয় নি; প্রাচ্য তার সনাতন ধারা অনুসরণ করতে চায়। ল্যামপ্রেক্ট বর্তমান যুগকে স্নায়বিক চাঞ্চল্যের (nervous tension) যুগ রূপে অভিহিত করেছেন। শ্রীঅরবিন্দের মতে সমকালীন অন্তর্মুখী যুগের স্থান আধ্যাত্মিক যুগে পরিণত হবে। তখন পরমাত্মার অঙ্গ মানবাত্মা মানবিক ক্রমবিকাশকে পথপ্রদর্শন করবে। ল্যামপ্রেক্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতার দার্শনিক ভিত্তিকে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখেছেন; পক্ষান্তরে শ্রীঅরবিন্দ ঐ বিশ্লেষণ প্রণালীতে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা দান করেছেন।[১৭]

সংস্কৃতি ও সভ্যতার স্তরবিন্যস্ত-পারম্পর্যের (typology) প্রভেদপ্রত্যয় আধুনিক সমাজদর্শনের একটি বিশিষ্ট বিশ্লেষণ ভঙ্গি। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সংস্কৃতি সমুদয় সামাজিক তৎপরতার সমষ্টি—আর সমষ্টিগত সমুদয় অস্তিত্বের উৎকৃষ্টতম বিষয়ের সমন্বয়েই হয় সভ্যতা। এদুটি শব্দের তারতম্য নির্ধারণে কোনো কোনো দার্শনিক মনে করেন যে সংস্কৃতি হল নীতি ও মুক্তির দর্পণ। আবার আর এক শ্রেণীর মতে মানুষের হৃদয় হতে সৃজিত সংস্কৃতি বৈষয়িক উন্নতি ও জনবর্ধনের চরমাবস্থায় ক্ষয় পেতে শুরু করে; জ্ঞান ও আত্মার বিকাশেই সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে, কিন্তু সভ্যতার মানদণ্ড স্থূল বস্তু-তান্ত্রিক হয়ে পড়ায় সাংস্কৃতিক সংকট দেখা দিয়েছে। অন্য এক দলের মতে সংস্কৃতির বনিয়াদ হল মানবিক মূল্যবত্তা; সভ্যতা জীবনে সৌষ্ঠব সাধন করে। মোটের উপর পশ্চিমী ইতিহাসচিন্তা অনুযায়ী ধর্ম, দর্শন ও সৃজনধর্মী ক্রিয়াকলাপে সংস্কৃতির পথ রচিত হয়; এবং সভ্যতার মানদণ্ড শিল্পোন্নতি ও বৈষয়িক অগ্রগতির কষ্টিপাথরে বিবেচিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ সংস্কৃতি ও সভ্যতার পশ্চিমী বিভক্তিকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন ঔপনিষদ দৃষ্টিতে। তাঁর মতে প্রাণের অভিব্যক্তিস্বরূপ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনেই সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত; সুখবাদ ও স্বস্তিপূর্ণ জীবনই সভ্যতার আদর্শ। পক্ষান্তরে মানসের সৃজনীসত্তাই হল সংস্কৃতির উপাদান।[১৮]

শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে মন ও অন্তরাত্মার বিকাশ ও পরিবর্ধনেই সংস্কৃতির সার্থকতা নির্ভর করে। তবে বহির্জীবনকে সংস্কৃতি উপেক্ষা করে না; অর্থাৎ দৈহিক অস্তিত্ব থেকে শুরু করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে শক্তি ও নৈপুণ্য বৃদ্ধিও তার কাজ।[১৯] যূথবদ্ধ জীবনের

সঙ্গে আধ্যাত্মিক মনের মিলন ঘটানোই হল সমাজের দায়িত্ব। আধ্যাত্মিক মানসপটে মানুষ প্রথমে নিজের আত্মার সঙ্গে সামাজিক আত্মার সাযুজ্যে সর্বাত্মক সমাজকাঠামো সৃজন করে। শ্রীঅরবিন্দের এই সমাজদর্শন ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিবৃত্তে পরিব্যাপ্ত। সনাতন ধারায় বিকশিত ভারতীয় সমাজ একদিকে যেমন কোনো আক্রামক নীতি কখনও গ্রহণ করে নি, তেমনি বহুবার আক্রান্ত হয়েও সনাতন ঐতিহ্য বর্জন করে নি। ভারতের স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক শৃঙ্খলমোচনই নয়, ধর্মের হারানো মানিক পুনরুদ্ধারও বটে। সার্বভৌম রাজশক্তি অপেক্ষা ধর্ম অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। ধর্ম, রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি একযোগে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধর্মের আধিপত্য পবিত্র ও চিরন্তন—তাই ভারতের রাজশক্তি অন্যান্য প্রাচীন দেশের মতো সর্বগ্রাসী হয় নি। এদেশে ব্রাহ্মণরা ধর্মের নীতি নির্ধারণ করতেন এবং সেগুলি জনজীবনে রূপায়িত হত রাজশক্তির মাধ্যমে। ধর্ম নিশ্চল নয়। সামাজিক বিবর্তনধারায় মানুষ স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মের পথ রচনা করেছে। তাই ভারতীয় গোষ্ঠীজীবনে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও সার্বভৌমতা বিরাজ করত। ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, নগর ও জনপদ সমূহ নিজের নির্দিষ্ট ধর্ম বা নিয়মে চালিত হত। তাই সেদিনের ভারতে এখনকার অর্থে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন ছিল। এখন অবশ্য সে-পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে; বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে পেঁছলে এখনকার মানুষ আধ্যাত্মিক ভূমিতে তাদের পূর্বতন জনজীবনের কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।[২০]

শ্রীঅরবিন্দ ইতিহাসে আধ্যাত্মিক নির্দেশবাদে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে নিরর্থক ও এমনকি পরস্পরবিরোধী ঘটনার পশ্চাতেও দিব্য সত্তার ক্রিয়াশীলতা বিদ্যমান থাকে এবং ইতিহাস পরব্রহ্মেরই অভিব্যক্তি। ফরাসি বিপ্লব ও বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের পিছনে ঐশ শক্তি তথা কালীর সক্রিয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। বিপিনচন্দ্রের মতো তিনিও ভারতীয় গণঅভ্যুত্থানের পশ্চাতে পরমেশ্বরের অভিপ্রায়কে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি মনে করতেন যে ঈশ্বরই জাতিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ইংরেজের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ ঐশ ইচ্ছায় সংঘটিত হয়—উদ্দেশ্য ভারতীয়দের সংহতি সাধন। ফরাসি বিপ্লবও ভগবৎ ইচ্ছায় ঐভাবে ঘটেছিল। ভারতে ইংরেজের আধিপত্য ও বঙ্গব্যবচ্ছেদকে তিনি "মায়া" বলে অভিহিত করেন। ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের দ্বারাই সেই মায়াকে জয় করার জন্য তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।[২১]

তাঁর এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অর্থাৎ ঐতিহাসিক কার্যকারণকে আধিদৈবিক আলোকে বিশ্লেষণের প্রয়াস গীতার বাণী ও হেগেলীয় ভাববাদের সংমিশ্রণ বলে মনে করা হয়। গীতায় অধিনায়ককে ঈশ্বরের ক্রীড়নক বলা হয়েছে—তিনি কেবল ঈশ্বরের প্রতিনিধিই নন—ঐশ ক্রিয়ার মাধ্যমও বটে।

বিশ্বইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তিগণ যথা, আলেকজান্ডার, জুলিয়াস সীজার, নেপোলিয়ন নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই মহাইচ্ছার (Idea) নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করে তাকে ইতিহাসে প্রতিফলিত করেন।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক (dialectics) প্রণালীকে শ্রীঅরবিন্দ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। নয় ও প্রতিনয়ের দ্বন্দ্বে প্রকৃতির অন্যতম অভিব্যক্তি মানুষের ব্যষ্টি ও গোষ্ঠী চেতনা সমন্বয়ের পরিবর্তে একটা আপসের রূপ নেয়। প্রগতি মননক্রিয়ারই ফল; সেটা কখনও প্রকাশমান এবং কখনও বা সুপ্ত থাকে। মনন সুপ্ত হলে মানবসমাজের অধঃপতন ঘটে; কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক তাগিদে মনন চাঙ্গা হয়ে ওঠে; তখন অন্তর্নিহিত মানবতার আদর্শ আলোকের সন্ধান পায়।[১২]

তিনি মনে করতেন যে মানবসমাজ চরম বিকাশ লাভের পূর্বে বিবর্তনের তিনটি স্তর অতিক্রম করেছে। প্রথমে আচারানুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গোষ্ঠী-জীবন দানা বেঁধে ওঠে। জৈব বিকাশের মতো গোষ্ঠীজীবনের তাগিদে সমাজদেহ পরিপুষ্ট হয়—মনন ও চেতনার অস্তিত্ব তখনও নগণ্য ছিল। দ্বিতীয় স্তরে গোষ্ঠীমন ক্রমে আরও বুদ্ধিদীপ্ত ও সচেতন হয়ে ওঠে। চিন্তাভাবনা ও যুক্তিবোধ সমাজবিকাশের সহায়ক হয়। মানুষ নিছক জৈব অস্তিত্বের দাবি অতিক্রম করে উন্নততর আদর্শ লক্ষ্যপথে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়। অবশ্য জীবনের ভোগ্যসম্ভার মানুষকে ভুলিয়ে দেয় যে সমাজেরও একটা জৈব বিকাশ আছে, সেটা শুধুমাত্র একটা যন্ত্র নয়। যুক্তি ও বিজ্ঞানের যান্ত্রিক দাপটে মানুষের আধ্যাত্মিক মন নিষ্পেষিত হয়। সামাজিক বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে মানুষের এই প্রবণতাও অতিক্রান্ত হয়। যুক্তিতর্ক ও জৈবতাড়নার পরিবর্তে ঐক্যবোধ, সংবেদনশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ত মুক্তির চেতনায় মানুষের মহত্তম অন্তরাবেগ ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীকে সুষ্ঠু ও সমন্বিত করে তোলে।[১৩]

রাষ্ট্রদর্শন

শ্রীঅরবিন্দ প্রাকৃতিক বিচারে সমাজ ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করেছেন। মানুষের বিবর্তন ধারায় লক্ষিত হয় যে মানবিক প্রগতি তিনটি উপাদানের নিরন্তর সাযুজ্যের উপর নির্ভর করে: ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও মানব-সমাজ; এগুলির প্রতিটি অপরের আনুকূল্যে নিজ পথে বিকশিত হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক প্রবণতায় ব্যক্তি তার জীবনের বাহির ও অন্তরকে গোষ্ঠীর সাহায্যে বিকশিত করে; গোষ্ঠীও ক্রমে বৃহত্তর মানবসমাজে মিশে যায়। একদিকে ব্যক্তিমানুষ এবং অপরদিকে বৃহত্তর মানবসমাজ গোষ্ঠীকে পরিপুষ্ট করে। মানবসমাজ এখনও সচেতনভাবে সুসংবদ্ধ হয় নি বটে, কিন্তু তার

অসংগঠিতরূপের পশ্চাতে সামগ্রিক বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভূমিকাই থাকে। সমগ্র মানবসমাজ সর্বজনের আনুকূল্যেই কেবল সুসংগঠিত পথে পরিপূর্ণ ও সার্থক রূপ লাভ করে। প্রকৃতিও অনুরূপ তিনটি উপাদানের সাহায্য নেয়। একক, বহু ও সমগ্রের মধ্যে প্রকাশমান হয়ে প্রকৃতি তাদের সেতুবন্ধ রচনা করে। মনুষ্যজীবনে বিভিন্ন বিভেদের মধ্যে প্রকৃতি সংহতি সাধন করে—বহু ও বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করে।[২৪]

একক, বহু ও সমগ্রের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার সম্ভাবনা অসীম। পারস্পরিক সৌহার্দ ও সামঞ্জস্যের চাই নিরঙ্কুশ অবকাশ। এখনও চলেছে মানুষে মানুষে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও ক্ষমতার লড়াই। কিন্তু তা অতিক্রমের কোনো পথই মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না। এখনও গোষ্ঠীর বেদীমূলে ব্যস্টিস্বার্থের বলিদান চলেছে। গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্রমেই হরণ করছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

Freedom is as necessary to life as law and regime; diversity is as necessary as unity to our true completeness. Existence is only one in its essence and totality, in its play it is necessarily multiform. Absolute uniformity would mean the cessation of life, while on the other hand, the vigour of the pulse of life may be measured by the richness of the diversities which it creates.[২৫]

বৈচিত্র্যের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। তাই সব কিছুকে একই ছাঁচে গড়ার কল্পনা জীবনের প্রতিকূল। তবে ঐক্যেরও প্রয়োজন আছে। ঐক্য বিনা স্থায়িত্ব, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তা থাকে না। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

Unity we must create, but not necessarily uniformity. If man could realise a perfect spiritual unity, no sort of uniformity would be necessary; for the utmost play of diversity would be securely possible on that foundation.[২৬]

প্রকৃতিও চায় ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাধীনতা। আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতি কোনো নিয়মকানুন বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয় না। মানুষের অন্তর থেকেই তাকে উদ্ভূত হতে সাহায্য করে। প্রকৃতির নিয়মেই ব্যক্তি, সমাজ, ধর্ম ও জাতির স্বাধীনতা নির্ধারিত হয়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—

All liberty, individual, national, religious, social, ethical, takes its ground upon this fundamental principle of our existence. By liberty we mean the freedom to obey the law of our being, to grow to our natural self fulfilment, to find out naturally and

freely our harmony with our environment.[২৭]

নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাধীনতার যে-ঝুঁকি থাকে তার কারণ মানুষের অপরিণত ও ত্রুটিপূর্ণ মনোভাব। আবার অত্যধিক আইনের বন্ধনে মনুষ্যত্ব খর্ব হয়—সেদিক থেকে বরং নৈরাজ্যবাদও ভাল।

শ্রীঅরবিন্দ মনে করতেন যে সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে সকলের সমবেত শক্তি ও বুদ্ধিবত্তার রূপ নিয়েছে রাষ্ট্র। তত্ত্বগতভাবে একথা চলে আসছে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র সকলের মঙ্গল সাধনতো দূরের কথা, উলটে সংঘবদ্ধভাবে দুষ্কার্য ও ক্ষতি সাধন করে। ক্ষমতাসীন দল বা শ্রেণী জনমনের প্রতিবিম্ব নয়, তাতে দেশের শ্রেষ্ঠ মনন ও চিন্তনের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না। রাষ্ট্রের প্রশাসনে কিছু উন্নত মস্তিষ্কের আগমন হয়তো ঘটে, কিন্তু রাষ্ট্রের যান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক পরিবেশে সেইসব উন্নত মস্তিষ্ক অবনত হয়। যূথবন্ধ এই রাষ্ট্রীয় দাপটের পশ্চাতে না থাকে কোনো নীতিবোধ, না কোনো আত্মিক তাড়না। রাষ্ট্র চায় মানুষের অধিকার হরণ করে গোষ্ঠীর যূপকাষ্ঠে তাকে বলি দিতে; ফলে সমাজবন্ধ মানুষের আদর্শ ব্যর্থ হয়; রাষ্ট্রযন্ত্রে ব্যষ্টির নিষ্পেষণ পরিণামে ব্যষ্টিকে সমগ্র মানবসমাজের অংশীদার হতে বাধা দেয়। কাজেই রাষ্ট্রই প্রগতির একমাত্র ধারক ও বাহক নয়। ব্যষ্টি ও সমাজের মধ্যে সমবায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলা ও সকল বাধা অপসারণের মধ্যেই রাষ্ট্রের সার্থকতা।

শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্রকে জৈব প্রত্যয়ে বিচার করেন নি। জীবের যা ধর্ম অর্থাৎ স্বাধীন, সুষম ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বিকাশ—তার অবকাশ রাষ্ট্রের মধ্যে অনুপস্থিত। রাষ্ট্রের আচরণ স্থূল, নিষ্প্রাণ ও নিষ্করুণ। তিনি বলেছেন—

> …the state is not an organism; it is a machinery, and it works like a machine, without tact, taste, delicacy or intuition. It tries to manufacture, but what humanity is here to do is to grow and create.[২৮]

ঐ-প্রসঙ্গেই তিনি বলেছেন যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ছককাটা বাঁধাধরা মৃতপ্রায় একটা সামঞ্জস্য প্রদর্শন করে মাত্র, তাতে ব্যক্তি-মানুষের উদ্যম, বৈশিষ্ট্য ও বিকাশ ব্যাহত হয়।

এযাবৎকাল যূথবন্ধ জীবনের বৃহত্তর কাঠামো হিসেবে নেশন বিরাজ করেছে। প্রশ্ন হচ্ছে মানবিক সংগঠনের বিবর্তনে এটাই কি বৃহত্তম ও শেষ ধাপ? বিভিন্ন নেশনকে নিয়ে বৃহত্তর কিছু গড়ার কি সম্ভাবনা নেই? মানুষের প্রবণতা বৃহৎ মানবসমাজে অঙ্গীভূত হওয়া। এতদিন দেখা গিয়েছে যে শক্তি-সম্পন্ন নেশনগুলি দুর্বল নেশনগুলিকে দাবিয়ে রেখেছে। একই নেশনের দাপটে সারা দুনিয়াটা বিজিত ও একীভূত হওয়াটা আশ্চর্যের নয়। কিংবা কমিউনিজম বা ঐরকম কোনো মতবাদের অধীনে পৃথিবীটা সংঘবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু দুটি প্রণালীই বিনাশকর—তাতে ব্যর্থ হবে বিশ্বমানবতার আদর্শ।[২৯]

তাঁর আশা ছিল যে সমাজতন্ত্র একদিন বিশ্ব-ঐক্য সাধন করবে। কিন্তু সমাজতন্ত্রও সংকীর্ণ আবর্তে ঘূর্ণায়মান। সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতা পেলে তাদের মধ্যেও জাতীয় অভিমান ও আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে; বিশ্বজনীন আদর্শকে তখন বিসর্জন দেওয়া হয়। অবশ্য সমাজতন্ত্রীদের নানা মত ও পথ আছে। একশ্রেণীর সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিসত্তাকে বলি দিয়েছে; আবার আর এক শ্রেণীর মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শ বর্জিত হয় নি। উভয়ের মধ্যে প্রকট বিরোধ বিশ্বরাষ্ট্র রচনার একদিন অন্তরায় হবে। কমিউনিজম যে মূলত মানবতাবিরোধী তা নয়; বরঞ্চ যৌথ সামঞ্জস্যের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সহায়ক। তাঁর মতে—

The already developed systems which go by the name are not really Communism but constructions of an inordinately rigid State Socialism. But Socialism itself might well develop away from the Marxist groove and evolve less rigid modes; a co--operative Socialism, for intance, without any bureaucratic rigour of a coercive administration, of a police state, might one day come into existence, but the generalisation of Socialism throughout the world is not under existing circumstance easily foreseeable... .[৩১]

সারা বিশ্বে আদর্শ সমাজতন্ত্রের একচ্ছত্র প্রভাবের আশা না দেখে তিনি রাষ্ট্রসংঘের (UNO) অধীনে ধনতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের সহাবস্থান নীতির যৌক্তিকতা দর্শিয়েছেন। দুইয়েরই দোষগুণ আছে, প্রভেদ ও বিরোধও আছে। সমবায়ী ব্যবস্থাও কার্যকর না হতে পারে, যদি তাতেও সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি-স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া হয়। ব্যক্তির উন্নতি বিনা কোনো কিছুর স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হতে পারে না। ব্যক্তির স্বাধীন উদ্যম, বিকাশ ও বুদ্ধিকে সমষ্টির চাপে রুদ্ধ রাখলে পরিণামে মানবতার পরিপূর্ণতা বিঘ্নিত হবে। সমষ্টিবাদী প্রচেষ্টায় ব্যক্তিমানুষ ছককাটা পরিবেশে বন্দী হয়। এমনকি আধুনিক সমাজ-তান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপও সেদিক থেকে বিনাশকর।[৩১]

অন্যদিকে ধনতন্ত্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীনদেশগুলির গতি রোধ করছে। তাই এই অবস্থায় বিশ্বরাষ্ট্রের কল্পনা অকার্যকর। এমতাবস্থায় পরস্পর-বিরোধী দেশগুলিকে মানবতার কল্যাণে যতদূর সম্ভব ঐক্যবদ্ধ রাখাই মঙ্গল। ক্রমে তা থেকেই একদিন প্রগতিশীল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থার বীজ উপ্ত হয়ে ব্যক্তিমানুষের শুভ প্রবৃত্তি ও সৃষ্টিশক্তিকে পরিপুষ্ট করবে। তবে পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ও মতবাদ ক্রমান্বয়ে পূর্বের মতো ভবিষ্যতেও উদ্ভূত হবে এবং তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব থাকবে। এর একমাত্র উপায় মানুষের

অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক মানবধর্মের উন্মেষসাধন। তারই প্রভাবে মানুষে মানুষে বিবাদের পরিবর্তে পরস্পরগ্রাহ্য পরিবেশ গড়ে উঠবে।

শ্রীঅরবিন্দ আদর্শ মানবসমাজের একটা সুস্পষ্ট চিত্র উপস্থাপিত করেছেন, যেখানে রাজারাজড়া, যাজকসম্প্রদায় ও অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্য থাকবে না। বুর্জোয়া ধনতন্ত্রবাদের পরিবর্তে স্থাপিত হবে মানুষের সমানাধিকার। স্বাধীন সমবায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে মানুষ সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় যূথবদ্ধতা অতিক্রম করে বিশ্বজনীন সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির আস্বাদ পাবে।[১১]

বিবেকানন্দ ও টিলকের মতো শ্রীঅরবিন্দ গীতার মর্মবাণী সর্বভূতহিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বেনথাম প্রমুখ ইউরোপীয় হিতবাদীদের greatest good of the greatest number আদর্শের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। তবে হিতবাদীদের পন্থায় সংখ্যালঘুরা উপেক্ষিত হয়েছে। পক্ষান্তরে গীতার মর্মানুসারী ভারতীয় দার্শনিকরা মনে করতেন যে পরম দিব্যসত্তা যেখানে সর্বব্যাপী সেখানে সকল মানুষের প্রতি সমান দৃকপাত তথা সর্বাত্মক মঙ্গল-সাধনই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। পার্থিব সুখদুঃখের প্রশ্নকেই শুধু বড় করে না দেখে তাঁরা হিতবাদীদের বিপরীতে আধ্যাত্মিক ও ভাববাদী দৃষ্টিতে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথা ভেবেছেন।

গীতার মর্মানুসারে তিনি মুক্তির প্রত্যয়কেও গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের স্বধর্মের প্রতি আনুগত্যই হল মুক্তি; মানুষের অন্তর্নিহিত এই প্রবণতা কেবল একটা বাহ্যিক ও মানবিক সত্তাই নয়—বস্তুত সেটা জৈব সত্তারই অঙ্গ—স্বধর্মের প্রতি আনুগত্যের অর্থ দিব্যধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন। তাঁর এ-প্রত্যয়ে একদিকে গীতার বাণী যেমন পরিস্ফুট, অন্যদিকে রুশোর প্রভাবও কিছুটা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মুক্তিকে নৈতিক দৃষ্টিতে দেখে রুশো মনে করতেন যে তাতে নিজেদের জন্যে রচিত রীতিনীতির প্রতিই আমরা আনুগত্য জানাই। শ্রীঅরবিন্দ তত্ত্বটিকে আরো স্পষ্ট করে দেখিয়ে বলেছেন যে, স্বধর্মের প্রতি অনুরাগ ও আনুগত্যই মুক্তির উপাদান; নিস্পৃহ ও আধ্যাত্মিক মনোভাব নিয়ে নিজ সত্তার প্রতি সমাদর ও সেইসঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে দিব্য চেতনাস্বরূপ মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির প্রশ্ন এই আত্মিক মুক্তির উপরই নির্ভর করে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক অরাজকতার দরুন বিবর্তনের যে সংকট দেখা দিয়েছে তার নিরসনকল্পে শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এক জনসম্প্রদায়ের উদ্ভব কামনা করেছেন। কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নয়ন আর গালভরা গণতান্ত্রিক কথায় সাধারণ মানুষকে সংকীর্ণ চিন্তা থেকে মুক্ত করা যায় না। তাঁর মতে কমিউনিস্টদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার পরিণাম মুষ্টিমেয় ক্ষমতা-সীনের আধিপত্য। অসুস্থ মানুষের সমন্বয়ে সুস্থ সমাজ গড়া যায় না—তাই সে-অবস্থায় মানবতা ও মানবিকতার ললিত বাণী ব্যর্থ পরিহাসের মতোই

শোনাবে। সুখবাদ বা সমাজতাত্ত্বিক নীতিকথা স্থান ও কাল বিশেষে প্রযোজ্য —তাতেও কোনো চূড়ান্ত সমাধানের ইঙ্গিত নেই—পরম মঙ্গল সাধনতো দূরের কথা। ধর্মের বেলাতেও দেখা যায় যে মানুষের আত্মিক বিকাশের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা জনজীবনকে প্রাণবন্ত করতে অপারগ—কারণ ধর্ম প্রতিষ্ঠান-গত হয়ে পড়ায় তা সংকীর্ণ মনোভাব, অন্ধ ভাবাবেগ ও আচারানুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে গিয়েছে। তাই শ্রীঅরবিন্দ অধ্যাত্মভাবে পরিমণ্ডিত এমন এক আদর্শ সমাজের কথা ভেবেছেন যা সকলের জীবনকেই করে তুলবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ। আধ্যাত্মিক প্রেরণাই হবে তার সঞ্চালক। তবে তিনি আধ্যাত্মিক আদর্শে প্রতিষ্ঠিত সমাজের কথাই শুধু ভাবেন নি। উপরন্তু চেয়েছেন বিশ্বের রূপান্তরের জন্যে সর্বজ্ঞ ও বিশ্বচেতনাসম্পন্ন দিব্য অতিমানসের (divine supermind) অবতরণ। সেজন্যে মানুষকে মন অতিক্রম করে অতিমানসের দিকে বিবর্তিত হতে হবে। তখন অতিমানসিক গুণসম্পন্ন একটা জাত বা গোষ্ঠী গড়ে উঠবে। অন্যান্যদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ হবে অনেকটা পশু ও মানুষের পার্থক্যের মত। রূপান্তরিত এই প্রাজ্ঞ মানবগোষ্ঠী দিব্য ইচ্ছা ও মানবিক আকুতির তাগিদে নিশ্চল বিবর্তনের সংকট মোচন করবে। প্রকৃতি এখন পৃথিবীর সূতিকাগারে অতিমানস-শক্তির প্রসব-বেদনায় বিধুর।

শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব প্রত্যয়টির সঙ্গে নীটশের চিন্তার মিল আছে। কেশবচন্দ্র ও পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্রের মনেও নীটশের প্রভাব দেখা যায়। নীটশেকেই ফ্যাসিবাদের অন্যতম আদিগুরু বলা হয়। তবে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে পার্থক্য এই যে নীটশের অতিমানব (ubermensch) দৈত্যের মতো নিষ্করুণ ও বলদর্পী—আর শ্রীঅরবিন্দের অতিমানব দেবদূতের মতো রূপান্তরিত মানুষ। নীটশের চিন্তায় মানবিক প্রমূল্যের স্থান নেই; সেক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ চেতনাকে পরম ও দিব্য মূল্যবত্তায় বিকশিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে অন্তর্মুখী সমচেতনার দ্বারা যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবাদবিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি, সমন্বয় ও ঐক্য অর্জন করা যায়। তিনি আরো মনে করতেন যে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীর সমন্বয় তথা মানবিক ও জাগতিক বিষয়াতীতে চৈতন্য সৃষ্টি করা যায়, তাতেই দিব্য সত্তার সঙ্গে নির্বিকল্পের উপলব্ধি সম্ভব। তিনি বিশ্বাতীত আধ্যাত্মিক সত্তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হেগেলের মতো তিনিও জাতির অন্তরাত্মায় বিশ্বাস করতেন।

জা তী য় তা বা দ

জাতীয়তাবাদকে শ্রীঅরবিন্দ প্রচলিত আবেগসর্বস্ব অর্থে গ্রহণ করেন নি।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল উদার ও বিশ্বজনীন। তিনি মনে করতেন যে মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের একটি ধাপ হল জাতীয়তা। জাতীয়তাবাদকে তিনি নিছক দেশাত্মবোধের দৃষ্টিতে দেখতেন না। তার পশ্চাতে তিনি এক নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনার চিন্তা পোষণ করতেন। তাঁর ভাষায়—

জাতীয়তা একটা রাজনীতিক কর্মপদ্ধতি নহে, জাতীয়তা ভগবানসম্ভূত ধর্ম। জাতীয়তা কখনই বিনষ্ট হইবে না,…ভাগবৎ শক্তিতেই জাতীয়তা টিকিয়া থাকিবে, যে কোন প্রকার অস্ত্রই ইহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হউক না কেন। জাতীয়তা অমর, কারণ ইহা মানবীয় জিনিস নহে। ভগবানই বাংলায় কাজ করিতেছেন। ভগবানকে মারা যায় না, ভগবানকে জেলে পাঠান যায় না।[৩৩]

রাজনীতিতে ধর্মের ব্যঞ্জনাদান সমকালীন প্রায় সকল রাষ্ট্রদার্শনিকের চিন্তায় পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের মতো তাঁরাও মাতৃভূমিকে একমাত্র উপাস্য ও মুক্তি সাধনাকে শ্রেষ্ঠ আরাধনা বলে মনে করতেন। বিবেকানন্দের মতো শ্রীঅরবিন্দও দেশ ও তার অধিবাসীদের মধ্যে ঈশ্বরের সন্ধান-প্রয়াসী ছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর এই ধর্মের সংমিশ্রণ-চিন্তাকে অনেকেই হিন্দু পুনর্জাগরণ প্রয়াস বলে মনে করেন।

নানাবিধ পার্থক্য থাকার দরুন ভারতীয়দের একই নেশন বলে অভিহিত করা যায় কিনা সে-সম্পর্কে একটা বহুদিনের বিতর্ক ছিল। এ বিষয়ে ভারতীয় নেশনের রূপকার সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সমদর্শিতা লক্ষণীয়। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের বিরুদ্ধে মামলা চলার সময়ে শ্রীঅরবিন্দ ঐ পত্রিকায় তিনটি প্রবন্ধে তাঁর এই বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রথমটিতে ভারতের সার্বভৌমিকতা প্রসঙ্গে নিজেই প্রশ্ন করে তার জবাব দেন এই বলে—

We answer that here are certain essential conditions, geographical unity, a common past, a powerful common interest impelling towards unity and certain political conditions which enable the impulse to realize itself in an organized government expressing the nationality and perpetuating its single and united existence.[৩৪]

সুরেন্দ্রনাথের মতো শ্রীঅরবিন্দও দৃঢ় প্রত্যয়ে দাবি করেন যে এই গুণগুলি ভারতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকার সম্পাদক এন. এন. ঘোষ বলেন যে, ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরিমিশ্রণের অভাবে ঐ দাবি অচল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নেশন বিষয়ক চিন্তাকে যৌগিক রসায়ন পদার্থের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অনাবিল অনুরাগ ও আবেগ এবং তজ্জন্য আত্মোৎসর্গ নেশনরূপে ভারতকে সুসংবদ্ধ করে তুলবে। তৃতীয় প্রবন্ধটিতে তিনি দেশপ্রেম প্রসঙ্গে বলেন—

…the pride in the past, the pain of our present, the passion

for the future are its trunk and branches. Self-sacrifice and self-forgetfulness, great service, high endurance for the country, are the fruits. And the sap that keeps it alive is the realization of the motherland of God in the country, the perpetual contemplation adoration and service of the mother.[৩৫]

গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ইত্যাদির সংকীর্ণ চেতনার ঊর্ধ্বে উঠলে দেশমাতৃকার যথার্থ রূপ দর্শন করা যায়। দেশ সকলের ; সকলেই দেশবন্দনায় প্রবৃত্ত হলে বিভেদ ও অনৈক্য বলে কিছু থাকবে না।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে যেমন সর্বাত্মক করে তুলতে চেয়েছিলেন, তেমনি ভারতের রাষ্ট্রকাঠামোর চাইতেন সর্বজনমুখী বিকেন্দ্রিত গঠন। পল্লীভিত্তিক পুনর্গঠন ও জনচেতনার সমর্থনে তিনি বলেন—

If we are to survive as a nation, we must restore the centres of strength which are natural and necessary to our growth, and the first of these, the basis of all the rest, the old foundation of Indian life and the secret of Indian vitality, is the self dependent and self sufficient village organism. If we are to organize Swaraj, we must base it on the village.[৩৬]

জীবদেহের মতো পল্লীসমাজকে সারা দেশের সঙ্গে সুসংবন্ধ করে মানুষের মধ্যে স্বাধীন উদ্যম, প্রাণচাঞ্চল্য ও যথোচিত সমাজচেতনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন। সেজন্যে পল্লী সংগঠনের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। কিশোরগঞ্জে 'পল্লীসমিতি' বিষয়ক ভাষণে (১৯০৮) তিনি বলেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতে পল্লীসমিতিগুলি ছিল জনজীবনের প্রাণকেন্দ্র— কালের প্রবাহে দেশের বুকের উপর দিয়ে কতই না ঝড়ঝাপটা বয়ে গিয়েছে— তবুও দেশ ও তার ঐতিহ্য বিনষ্ট হয় নি— কারণ তার মূলে ছিল ঐসব সমিতি। দেহের অসংখ্য কোষের সঙ্গে গ্রামগুলি তুলনীয় ; দেহকোষ সুস্থ থকেলে যেমন শরীর সুস্থ থাকে তেমনি গ্রামগুলি সুস্থ থাকলে দেশের স্বাস্থ্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রাচীন ভারতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুগপৎ বিরাজ করত বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা। কোনো কারণে কেন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও রাষ্ট্রের নিম্নতম শাসন পর্যায়ে কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটত না। উৎপাদন, আত্মরক্ষা ও শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। শ্রীঅরবিন্দের গ্রামীণ পুনর্গঠন চিন্তার সঙ্গে গান্ধীর গ্রামোন্নয়ন ও সর্বোদয় আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংস্কার চিন্তার মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।[৩৭]

শ্রীঅরবিন্দের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় দেখা যায়। ইংরেজের আদালত বয়কট করে সালিসির মাধ্যমে নিষ্পত্তির অভিমত তাঁর ইউরোপীয় ইতিহাস থেকে গৃহীত। আয়ার্ল্যান্ডের 'সিন ফিন' আন্দোলনের

তিনি অনুরাগী ছিলেন। ইউরোপে জাতীয়তাবাদের প্রধান অঙ্গ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন। এদেশে তদুপরি একটা সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বিদেশী বিদ্বেষ বর্তমান। ফরাসি বিপ্লবের পর থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা ও স্বাদেশিক আবেগ প্রবল হয়। সমকালীন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্ক, মাৎসিনি, মিলের চিন্তায় সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র প্রমুখ ভারতীয় জননেতারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন। শ্রীঅরবিন্দও মাৎসিনির অনুরাগী ছিলেন। মাৎসিনি জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক চিত্র ছাড়াও তার এক নৈতিক ও বিশ্বজনীন রূপ দর্শিয়েছিলেন। সেই আদর্শেই রাজনীতির পিছনে তাঁর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

ভারতের মুক্তিসাধন শ্রীঅরবিন্দের কাছে ছিল এক জৈব দায়িত্বস্বরূপ। সেই দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে তিনি এক উন্নত মানবগোষ্ঠীর কল্পনা করেছিলেন। স্বরাজ বলতে তিনি কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা মনে করতেন না। স্বরাজের মধ্যে দিয়ে তিনি ভারতের সনাতন ভাবধারা এবং রাজনীতিতে বৈদান্তিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। তাঁর মতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কেবল দেশপ্রেমের দ্বারাই সম্ভব নয়: তদুপরি চাই আত্মদান। স্বরাজ সাধনার অঙ্গস্বরূপ তিনি আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার সাহায্যে ভারতের সনাতন অন্তরাত্মার পুনরুজ্জীবন কামনা করতেন। মুক্তিযুদ্ধকে তিনি যজ্ঞের মতো মনে করতেন। যজ্ঞের আরাধ্যা হলেন দেশমাতৃকা। আত্মাহুতির মাধ্যমে সেই দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্তি চাই। বৈদান্তিক ভাবাদর্শে অন্তর্নিহিত দিব্যসত্তার উপলব্ধি ও মোক্ষ অর্জনকেই তিনি পরম আদর্শ বলে গ্রহণ করেন। তিনি বলেছেন—

> Our attitude is a political Vedantism. India, free, one and indivisible, is the divine realization to which we move,—emancipation our aim ; to that end each nation must practise the political creed which is the most suited to its temperament and circumstances [২৮]

শ্রীঅরিবন্দ চাইতেন দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা। বিপিনচন্দ্র পালের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধনীতিকে তিনি সাময়িক কার্যকারিতার দিক থেকে গ্রহণ করেছিলেন। গান্ধী নেতৃত্বের বহু পূর্বেই বিপিনচন্দ্র, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় বাংলাদেশে অহিংস অসহযোগ নীতির একবার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। তবে তিনি নির্বীর্য নীতিবাগীশতাকে পছন্দ করতেন না। সেকথার প্রমাণ তাঁর সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টাতেই সুপরিস্ফুট। তিনি যে বয়কট নীতি সমর্থন করতেন তা ছিল ইংরেজের পণ্য, ইংরেজের শিক্ষা, ইংরেজের আদালত ও ইংরেজের প্রশাসনকে বর্জন করা। এগুলির বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্বদেশী পণ্য, জাতীয় শিক্ষা, সালিসি বিচার এবং জাতীয় চেতনা অনুযায়ী কার্যনির্বাহিক ব্যবস্থার কথা তিনি চিন্তা করেন। ক্ষেত্রবিশেষে কর-বন্ধের প্রস্তাবও

তিনি শেষ অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ও আইন ভঙ্গের পথ তিনি অনুসরণ করেন নি। রাজনৈতিক সংগ্রামে অবিমৃশ্যকারিতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন।

একদিকে আবেদন-নিবেদন নীতি এবং অপরদিকে বৈপ্লবিক নীতির মধ্যপন্থাস্বরূপ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতিকে তিনি অনুপযোগী মনে করতেন না। তবে শাসকরা যদি হিংসাত্মক নিপীড়ননীতি গ্রহণ করে তাহলে মুক্তিসংগ্রামীদেরও তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর কথায় তখন—

active resistance becomes a duty and passive resistance, for that occasion, suspended. But though no longer passive, it is still a defensive resistance.[৩৯]

এখানে গান্ধীনীতির সঙ্গে তাঁর পার্থক্য সুস্পষ্ট। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি সম্পর্কে তাঁর পরস্পরবিরোধী মনোভাব দেখা যায়। একবার তিনি বলেছেন—

If the instruments of the executive choose to disperse our meetings by breakiag the heads of those present, the right of self defence entitles us not merely to defend our heads but to retaliate on those of the head breakers.[৪০]

আবার অন্য এক জায়গায় বলেছেন—

If we are persecuted, if the plough of repression is passed over us, we shall meet it, not by violence, but by suffering, by passive resistance, by lawful means, we have not said to our young man, 'when you are repressed, retaliate'. We have said, 'suffer'[৪১]

গ ণ ত ন্ত্র

সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ গণতন্ত্রের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও প্রচলিত ধারায় আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর মনোভঙ্গি স্বভাবতই তাঁর নিজস্ব মূল দর্শনের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল। প্রধানত 'দ্য হিউম্যান সাইক্ল' এবং 'দ্য আইডিয়াল অফ্ হিউম্যান ইউনিটি' গ্রন্থ দুটিতেই তাঁর গণতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তাভাবনার কথা জানা যায় বেশি।

তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী যুক্তিশীলতার উত্থান ও বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির

ফলে মধ্যযুগীয় ইউরোপে মানুষ যখন পোপের প্রতাপ ও যাজকশ্রেণীর আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসতে সমর্থ হয়, সেই সময় থেকে শুরু হয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যুগ। ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ক্রমে রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেটা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর মতে গণতন্ত্রের সারবত্তা অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎস ছিল ইউরোপের রেনেসাঁস। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থেকে ক্রমে উদ্ভূত হয় গণতান্ত্রিক অধিকারের চেতনা এবং মানুষের নিজের বিবেক ও প্রবণতা অনুযায়ী নিজস্ব বিকাশ ও প্রকাশের স্বাধীনতা।[৪২]

তাঁর দৃষ্টিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা ব্যক্তিস্বাধীনতাই হল গণতন্ত্রের অন্তঃসার। ব্যক্তিস্বাধীনতার ফলে মানুষ তার আপন ইচ্ছা, প্রবণতা, আবেগ ও যুক্তিবোধের স্বাধীন বিকাশের অবকাশ পায়, তারই সাহায্যে গড়ে তোলে তার নিজের ব্যক্তিসত্তা। সেই স্বাধীনতা তাই হওয়া উচিত সম্পূর্ণ অবাধ। সেইসঙ্গে কিন্তু অপরের অনুরূপস্বাধীনতা ও অধিকারকে সমমর্যাদা দেওয়া কর্তব্য।[৪৩]

তিনি মনে করতেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য একদিকে যেমন মানুষের যুক্তি-শীলতার উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে আবার সেই যুক্তিবোধকে বিকশিত করে তোলে। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে সাধারণ মানুষের মনে যুক্তিবোধ যথোচিত বিকশিত না হবার ফলে লোকে সংকীর্ণ স্বার্থ দ্বারা চালিত হয়, কিংবা অপরের প্রভাবে কাজ করে। তাছাড়া লোকে নিজের যুক্তিবোধের সাহায্যে অপরের সঙ্গে সুসমঞ্জস সম্পর্ক গড়ে না তুলে বিবাদবিরোধে লিপ্ত হয়। অপরের সঙ্গে সমন্বয়ের পরিবর্তে তার উপর নিজের মতামত চাপিয়ে রেশারেশি শুরু করে।

উল্লিখিত মানসিকতার ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যনির্ভর গণতন্ত্রী আদর্শ কার্যত গণতন্ত্রের নামে সংখ্যাবিপুল অজ্ঞ অভাগা মানুষের উপর শ্রেণীবিশেষের আধিপত্যে পরিণত হয়। এবং যেহেতু দীর্ঘদিনের সাম্য ও স্বাধীনতার স্বাদ সহসা রদ করা যায় না, সেই কারণে পদানত মানুষ এই গণতান্ত্রিক প্রহসনের বিরুদ্ধে এবং যথার্থ গণতন্ত্রের দাবিতে রুখে দাঁড়ায়। শুরু হয় শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ। তারপর ক্রমে নানা নাম, লেবেল, আদর্শ ও কর্মসূচি নিয়ে নানান দলের উদ্ভব ঘটে ও নিরন্তর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ধারা বয়ে চলে। পরিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমুখী গণতন্ত্রী স্বাধীনতা প্রতিযোগিতামূলক সমাজ-সম্পর্কে পর্যবসিত হয়। এই বিরোধী পরিবেশে যুক্তি কিংবা দৈহিক শক্তিতে বলবানেরা জয়ী হয় না, হয় তারাই যারা কৌশলী। এই পরিস্থিতির তিনি নিন্দা করে বলেছেন যে "this is not a rational order of society"।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই সংকট থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের উপযোগিতা ও যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। সেই শিক্ষার লক্ষ্য হল মানুষের মনে যুক্তিবোধের সঞ্চার। তার কর্মসূচি ত্রিবিধ :

এক, কোনো কিছুকে বিচার করতে হলে কেমনভাবে দেখতে ও জানতে হয় সেটা বোঝানো ; দুই, সঠিক ও অর্থবহ প্রণালীতে চিন্তা করতে শেখানো ; তিন, চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানকে যাতে সবাই নিজের ও অপরের কল্যাণে নিয়োগ করতে পারে তাদের সেইভাবে তৈরি করা।

তাঁর বিশ্লেষণ অনুযায়ী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিবর্তনে গণতন্ত্রী বিধিব্যবস্থা মানুষকে অনেকাংশে ঋজু ও সক্রিয় করে তোলে এবং প্রাণবন্ত জীবনের সুযোগ দেয়। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রের সাফল্য লোকের বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বাধীন বিচারশক্তির উপর বর্তায়। তাঁর মতে গণতন্ত্রে মানুষের দাবি হল তিনটি: ক্ষমতা, মর্যাদা ও বাসনার পরিপূর্তি। কিসের ক্ষমতা ও বাসনা সেকথা তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি।

প্রাক-গণতন্ত্রী সমাজে জন্ম ও বংশগত সুবিধার জোরে উল্লিখিত দাবি তিনটি মিটত। বংশগত অসাম্য তেমন না থাকলেও এখন যে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি চলে সেটা হল বিত্ত অর্জনের ক্ষমতা। তাই দেখা যায় সুসমন্বিত সমাজের পরিবর্তে গণতন্ত্রের আচ্ছাদনে এক শক্তিশালী প্রতিযোগিতা, যার অভিব্যক্তি হল ধনতন্ত্র ও যান্ত্রিক সভ্যতা। তাই শ্রীঅরবিন্দ মন্তব্য করেছেন যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শে রচিত গণতন্ত্রী রীতিনীতি তথা যুক্তিবাদী যুগের এই হল পরিণতি—যার ফলে আদি যুক্তিমানস গণতন্ত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ছেড়ে গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের আশ্রয় নেয়।[৭৭]

শ্রীঅরবিন্দ প্রত্যক্ষ করেন যে সমাজতন্ত্র শ্রেণীসংঘর্ষের পথে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ পুঁজিবাদের অবসান ঘটায় এবং প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে সুসংগঠিত সমাজব্যবস্থা ও শান্তি স্থাপন করে। কিন্তু পূর্বতন অসম ধারায় নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি করা যায় না ; তাই জন্মগত অধিকারসূত্রে প্রচলিত অসাম্য ও অবিচারকে দূর করার জন্যে সমাজতন্ত্রকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-ভিত্তিক গণতন্ত্রকে পরিহার করে চলতে হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিবর্তে সামাজিক সাম্যের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকে না। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় ব্যক্তি সমাজের অংশমাত্র। তাতে শিক্ষাদীক্ষা, চিন্তাভাবনা, সন্তানসন্ততি ও পারিবারিক জীবন সামাজিক নিয়মনিগড়ে বাঁধা থাকে। সেখানে ব্যক্তির যুক্তিবোধ নয়, সমষ্টিগত ও সমাজগত যুক্তি দ্বারা ব্যক্তি চালিত হয়।

তাঁর দৃষ্টিতে সাম্যের দাবি ও স্বাধীনতার চাহিদা মূলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই নিহিত। মানুষ চায় তার জীবন, মনন, ইচ্ছা ও কর্মের অবাধ স্বাধীনতা—যেটা রাষ্ট্রের সমষ্টিগত নিয়ন্ত্রণে অন্তর্হিত হয়। মানুষ এদিকে আবার সকলের সঙ্গে সমান অধিকারও চায়। সমষ্টিবাদী সমাজে অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে যে সমতার অবকাশ মেলে সেটা ক্রমে অসার প্রতিপন্ন হয়। প্রশাসনের সুষ্ঠু কার্যনির্বাহ এবং সমষ্টির স্বার্থে সাম্য এক সময়ে প্রতিবন্ধক বলে অনুভূত হয়।

তখন যথার্থ সাম্যেরও অবসান ঘটে।

গণতন্ত্রের তিনটি অঙ্গের অন্যতম সাম্য ও স্বাধীনতা চলে গেলে পড়ে থাকে শুধু মৈত্রী। মৈত্রীর তাগিদে ও জাতির কল্যাণকর স্বার্থ বজায় রাখার জন্যে দরকার হয় কেন্দ্রীভূত শক্তির সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রের। সমকালীন ইউরোপে এই রাষ্ট্রসর্বস্বতার বিস্তার তিনি প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে সমাজ-জীবনের সুশৃঙ্খল ও সার্বিক নিয়ন্ত্রণের আদর্শ ও চাহিদা মেটাতে পূর্ণাঙ্গ সমাজতন্ত্রের এই 'টোটালিটারিয়ান' অর্থাৎ রাষ্ট্রসর্বস্ব চেহারাটাই স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি।

শ্রীঅরবিন্দ সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার লক্ষ্য ও পথের পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘাতের বিশ্লেষণসূত্রে বলেছেন যে, সমাজতন্ত্রের মর্ম ছিল সর্বজনের স্বার্থে ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের শোষণ থেকে মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি এবং রেশারেশি, বিশৃঙ্খলা ও অপচয় নিবারণ করে কল্যাণকর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান। আদিপর্বে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে যা প্রত্যাশা ছিল সেটার পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় 'সোসাল ডেমোক্রেসি'। ইউরোপে সেই আদর্শে সকল সমষ্টিবাদী সমাজের সাফাই গাওয়া হয়। কিন্তু অগণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় যদি আরো ফল মেলে তাহলে সমষ্টিবাদী আদর্শের পবিত্রতা রক্ষার প্রয়োজন নেই।

অকার্যকর হিসেবে প্রতিপন্ন আগেকার অনেক আদর্শের মতো গণতন্ত্রকেও আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে রাশিয়ার কমিউনিস্টরাও অবজ্ঞার সঙ্গে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে বর্জন করেছে এবং কিছুকাল ধরে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার পরিবর্তে একটি সর্বাত্মক শ্রেণীহীন সমাজ ও সর্বহারার সাম্য প্রতিষ্ঠার আদর্শে একটি নতুন সোভিয়েত কাঠামো গড়ে তোলে। তার উদ্দেশ্য হল সর্বহারার একনায়কত্বের ভিত্তিতে একটি কঠোর রাষ্ট্রসর্বস্ব ব্যবস্থার পত্তন। তাঁর দৃষ্টিতে সেই ব্যবস্থা হল মূলত—"dictatorship of the Communist Party in the name or on behalf of the proletariate"[৬৫]।

আবার সর্বহারার জন্যে নয় এমন সমাজে রাষ্ট্রসর্বস্বতায় গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার সঙ্গে সাম্যকেও জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। তবে শ্রেণীবিন্যাস সেখানে বজায় থাকে—সামাজিক কার্যনির্বাহের প্রয়োজনে—উচ্চনীচ লঘুগুরুর বিচারে নয়। বর্তমানে কালের নিরিখে দুটি সমাজব্যবস্থাকেই শ্রীঅরবিন্দ "revolutionary mysticism" আখ্যা দিয়েছেন। তাতে যুক্তিবাদের স্থান নেই।

তাঁর মতে রাশিয়াতে মার্কসীয় বিধিব্যবস্থায় সমাজতন্ত্র একটা "gospel"-এ পরিণত হয়েছে। তাই তিনি বলেন যে, একজন যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল মনীষী যিনি অনেক তত্ত্ব উদ্ভাবনার সঙ্গে সেগুলিকে সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়ায় যুক্ত করেছেন, সেই কার্ল মার্কসের যুক্তিবাদী নির্দেশনা পরিণামে রাশিয়ায় একটি "social religion"-এর রূপ নিয়েছে। সেটিকে অস্বীকার কিংবা কারো আচরণে

বিপরীত ভাব দেখা গেলে সে দণ্ডনীয় অবিশ্বাসী (heretic) হিসেবে বিবেচিত হয়। তাঁর মতে রাশিয়া ও ফ্যাসিবাদী দেশসমূহে একই লক্ষণ দেখা যায়। দুধরনের ব্যবস্থাতেই যুক্তিবাদ ও গণতন্ত্র নিহত হয়েছে। উভয় ব্যবস্থায় মানুষের সমগ্র জীবনধারা রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়মনিগড়ে সংগঠিত, নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ।[৪৬]

প্রচলিত গণতন্ত্রী ধারাকে শ্রীঅরবিন্দ অন্য আরো দুভাবে দেখেছেন। প্রথমটা হল, গতানুগতিক অর্থাৎ রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা—যেখানে নাগরিকেরা মৌল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত জানাতে পারে। দ্বিতীয়টি হল, গণতন্ত্রী জীবনদর্শন যেখানে সামাজিক সমতাবোধ ও মানবতন্ত্রী মনোভঙ্গিটাই প্রধান। তাঁর মতে প্রথমটার বাহ্য রীতিনীতি নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্যের এক অনন্য অবদান। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের "purely social democracies"-এর পরিবেশ তাঁর মনে বিরাজ করে। প্রাচীন ভারতে আধুনিক অর্থে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রকাঠামোর পরিচয় পাওয়া না গেলেও, তৎকালে অভিজাতদের মধ্যে অন্তত একটা সাধারণতন্ত্র ছিল।[৪৭]

গণতান্ত্রিক আদর্শের অবদান স্বীকার করলেও তিনি রূপায়ণের ক্ষেত্রে তার দোষত্রুটি দেখিয়ে বলেছেন যে, জনচেতনা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ ও অপরিণত থাকলে ব্যক্তিমানুষের চিন্তা ও অনুভূতির বিকাশ এবং অভিব্যক্তির অবকাশ থাকে না। চিরাচরিত অন্ধ ও আবেগসর্বস্ব যূথবদ্ধতার চাপ ও নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তিমানুষের সৃজনসত্তা ঢাকা পড়ে। যুক্তির পরিবর্তে ভাবাবেগ তাড়িত শৃঙ্খলা ও তমসাচ্ছন্ন বন্ধ্যা ধারায় বাহিত সমষ্টিমানস ও তার শাসনে শ্রীঅরবিন্দর ছিল প্রবল আপত্তি। যুক্তি-বুদ্ধি ও শিক্ষায় মাঝারি শ্রেণীর সাধারণ মানুষের শাসনে গণতন্ত্র শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

প্রচলিত গণতন্ত্র সম্পর্কে তিনি এটাও লক্ষ করেছিলেন যে গণতন্ত্রী সরকার কার্যত জনগণের না হয়ে উচ্চবিত্ত এবং অভিজাতদের কুক্ষিগত হয়ে থাকে। সেই শ্রেণীই নিজস্বার্থে সাম্য, স্বাধিকার ও সুবিচারের ধুয়ো তোলে; গণতান্ত্রিক বাহ্য কাঠামোর অন্তরালে সংখ্যালঘু কিছু শক্তিশালী মানুষ আধিপত্য করে।

গণতন্ত্রের প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি সমালোচনা করেছেন। বৃহৎ রাষ্ট্রে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে সরকার পরিচালনায় নাগরিকদের ব্যক্তিসত্তা বলে কিছু থাকে না, জনতার সঙ্গে মিশে যেতে হয়। মধ্যবর্তীকালে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যান। কার্যত তাঁরা নির্বাচকদের প্রতিভূ নন, বরং অনেকটা যেন আগেকার আমলের রাজারাজড়ার স্থান অধিকার করে থাকেন। গণতন্ত্রের এইসব ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার দরুন তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তিনি একথাও বলেন

যে, কোনো কোনো উন্নত গণতান্ত্রিক দেশ আগেকার আমলের হিংসা ও উৎপীড়ন থেকে মানুষকে নিরাপত্তা দিয়েছে বটে, তবে এমন গণতান্ত্রিক দেশও আছে যেখানকার বর্তমান উৎপীড়ন আগেকার আমলকেও হার মানায়।

তিনি সম্মোহিত ও উত্তেজিত জনতার কথা বলেছেন, যাদের দাপটে অন্যান্য সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান অবদমিত হয়। স্পষ্টতই তিনি ছিলেন সামাজিক সংস্থার বিষয়ে বহুত্ববাদী (pluralist)। বহুত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান পরিণামে গণতন্ত্রী সমাজের বহুমুখী উন্নয়ন ও বৈচিত্র্যের ধারাকে পরিপুষ্ট করে।[৪৮]

গণতন্ত্রের দোষত্রুটি যাই থাকুক না কেন নেতিবাচক দৃষ্টিতে তাকে তিনি বর্জন করেন নি। তিনি পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষের নৈতিক সত্তার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন যাতে বারংবার পরীক্ষা ও প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে মানুষ সঠিক পথে নিজেকে চালনা করতে শেখে। এই আত্মশাসনের বিকল্প শুধু একটা ভাল ও কুশল সরকার মাত্র নয়। নৈতিক বিবর্তনের ধারায় তিনি চাইতেন আত্মশাসন পদ্ধতি সৃষ্টি করতে। তিনি উপলব্ধি করেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাপকাঠিতে কিংবা দলীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনই সমাজবিবর্তনের শেষ ধাপ নয়। গণতন্ত্রের সমালোচনায় তাঁর এই মনস্তাত্ত্বিক নিদানের ভিত্তি হল "the democratic culture of the average man." (*Life Divine*. V. 2. p. 928)

নৈ রা জ্য বা দ

শ্রীঅরবিন্দের মতে কি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, কি সমষ্টিবাদ—উভয় ধারায় মানুষের প্রকৃতিগত জটিলতাকে উপেক্ষা করা হয়। সর্বোপরি উভয় ব্যবস্থাতেই মানুষের অন্তরাত্মা ও তার প্রধান চাহিদার বস্তু মুক্তির বিষয়ে এবং নিম্নপ্রবৃত্তি সমূহের নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উপেক্ষিত থেকেছে। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন অবশ্যই আছে, তবে সেটা হবে যথার্থ সঞ্চালক শক্তির প্রতি স্বাধীন ও স্বাভাবিক আনুগত্য এবং সেটা সরকারী শাসনযন্ত্রের প্রতি নয়।

সমষ্টিবাদ একটা বাস্তব সত্য, সমগ্র মানবজাতির একটা সমষ্টিগত সত্তা আছে। সেই সত্তার মূলে থাকে অন্তরাত্মা (soul) ও জীবন, নিছক মন আর দেহ নয়। মানবজাতির অন্তর্গত প্রতিটি সমাজেরও একটা ক্ষুদ্র আত্মা ও একটি গোষ্ঠী আত্মা (group soul) থাকে, যেগুলি সাধারণ প্রবণতা, চরিত্র ও মনোভঙ্গি গড়ে তোলে। তৈরি হয় সমাজজীবন ও সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সমাজের কেবল এক ধরনেরই যুক্তিশীলতা ও বাসনা গড়ে ওঠে না। গোষ্ঠীআত্মার বিকাশ ঘটে বিভিন্ন লোকের বিচিত্র চিন্তাভাবনার

মাধ্যমে। রাষ্ট্রের অধীনে যে সরকার—সেটা সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগুরু—যার দ্বারাই চালিত হোক না কেন, সেখানে শক্তিধর মানুষের উপর সেই রাষ্ট্রের অভীপ্সা নির্ভর করে।

শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রাচীন সমাজ রাষ্ট্র দ্বারা শাসিত হত না। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিবর্তনের ধারায় গঠিত গোষ্ঠী-আত্মা থাকত সমাজ শাসনের মূলে। প্রশাসকের কাজ ছিল সামাজিক অভীপ্সার রূপায়ণ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কালক্রমে উদ্ভূত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের অধীনে যখন সরকারের হাতে শাসনক্ষমতা বর্তাল তখন থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা সংখ্যালঘিষ্ঠ শাসকদের দাপটে ব্যক্তিস্বাধীনতা সংকুচিত হতে শুরু করে। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় সেই দাপট অনেক কম। সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নাশ করা হয়।

প্রকৃতিগতভাবে মানুষ চায় চিন্তার স্বাধীনতা, নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনের বিকাশ ও সৃজনকর্মের অবকাশ। কিন্তু রাষ্ট্র তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সৃজনশীল মানুষের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধে নৈরাজ্যবাদী (anarchist) চিন্তায়। নৈরাজ্যবাদ স্বতই রাষ্ট্রের বিপক্ষে যায়। রাষ্ট্র সেই প্রবণতার সঙ্গে মোকাবিলা করে ছককাটা আদর্শে লোককে শিক্ষিত করে তোলে এবং চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা রোধ করে।

সমষ্টিবাদের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদ কোনো সন্তোষজনক সামাজিক রীতিনীতি তুলে ধরতে পারে কিনা সে সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ প্রশ্ন তুলেছেন। অর্থাৎ প্রচলিত শাসনকাঠামো ছেড়ে নৈরাজ্যবাদ কার্যকর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম কিনা, যার উপর নতুন সমাজব্যবস্থা নির্ভর করবে। তিনি নিজেই তার উত্তরে বলেছেন যে, নৈরাজ্যবাদের সুনির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই বটে, কিন্তু মানবিক বিকাশের পরিপন্থী প্রচলিত ব্যবস্থায় ব্যক্তি মানুষের সত্তা যখন অবদমিত হয় তখন তার সামাজিক চাপ ও চাহিদা নৈরাজ্যবাদে বিকল্প পথের সন্ধান করে। নৈরাজ্যবাদের হিংসাত্মক দিকটিকে বাদ দিয়ে তিনি তার মানব অধিকারের দিক, অর্থাৎ "live his own life"-এর আদর্শকে প্রাধান্য দিতে বলেন। তাঁর মতে মানুষের একটা উচ্চতর মননশীল নৈরাজ্যবাদী চিন্তা থাকে যেটা লক্ষ্য ও রূপায়ণের একটা সুদূর যুক্তিশীল সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়, যেটা হল প্রকৃতির এক যথার্থ সত্য এবং মানুষের দিব্যসত্তা।

মানবজাতির বিকাশ তথা কল্যাণমুখী সাধারণ আদর্শের পরিপন্থী ও পীড়নকারী বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদ বিদ্রোহ করে। নৈরাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, বাইরের নিয়মনিগড়ের পরিবর্তে ভিতর বা অন্তরের বিধিনিষেধ যত বেশি ক্রিয়াশীল হবে মানুষ তত বেশি সত্য ও স্বাভাবিক বিকাশের আস্বাদ পাবে। নিখুঁত সেই সমাজব্যবস্থায় সরকারি আধিপত্যের পরিবর্তে মানুষে-মানুষে মুক্ত ঐকমত্য ও সহযোগ গড়ে উঠবে।

নৈরাজ্যবাদকে তিনি নতুন এক নামে 'কো-অপারেটিভ কমিউনিজম' বলে

অভিহিত করেন। তাতে সমবায়ী সম্পর্কের ভিত্তিতে সবাইকার শ্রম ও সম্পদ সাধারণভাবে সারা সমাজের বলে গণ্য হবে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবে না। নৈরাজ্যবাদীরা অবশ্য কমিউনিজমের সঙ্গে আপসে বিশ্বাস করে না। কমিউনিজমের চূড়ান্ত নৈরাজ্যবাদী আদর্শ অনুযায়ী রাশিয়াতে একদিন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিলোপ (withering away of the state) চিন্তা আধুনিক জীবনের জটিলতা ও ব্যাপকতার দিক থেকে অবাস্তব ও অসম্ভব। বিকল্প নৈরাজ্যবাদী শাসনকাঠামোয় বিস্তারিত আলোচনায় শ্রীঅরবিন্দ যান নি।

নৈরাজ্যবাদী প্রবণতার সমর্থনে তিনি লিখেছেন যে, মানুষের প্রকৃতি বিবর্তনের ধারায় পরিবর্তনশীল। লোকের যুক্তিপ্রবণতা মানুষকে উচ্চ ও নীচের টানাপড়েনে নিরাপত্তা দিতে পারে না। তাঁর কথায়, "the ideal of intellectual anarchism might be more feasible as well as acceptable"।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে একটা আত্মিক নৈরাজ্যবাদ (intellectual anarchism) উল্লিখিত মানবিক বিকাশ সম্পৃক্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। এযাবৎকালের যাবতীয় চিন্তাভাবনা ও মতাদর্শের বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পেঁছিন যে, "a spiritual or spiritualised anarchism might appear to come nearer to the real solution"।

অবশেষে তিনি একথা বলেন যে সমাধানের পথ যুক্তিধর্মিতা নয়, সমাধানের পথ হল মানবাত্মা ও তার আধ্যাত্মিক (spiritual) প্রবণতা। তিনি অনুভব করেন যে সমাজবিবর্তনের একটি স্তরে যুক্তিবত্তা যে বিধিব্যবস্থার উদ্ভাবক সেটা মানবপ্রকৃতি অথবা সমষ্টিগত মানুষের বিকাশসাধন করতে সাময়িকভাবে সক্ষম। তাঁর দৃষ্টিতে যুক্তিবত্তার কার্যকারিতা একটি নির্দিষ্ট পরিধিতে সীমাবদ্ধ।

তিনি অনুভব করেন যে, মানবসমাজের যথার্থ বিকাশ ও অগ্রগতির জন্যে মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন হওয়া প্রয়োজন। পরিবর্তনটা তাঁর দৃষ্টিতে বলা বাহুল্য আধ্যাত্মিক। তিনি চাইতেন বস্তুগত বিষয় থেকে আত্মিক স্তরে উত্তরণ। আধ্যাত্মিক সত্তাই হল মানুষের আসল পরিচয়, যেটা সমাজে উপেক্ষিত থেকেছে। তাই তিনি আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের মধ্যে দুটি বিষয়কে যুক্ত করেন। একটি হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং অপরটি হল গণ, সমাজ বা গোষ্ঠীগত সংগঠন।[৭৯]

অধ্যাত্মায়িত সমাজ (spiritualised society) সর্বস্তরের মানুষকে যান্ত্রিক প্রশাসনে তাড়না বা পীড়ন না করে ছোটবড় সবাইকার অন্তরাত্মাকে উত্তোলন করবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে সমাজের লক্ষ্য বিশাল যান্ত্রিক উৎপাদন নয়, প্রতিটি মানুষকে তার প্রকৃতি ও ক্ষমতা অনুযায়ী কাজের আনন্দ ও অবসরের সুযোগ দিয়ে বিবর্তনের ধারায় তাকে যথার্থ লক্ষ্যাভিমুখী করা।[৮০]

শ্রীঅরবিন্দ চাইতেন অতিমানসের স্তরে (supramental state) মানুষের উত্তরণ। তাতে আর্থ-সামাজিক অসাম্য দূরীভূত হবে বলে তিনি মনে করতেন। আধ্যাত্মিক বিবর্তনধারায় গড়ে উঠবে এক নতুন মানবসমাজ যার প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দার্শনিক বনিয়াদ হিসেবে তিনি আধ্যাত্মিক কমিউনিজম (spiritual communism) নামে এক অভিনব মতাদর্শ তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

The spiritual communism of Aurobindo Ghose is a mixture of Hegelian idealism and Hindu mysticism···Is it any wonder that those actuated by such philosophy will teach that the national regeneration of the Indian people is to be attained by meditation![৫১]

শিক্ষা চিন্তা

সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষা সম্পর্কেও শ্রীঅরবিন্দ গভীর ও মৌলিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। এবিষয়ে তিনি মোটামুটি তিনটি মূল নীতি নির্ধারিত করেছেন।

প্রথম নীতিটি হল : "nothing can be taught"। অর্থাৎ মানুষ বাইরে থেকে নতুন কিছু শেখে না। শিক্ষণীয় সকল বিষয়ই তার অন্তরে নিহিত থাকে। শিক্ষার কাজ বহির্জগতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর্লোকের মিলন ঘটিয়ে দেওয়া। জ্ঞানের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত ; সূক্ষ্ম চেতনাই তার প্রধান উপাদান ; শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জন প্রচেষ্টাকে যথোচিত পথে পরিচালনাই শিক্ষার লক্ষ্য ; পরিচালনা মানে খবরদারি করা নয়। মনের ধারা যতই স্বতঃস্ফূর্ত হোক না কেন অবরোহী (deductive) প্রণালীতে তা স্ফুরিত হয় না। শিক্ষকের কাজ মানুষকে নিয়ে—কিন্তু তিনি মানুষকে কুমোরের মত খেয়ালখুশি অনুযায়ী গড়েপিটে তৈরি করতে পারেন না। যে-উপাদান নিয়ে শিক্ষকের কারবার তার প্রকৃতি ভিন্ন। সচেতন ও স্বতঃস্ফূর্ত সে-উপাদান আত্মনিয়ন্ত্রণের আবেগে প্রচ্ছন্ন থাকে। শিক্ষার্থীর প্রবণতা অনুযায়ী এবং তার ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী তাকে বিকশিত হতে সাহায্য করাই হল শিক্ষকের কাজ। শিক্ষকের কাজ কুচকাওয়াজ করানো নয়, তিনি একজন পথপ্রদর্শকমাত্র।

দ্বিতীয় নীতি হল : "the mind has to be consulted in its own growth"। সব মনের গড়ন সমান নয়। বরং প্রত্যেক মনের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য, শক্তি ও প্রবণতা থাকে। কাজেই শিক্ষককে ছাত্রের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা ও মনোবৃত্তির সন্ধান রাখতে হবে। মনকে উপেক্ষা করে ভিন্ন ছাঁচে

মানুষ গড়া যায় না। তার ভাবী কর্মজীবনকে আগে থেকে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়; এ-নীতির ব্যতিক্রম পরিণামে বিষময় হয়ে ওঠে। ছোটদের ভবিষ্যৎ তাদের রুচি ও প্রবণতার উপর ছেড়ে না দিয়ে অভিভাবকেরা তাদের হয়ে লেখাপড়ার বিষয় বেছে দেন ও কর্মজীবন নির্ধারিত করে দেন। কারণ লক্ষ্যটা থাকে অর্থোপার্জনে। ফলে কামার হয় কুমোর, ডাক্তার হয় ইঞ্জিনিয়ার, স্বভাবশিল্পীকে করে তোলা হয় নীরস বিজ্ঞানীরূপে; তাই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—

> Everyone has in him something divine, something his own··· the chief aim of education should be to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make it perfect for a noble use.[৫২]

তৃতীয় নীতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ হল: "to work from the near to the far, from that which is to that which shall be"। প্রতিটি আত্মার একটা অতীত আছে আর পূর্বকৃত কর্মের ফলাফলেই বর্তমান জীবন গঠিত। অনাদিকাল থেকে সঞ্চিত কর্মফলের ভিত্তিতে মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি রূপায়িত হয়ে এসেছে। অবশ্য বংশ, জাতি, দেশ, কাল ও পরিবেশ চরিত্রকে প্রভাবিত করে। নিজ প্রকৃতিসহ আত্মা মাতৃজঠরে দেহ ধারণ করে, পরে পিতামাতার মন সন্তানের মনে বিম্বিত হয়। পিতামাতার সত্তা নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে ক্রমে মানুষ পরিবার, সমাজ ও জাতির গুণাগুণ অর্জন করে। তাই শিক্ষার্থীর মানসিক পশ্চাৎপটও বিবেচ্য। শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের আনুপূর্বিক প্রভাব, পরিবেশ ও পরিবর্তন তথা তার অতীত কথা জানা না থাকলে শিক্ষার্থীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনপথ রচনা করা কঠিন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—

> The past is our foundation, the present our material, the future our aim and summit.

শিক্ষা পরিকল্পনায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়সমূহের স্থান থাকা নিতান্তই আবশ্যক। তত্ত্বগত এই দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর কর্মপন্থা নিরূপণ করেন।

শ্রীঅরবিন্দের মতে চিন্তার যন্ত্রস্বরূপ মনের শক্তি বিপুল ও বৈচিত্র্যময়। সেই মনকে তিনি চারটি স্তরে বিন্যাস করেছেন: চিত্ত, মানস, বুদ্ধি ও স্বজ্ঞা।[৫৩] স্মৃতির ধারক ও বাহক হল চিত্ত। সেখানে সঞ্চিত নিষ্ক্রিয় স্মৃতি থেকে সক্রিয় স্মৃতি উৎপন্ন হয়। নিষ্ক্রিয় স্মৃতি অতীত সম্পর্কে নিশ্চেতন নথি বহন করে মাত্র; মানুষের জীবনে তার প্রত্যক্ষ কোনো ব্যবহার হয় না; আবার মনের উপর অতীতের সেই অচেতন ছাপ মুছে দেওয়াও যায় না। সক্রিয় মনের বিকাশ সাধন তাঁর মতে সম্ভব।

মনের দ্বিতীয় স্তর মানসের ভিত্তি হল পঞ্চেন্দ্রিয়। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানসের নিরন্তর পরিপুষ্টি হতে থাকে; শিক্ষার্থীকে কোনো কিছু শেখানোর সময়ে সেই বস্তুকে সরাসরি প্রদর্শন করলে বিষয়টা তার মনে গেঁথে যায়। মনের বস্তুনিরপেক্ষ স্বাধীন একটা শক্তি আছে বলে তিনি মনে করতেন এবং সেই শক্তি মানসেরই সৃষ্টি। যৌগিক প্রক্রিয়ায় অতিদূরের অদৃশ্য বস্তুর অবস্থানও স্পষ্ট জানা যায়। শ্রীঅরবিন্দ তাই মানসের যথোচিত পরিশীলনের প্রয়োজন অনুভব করতেন। সেজন্যে তিনি যোগসাধনার উপর গুরুত্ব দেন এবং ছোটবেলা থেকেই যোগাভ্যাসে মানুষকে প্রবৃত্ত করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

মনের তৃতীয় স্তর বুদ্ধি। বুদ্ধির জোরেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জিত জ্ঞান সুসংবদ্ধ হয়। বৌদ্ধিক স্তরেও কয়েকটি ক্রিয়া থাকে। তার মধ্যে কিছু সৃজনশীল ও সামঞ্জস্যবিধানকারী, অন্যগুলি অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণমূলক। যুক্তি ও সৌন্দর্যবোধ এবং কল্পনাশক্তিরও উৎস সেইখানে। ছোটদের কল্পনা-শক্তির বিকাশে উৎসাহদান শিক্ষকের কর্তব্য। প্রথমে তাদের দৃষ্টি বস্তুর প্রতি আকর্ষণ করে ক্রমে মননক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করা প্রয়োজন। অধীত জ্ঞান যদি মানুষের মনকে গড়ে তুলতে না পারে তাহলে সেটা একটা বোঝাস্বরূপ প্রতি-পন্ন হয়; সেজন্যে প্রায়োগিক দৃষ্টিতে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে ন্যায়শাস্ত্র এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের সংযোগ থাকা উচিত।

মনের শেষ ও চতুর্থ স্তর স্বজ্ঞার (intuition) উপর শ্রীঅরবিন্দ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বুদ্ধি মানুষের মনে বিস্তৃতিলাভের বিস্তর সুযোগ পায়; কিন্তু স্বজ্ঞা পায় না। অনন্যসাধারণ মানুষের মেধা ও মনীষার ভিত্তি হল স্বজ্ঞা। শিক্ষককে জানতে হবে শিক্ষার্থীর সুপ্ত মন ও প্রবণতাকে; তাঁর আত্মাভিমান থাকলে চলবে না; তাঁর চাই সহানুভূতিসম্পন্ন সংবেদন-শীল মন।

তাঁর মতে শিশুকে ছবছর বয়সে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। তৎপূর্বে শিশুর দৈহিক ও মানসিক গঠন অনুপযোগী থাকে। শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর মাতৃভাষাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রদের সহজাত নীতিবোধ জাগ্রত করা বিশেষ প্রয়োজন—তবে সেটা পাঠ্যপুস্তক বা সিলেবাসের সাহায্যে সম্পন্ন করা যায় না। তার সঠিক প্রণালী হল ছাত্রদের সহজাত আবেগ, মেলামেশার অভ্যাস এবং সহজাত প্রকৃতি বুঝে তাদের ঐসব বিষয়ে উপযুক্ত পথের নিশানা দেওয়া। বাইরে থেকে তাদের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা ক্ষতিকর। তাদের সামনে রাখতে হবে অনুকরণীয় আদর্শ চরিত্র। আত্মত্যাগ, জ্ঞানতৃষ্ণা, নির্মলতা, সাহসিকতা, দেশাত্মবোধ, মহানুভবতা প্রভৃতি শিক্ষকের চরিত্রে থাকলে ছাত্রদের পক্ষে তা সহজে গ্রহণীয় হতে পারে। সেকাজ শুধুমাত্র গালভরা বক্তৃতায় হয় না।

শ্রীঅরবিন্দের মতে ধর্মশিক্ষার চেয়ে ধর্মজীবন যাপন অধিক কার্যকর। তত্ত্বগত শিক্ষার সঙ্গে ধ্যান, উপাসনা ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজনকে তিনি অস্বীকার করেন নি। দেশের মাটির দিকে লক্ষ্য রেখেই যে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি রচিত হওয়া উচিত সেকথাও তিনি তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

উপসংহার

শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদের এক নতুন ধারার স্রষ্টা। শুধু ভারতই নয় বিশ্বের আধুনিক চিন্তা ও দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি এক নতুন দিকের সূচনা করেছেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী শ্রীঅরবিন্দ একাধারে ছিলেন কবি, শিল্পশাস্ত্রী, দার্শনিক, দেশপ্রেমিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।

রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মতৎররতা থেকে তিনি ক্রমে যোগসাধনা ও দার্শনিক জীবনের দিকে সরে যান। তাঁর মোট রাজনৈতিক জীবনকাল বিশ (১৮৯০-১৯১০) বছরের অধিক নয়। গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রথম প্রয়াসের দু-বছর (১৯০২-০৪) ধরলে প্রকাশ্য রাজনৈতিক জীবনের (১৯০৬-১০) অভিজ্ঞতা ছবছরের মত দাঁড়ায়। রাজনৈতিক চেতনার গোড়ার দিকে অর্থাৎ বিলাতের প্রবাসজীবনে তিনি কংগ্রেস-নীতির বিরোধী ছিলেন না। পরে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি ও আয়াল্যান্ডের সংগ্রামী আন্দোলনের প্রভাবে কংগ্রেসের তোষণ নীতির তীব্র সমালোচক হয়ে পড়েন। তাই দেশে প্রত্যাবর্তনের পর কংগ্রেস-নীতির বিকল্প হিসেবে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ তুলে ধরেন। তদানীন্তন কংগ্রেসকে মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান বলেই তিনি মনে করতেন এবং প্রলেটারিয়েট শ্রেণীস্বার্থ রক্ষণকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর প্রলেটারিয়েটবাদ মার্কসীয় প্রত্যয় থেকে স্বতন্ত্র ছিল। কারণ শ্রীঅরবিন্দ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রলেটারিয়েটদের মস্তিষ্ক জ্ঞান করতেন—যেটা মার্কসীয় চিন্তার পরিপন্থী।

বাংলায় তাঁর গুপ্ত সমিতি সংগঠনের প্রথম প্রয়াস (১৯০২-০৪) আভ্যন্তরিক বিবাদের ফলে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় তিনি বরোদায় ফিরে গিয়ে দেশশক্তির সুপ্তি-ভঙ্গকল্পে বগলা মূর্তির পূজা করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অবস্থা অনুকূল উপলব্ধি করে আবার বাংলা দেশে ফিরে আসেন (১৯০৬)। নবোদ্যমে গুপ্ত সমিতি গঠন এবং চরমপন্থী বিপ্লবী পন্থা গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বারের প্রচেষ্টাও নিষ্ফল হয়ে যাওয়ায় তিনি চন্দননগরে প্রস্থানের পূর্বে বিপ্লবীদের 'উন্দাম আচরণ' থেকে নিবৃত্ত হবার ও তাঁদের 'শক্তিকে অন্তর্মুখী' করার নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক জীবনের গোড়ার দিকে তিনি ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে অগ্নি ও রক্তস্নানের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং শেষ দিকে অস্ত্রের অভাবে যুদ্ধ

থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। যখনি তাঁর লৌকিক উপায় ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়েছে তখনি তিনি অলৌকিক পন্থা অবলম্বন করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিপ্লবী আবেগের ইন্ধন হিসাবে সরকারের 'আরও বেশী অত্যাচার' তিনি কামনা করতেন। কিন্তু শেষ দিকে তিনি সরকারি উৎপীড়ন প্রশমনের জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি একই সঙ্গে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (বিপিনচন্দ্রের) ও বিপ্লবী প্রচেষ্টার সমর্থক ছিলেন। অনেক পরে অবশ্য তিনি দ্বিতীয় পন্থাটিকে পরিহার করেন। বিপ্লববহ্নি প্রজ্বলিত করে সহসা তাঁর রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোকে অনেকে তাঁর দায়িত্বজ্ঞানহীন পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করেন। বস্তুত সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ তাঁর মানসিক প্রবণতার বিরোধী ছিল। তাঁর প্রবণতা ছিল অন্তরালে থেকে মানুষের চেতনা সৃষ্টি করা—সক্রিয় রাজনীতি নয়। প্রকাশ্য রাজনীতিতে নামার আগে ও পরের উক্তিগুলি তাঁর এ-মনোভাবেরই সমর্থন জানায়।

সমসাময়িককালে জাতীয়তাবাদকে যান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে দেখা হত। তিনি সেই দৃষ্টিতে পবিত্র দেশানুরাগ ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের আবেগ সঞ্চারিত করেন। তিনি মনে করতেন সার্বজনীন ঐক্যের পথ অনুসরণ করে মানব প্রকৃতির দিব্য রূপান্তর ভিন্ন সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব হবে না। জাতিকে তিনি দিব্য অভিব্যক্তিরূপে দেখেছেন। জাতিকে মহাজাতিতে পরিণত করার জন্যে তাঁর গণতান্ত্রিক স্বরাজের দাবিও সেই দিব্য প্রেরণায় মূর্ত হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ থেকে সুভাষচন্দ্র অবধি বাংলার জনমানসে শক্তি ও আশার যে উচ্ছ্বাস জাগে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন তার একজন মন্ত্রদাতা।

তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক রূপায়ণ চেয়েছিলেন এবং মনে করতেন যে প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় বহু নিগূঢ় তত্ত্ব আছে যা এখনও মানুষকে সঠিক পথের নিশানা দিতে পারে। ভারত কোনো দিনই আক্রমণকারী দেশরূপে গড়ে উঠবে না—সে তার সনাতন জ্ঞানভাণ্ডার মনুষ্য সমাজের সাম্য, ঐক্য ও সমৃদ্ধির জন্যে উন্মুক্ত রাখবে।

শ্রীঅরবিন্দ আধুনিক ধনতন্ত্রবাদের বিরোধী ছিলেন। নৌরজি ও গোখলের মতো তিনিও বিদেশী শাসনজনিত কারণে দেশীয় ধনের নিষ্কাশন (drain) তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। একচেটিয়া মালিকানা ও কেন্দ্রীভূত ব্যবসায়ী জোটবদ্ধতাকে তিনি বিষনজরে দেখতেন। পক্ষান্তরে প্রচলিত সমাজতন্ত্রবাদকেও তিনি সর্বশক্তিমান মুষ্টিমেয় ক্ষমতাসীনের রাজত্বরূপে দেখেছেন; ব্যবসায়বাণিজ্যে সরকারি অনুপ্রবেশ স্বভাবতই আমলাতন্ত্র ও ক্ষমতাসীনদের সৃষ্ট ফৌজি নিগড়ে সমাজকে আবদ্ধ করে রাখে। সমাজতন্ত্রবাদের এই প্রকৃতি জানা সত্ত্বেও তিনি সেটাকেই প্রগতির প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে সমাজজীবনকে সুষ্ঠুরূপ দিতে হলে সামাজিক, অর্থনৈতিক সমতা ও নিরাপত্তা থাকা একান্তই

প্রয়োজন। কিন্তু বিকল্প অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি।

পশ্চিমী চিন্তাভাবনায় তিনি যথেষ্টই প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মতোই তিনি পশ্চিমের প্রাধান্যকে স্বীকার করতেন না। তাঁর অধিবিদ্যা, সংস্কৃতিতত্ত্ব, ইতিহাসচিন্তা, জাতীয়তাবাদের নব্যবিশ্লেষণ, মুক্তির সঙ্গে আধ্যাত্মিক যূথবদ্ধতার চিন্তাভাবনা প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের নিপুণ সংমিশ্রণ। দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় ক্ষেত্রে তাঁর অলৌকিক বা দিব্যশক্তির প্রত্যয় আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে কিছুটা বিসদৃশ ঠেকে; সেজন্যেই হয়তো বর্তমান জনচিত্তে তাঁর কোনো প্রভাব পড়ে নি। তাহলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এবং প্রাচীন ও নবীন চিন্তার মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন।

দার্শনিকদের মধ্যে অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস নতুন কিছু নয়; বস্তুতন্ত্রীদের কাছে তাঁরা হয়তো প্রগতির অন্তরায়; আবার দিব্যসত্তায় আস্থাবান যাঁরা তাঁদের কাছে বস্তুতন্ত্রীরা অন্তঃসারশূন্যরূপে বিবেচিত। দিব্যশক্তিতে বিশ্বাসীদের নিকট শ্রীঅরবিন্দের রাষ্ট্রদর্শন মূল্যবান। বস্তুনিষ্ঠ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাঁর কাছ থেকে পশ্চিমী আধুনিকতা ও প্রাচ্যের ভাবধারা সংমিশ্রিত একটা নতুন চিন্তার খোরাক পেতে পারেন। বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে সকল মানুষই যখন এক দার্শনিক সংকটের সম্মুখীন এবং ভাব ও বস্তুর মধ্যে দিয়ে একটি নতুন পথের সন্ধানে উন্মুখ তখন শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান-চর্চায় নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

উৎস নির্দেশ

১. H. Mukherjee and U. Mukherjee (ed). *Sri Aurobindo's Political Thought (1893-1908)*. 1958. p. 76.

২. *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother*. 1953. p. 38.

৩. 'অরবিন্দের পত্র'। প্রবর্তক। চন্দননগর। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। পৃ ৬-১১।

৪. Quoted in: K. R. Srinivasa Iyengar. *Sri Aurobindo*. 1945. p. 165.

৫. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী। 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলায় স্বদেশীযুগ'। ১৯৫৬। পৃ ৪৪০।

৬. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952. p. 52

৭. *Ibid*. p. 82.

৮. Sri Aurobindo. *The Ideal of Karmayogin*. p. 7.

৯. *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother*. 1953. pp. 310-313.

১০. শ্রীঅরবিন্দ। 'অরবিন্দ মন্দিরে'। ১৩২৯ বঙ্গাব্দ। পৃ ২৫-২৬।

১১. শ্রীঅরবিন্দ। 'দিব্য-জীবন'। ১৯৪৮। খণ্ড ১। পৃ ২৮।

১২ শ্রীঅরবিন্দ। 'ধর্ম' ও জাতীয়তা'। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ। পৃ ২১-২৫।
১৩. তদেব। পৃ ১০-১৫, ২৩-২৫।
১৪. *Sri Aurobindo on Himself and on the Mother*. 1953. p. 164.
১৫. Sri Aurobindo. *Synthesis of Yoga*. p. 704.
১৬. *Sri Aurobindo on Himself and the Mother*. 1953. p. 233.
১৭. Sri Aurobindo. *The Human Cycle*. pp. 2-14.
১৮. *Ibid*. pp. 113-118.
১৯. Sri Aurobindo. *The Spirit and Form of Indian Polity*. 1947. p. 12.
২০ *Ibid*. pp. 83-93.
২১. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952. pp. 36-38.
২২. Sri Aurobindo. *Ideals and Progress*. 1951. pp. 45-51.
২৩. Sri Aurobindo. *The Spirit and Form of Indian Polity*. 1947. pp. 25-26.
২৪. Sri Aurobindo. *The Ideal of Human Unity*. 1950. pp. 17 -179.
২৫ *Ibid*. p. 181.
২৬. *Ibid*.
২৭. *Ibid*. p. 184.
২৮. *Ibid*. p. 27.
২৯. *Ibid*. pp. 128-130.
৩০. *Ibid*. p. 397.
৩১. *Ibid*. p. 84.
৩২. *Ibid*. p. 130.
৩৩. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952. pp. 6-7 (প্রমোদকুমার সেন। 'শ্রীঅরবিন্দ : জীবন ও যোগ'। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। ৭২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।
৩৪. Quoted in: K R. Srinivasa Iyengar. *Sri Aurobindo*. 1945. p. 150.
৩৫ *Ibid*.
৩৬. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952. p. 41.
৩৭ প্রমদারঞ্জন ঘোষ। 'শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন'। ১৯৬৬। পৃ ১০৪।
৩৮ Sri Aurobindo. *The Doctrine of Passive Resistance*. 1948. p. 79.
৩৯. *Ibid*. p. 63.
৪০ *Ibid*. pp. 62-63.
৪১. Sri Aurobindo. *Speeches*. 1952. p. 120.
৪২ Sri Aurobindo. *The Human Cycle, The Ideal of Human Unity, War and Self-determination*. Pondicherry. 1962. pp. 17-28.
৪৩ *Ibid*. p. 69.
৪৪. *Ibid*. pp. 264-266.
৪৫ *Ibid*. pp. 268-275.
৪৬. *Ibid*. pp. 275-276.
৪৭. *Ibid*. p. 239.
৪৮. *Ibid*. pp. 291-2.
৪৯. *Ibid*. pp. 281-296.
৫০. *Ibid*. pp. 331-353.
৫১. M. N. Roy. "Spiritual Communism", *Vanguard*. V. 4, n. 1, 15 Dec. 1923 (Printed in G. Adhikari (ed). *Documents of the History of the CPI*. V. 2. pp. 216-220).
৫২ Sri Aurobindo. *A System of National Education*. 1953. pp. 3-5.
৫৩. *Ibid*. pp. 7-12.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥ ১৮৬১-১৯৪১

উনিশ শতকের ভারতীয় নবজাগরণ ধর্ম ও রাজনীতির দ্বিমুখী ধারায় দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নরমপন্থী ও চরমপন্থী নামে অভিহিত দুটি উপধারার কথা প্রথম খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে শতাব্দীর শেষদিকে তিনটি উপধারা দেখা দেয়: বৈদিক, পৌরাণিক ও ঔপনিষদ। বৈদিক স্বর্ণময় যুগের পুনরাবর্তনে উৎসাহিত হয়েছিলেন আর্যসমাজ-আন্দোলনের প্রবর্তক দয়ানন্দ সরস্বতী। পৌরাণিক আদর্শের অনুরাগী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও অরবিন্দ। শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে-ঔপনিষদ বা বৈদান্তিক ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল রামমোহনের প্রচেষ্টায়—সেই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হন বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। চিন্তা ও সাধনায় বিবেকানন্দ পরবর্তীকালে পৌরাণিক ধারায় আকৃষ্ট হন। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ রামমোহনের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অপেক্ষা অতীন্দ্রিয় ভাবাদর্শেই বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন।

রামমোহন, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ চিন্তা-নায়কদের প্রেরণার প্রধান উৎস ছিল ইউরোপের রেনেসাঁস। বিবেকানন্দ বিপরীত চিন্তা পোষণ করতেন। তাঁর মতে ভারতই বিশ্বকে প্রেরণার সন্ধান দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথও কতকটা সেই মতে বিশ্বাসী ছিলেন; অবশ্য সেইসঙ্গে একথাও মনে করতেন যে পশ্চিমের কাছে ভারতের যেমন এক মিশন আছে ভারতেও পশ্চিমের অনুরূপ মিশন আছে।

রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ সকলে প্রায় একই মিশনে বিদেশ পর্যটনে যান। পশ্চিমী সমাজ রামমোহনের প্রখর ব্যক্তিত্ব ও মননশীলতা প্রত্যক্ষ করেছিল; কিন্তু তাঁর স্বাদেশিক চিন্তার কোনো বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করে নি। ইংল্যান্ডে কেশবচন্দ্রের ভারতীয় আদর্শ অপেক্ষা পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবই বেশি দেখা যায়। বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম নিজ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রাধান্য দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তবে পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দের সেই বিজয় অভিযান সেখানকার জনচিত্তে যতটা না প্রতিফলিত হয় তার চেয়ে বহুলাংশে অধিক কার্যকর হয় ভারতীয় জনমানসের সুপ্তিভঙ্গে; দেশবাসীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তির উন্মেষসাধনে তিনি সফল হন। কিন্তু ভারতীয় ও পশ্চিমী চিন্তার মিলনসাধনে তাঁর ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। হিন্দু-ধর্মের প্রচারই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই পশ্চিমের কিছুসংখ্যক মানুষকেই কেবল তিনি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ কোনো ধর্মমতের বাহক হিসাবে অন্য দেশের মানুষের মনে সংঘাত সৃষ্টি করেন নি।

তাঁর আবেদন ছিল মানুষের হৃদয়ে—দেশ, কাল, ধর্মের ঊর্ধ্বে সহজাত শাশ্বত মূল্যবোধে। ভারতের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য তথা বিশ্বমানসের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মিলনসাধনের প্রয়াস রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বহৃদয়ে স্থায়ী আসন দান করেছে।

সাধারণত দুটি দিক থেকে স্বাদেশিকতা দানা বেঁধে ওঠে। একটি স্বদেশ ও স্বজাতির অতীত আদর্শে প্রেরণার সন্ধান করে এবং স্বভাবতই এই পশ্চাৎ-মুখী দৃষ্টি কিছুটা রক্ষণশীল ও প্রথানুসারী হয়ে থাকে। দ্বিতীয় দৃষ্টিতে মানুষ সামনের দিকে তাকায়; মন তখন আর ইতিহাস-ভূগোলের সীমানা মানে না; একই সঙ্গে স্বদেশ ও বিদেশের ভাবাদর্শ সমন্বিত হয়। প্রথানু-সারিতার বিপরীত এই দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিঃসন্দেহে প্রগতির পরিচায়ক। বস্তুত দুটি দৃষ্টির সমন্বয়ে সুস্থ সমাজ ও জীবনবোধ গড়ে ওঠে। অতীতের গ্রহণযোগ্য চিন্তা ও বর্তমান জীবনাদর্শ, দেশ ও বিদেশের যা-কিছু যুক্তিবহ তার সংমিশ্রণে সঠিক জীবনবোধ দেখা দেয়। মানসিক বিবর্তনের প্রথম দিকে রবীন্দ্রমানসে প্রথমোক্ত চিন্তারই প্রাধান্য ছিল। পরের দিকে দ্বিতীয় মনোভাবের মধ্যে দিয়ে উল্লিখিত জীবনবোধ প্রবল হয়।

আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং স্বাদেশিক চিন্তায় প্রত্যক্ষভাবে পিতার ও পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে তাঁর মন গড়ে ওঠে। কৈশোরে অগ্রজদের সঙ্গে হিন্দুমেলায় যেতেন। চৌদ্দ বছর বয়সের লেখা কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' হিন্দুমেলায় (১৮৭৫) পঠিত হয়। আধা-রাজনৈতিক উপলক্ষে প্রকাশিত এই কবিতাটি স্বনামে ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম রচনা।[১] তখনও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় নি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ও রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে গঠিত সঞ্জীবনী-সভার রুদ্ধদ্বার গুপ্ত অধিবেশনগুলি কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে উত্তেজনার সঞ্চার করত। 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত কবির বিভিন্ন রচনা সমসাময়িক বিদ্বৎ সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ক্রমে তিনি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। সে-সময়ে দেশে যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলেছিল তাতে তাঁর বিশেষ রুচি ছিল না। তৎপরিবর্তে তিনি তাঁর কবিতায়, গানে, প্রবন্ধে ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে আত্ম-শক্তির উদ্বোধন ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রচারে ব্রত হন। এ-বিষয়ে তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়ে (১২৯১ বঙ্গাব্দ) তিনি ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনের ধারাকে নিষ্ঠার সঙ্গে বহন করে চলেন। সে-সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও হিন্দু বর্ণাশ্রম আদর্শের একনিষ্ঠ অনুরাগী ছিলেন। তাই দয়ানন্দ সরস্বতীর আর্যসমাজ আন্দোলনেও "মহৎ আশার কারণ" প্রত্যক্ষ করেন। প্রাচীন বৈদিক ভারতের আদর্শেই তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) করেছিলেন। হিন্দু রক্ষণশীলতার উগ্র সমর্থক ব্রহ্মবান্ধব

উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭) এ ব্যাপারে তাঁর বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন, 'নববর্ষ' 'হিন্দুত্ব' 'ব্রাহ্মণ' 'সমাজভেদ' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর তখনকার রক্ষণশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ দুবার বিলাতভ্রমণ (১৮৭৮ ও ১৮৯০) করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের তখনকার জীবনসমস্যা ও সাধনা তাঁর মনকে স্পর্শ করে নি। সেখানকার ধনতান্ত্রিক যন্ত্রসভ্যতা কবিমনের হৃদয়াবেগ, গভীর অনুভূতি ও কাব্যসাধনার অনুকূল নয় বলেই তাঁর মনে হয়েছিল।

১৮৮৬ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কবি স্বরচিত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গেয়ে শোনান। ১৮৯৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে তিনি 'বন্দেমাতরম্' গানটি স্বয়ং-যোজিত সুরে গেয়ে শোনান। তখন থেকে তাঁরই দেওয়া সুরে গানটি গাওয়া হয়ে আসছে।' সংবাদপত্রে স্বাধীন মতামত প্রকাশের বিরুদ্ধে ভারত সরকার সিডিশন বিল (১৮৯৮) বিধিবদ্ধ করেছিলেন। সেইসময়ে টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক প্রতিবাদ-সভায় কবি 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের নাটোর অধিবেশনে (১৮৯৭) সভাপতিত্ব করে-ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাপতির ভাষণ বাংলায় দেবার জন্য কবি সে-সময়ে প্রথম দাবি তোলেন। সেই বছরে রাজদ্রোহের দায়ে টিলক কারারুদ্ধ হন। রবীন্দ্রনাথ টিলকের মামলা পরিচালনার জন্যে একটি অর্থভাণ্ডার খোলেন।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করে। ভারতেও অর্থনৈতিক সংকট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি কারণে মানুষের অশেষ দুর্গতি দেখা দেয়। শাসকদের ঔদাসীন্য ও উৎপীড়নে দেশের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের মনেও তখন চলেছিল দুটি ভিন্ন ধারার দ্বন্দ্বসংঘাত: একদিকে কোলাহলমুক্ত পরিবেশে সাহিত্যসাধনার আবেগ, অপরদিকে নতুন সমাজবোধ ও স্বদেশের কল্যাণ বাসনা। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় নবপর্যায়ে 'বঙ্গদর্শন' (১৯০১) আর 'সাধনা' (১৮৯১-৯৫) পত্রিকায় 'রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতি' 'রাজকুটুম্ব' 'ঘুষাঘুষি' 'ধর্মবোধের দৃষ্টান্ত' প্রভৃতি প্রবন্ধে কবির যুগচেতনা ফুটে ওঠে।

ফরাসি রাষ্ট্রবিদ্ ও ঐতিহাসিক ফ্রাঁসোয়া গিজো (১৭৮৭-১৮৭৪) লিখিত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' নামে এক প্রবন্ধে উভয় সভ্যতার মৌল পার্থক্য তুলে ধরেন। 'নেশন কী' এই প্রবন্ধে তিনি ফরাসি ঐতিহাসিক এর্নেস্ত রেনাঁ (১৮২৩-৯২)-র নেশন-তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন সাম্রাজ্যবাদ নেশনবাদেরই পরিণাম এবং রাষ্ট্রধর্মে মানবধর্মের স্থান নগণ্য।

'নৈবেদ্য' (১৯০১) কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ রবীন্দ্র মানসের ধারাপরিবর্তনের

সূচনা করে। তার আগে 'এবার ফিরাও মোরে' (১৮৯৪) কবিতাটি যেন তারই পূর্বঘোষণা। বিশ শতকের প্রাক্‌কালেই কবি জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বব্যাপী তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ফলে ইউরোপীয় উদারতন্ত্রে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তখন থেকেই তাঁর মনে বিশ্বজনীন চেতনা ঘন হতে শুরু করে। 'ইংরেজ ও ভারতবাসী' 'রাজনীতির দ্বিধা' 'সফলতার সদুপায়' প্রভৃতি নানা রচনায় তাঁর এই নব্যচেতনা ক্রমশ প্রকাশ পায়।

কার্জনের ইউনিভার্সিটি বিল ও বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবকে (১৯০৩) উপলক্ষ করে বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব আন্দোলন সৃষ্ট হয়। সেই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবির দেশাত্মবোধক বিখ্যাত গানগুলির অধিকাংশই সেইসময়ে রচিত হয়। 'ইম্পিরিয়ালিজম' প্রবন্ধে কবি সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদঘাটিত করেন।

১৯০৪ সালে কলকাতায় 'শিবাজী উৎসব' একটি স্মরণীয় ঘটনা। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা। মুঘল আধিপত্য থেকে দেশকে স্বাধীন করার যে ব্রত শিবাজী গ্রহণ করেছিলেন সেই আদর্শেরই পুনরুজ্জীবন ছিল উৎসবের লক্ষ্য। সেই উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় কবি তাঁর 'শিবাজী উৎসব' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উৎসবে তাঁর সংযোগ ও সমর্থন ছিল আংশিক; কারণ শক্তিপূজা ও রাষ্ট্রীয় সাধনায় সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটানোর তিনি বিরোধী ছিলেন।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সহযোগিতায় রাখীবন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন এবং ফেডারেশন হল (মিলন-মন্দির) গ্রাউন্ডে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে এক জনসভায় কবি প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করেন। সেইদিন বাগবাজারে পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে এক বিশাল জনসমাবেশে কবির আবেগময় ভাষণের ফলে জাতীয় ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছিল। এইসময়ে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্যের প্রসার-কল্পে কবির সম্পাদনায় 'ভাণ্ডার' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বক্তৃতা, গান ও প্রবন্ধ রচনার মধ্যে দিয়ে জনচেতনা সৃষ্টির সঙ্গেই তিনি জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তনেও সক্রিয় হন; বিশেষ করে যখন বঙ্গভঙ্গের সপ্তাহখানেক পর বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারি কার্লাইল স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে ছাত্রদের স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করেন। রবীন্দ্রনাথ সে-সময়ে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্যে দেশবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানান।

ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন চরমপন্থী ও নরমপন্থী কোনো দলের মতেই তিনি সায় দিতে পারেন নি। নরমপন্থীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ। অপরদিকে চরমপন্থীরা রাজনৈতিক তৎপরতাকেই অতি বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় প্রকৃত দেশগঠনে তাঁরা অবকাশ পেতেন না। রবীন্দ্রনাথ

রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপের বিরোধী ছিলেন। 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে বিপ্লবীদের বীরত্বের প্রশংসা করেন, কিন্তু হিংসাত্মক গোপন কর্মতৎপরতা সমর্থন করেন নি। পরবর্তীকালে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে সন্ত্রাসবাদী আদর্শের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন বীতশ্রদ্ধ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি অনুভব করেন সমাজচিত্তের বিকাশ ও পল্লী-কেন্দ্রিক সামাজিক পুনর্গঠনের প্রয়াস ব্যতিরেকে দেশের প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়, দেশবাসীর চেতনা ও নৈতিক নবজাগরণ ভিন্ন নিছক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে ঈপ্সিত ফললাভ ঘটবে না।

এর কিছু আগে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধটি রচিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিকেই তার রাষ্ট্রদর্শনের পূর্বাভাষ বলা যায়। তাতে তাঁর দেশগঠনের এক সুস্পষ্ট ও মৌলিক পরিকল্পনার রেখাচিত্র পাওয়া যায়। কবি রাষ্ট্র অপেক্ষা সমাজগঠনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। বিদেশী শাসক পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিকল্প সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের একটি কাঠামোর ইঙ্গিত তিনি সেই পরিকল্পনাটিতে দিয়েছিলেন। কবির মতে নিজেদের শিল্প-বাণিজ্য নিজেরাই গড়ব; সালিসি প্রথার সাহায্যে নিজেদের বিবাদবিসংবাদের নিষ্পত্তি করব; শান্তিরক্ষার জন্যে স্বেচ্ছাসেবক দল থাকবে; শিক্ষাব্যবস্থা হবে সরকারি প্রভাব থেকে মুক্ত; বিদেশী শাসকদের সঙ্গে এই সমাজের কোনো সম্বন্ধ যেমন থাকবে না, তেমনি তার সঙ্গে সংঘর্ষেরও প্রয়োজন দেখা দেবে না। আয়ার্ল্যান্ডের জাতীয়তাবাদীরা ইংরেজ সরকারের পাশাপাশি অনুরূপ সমান্তরাল এক শাসনকাঠামো গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক তেমনি একটি সমান্তরাল পূর্ণাঙ্গ সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন—যার শক্তি ক্রমে ইংরেজ শাসকদের নিঃসহায় ও নিষ্ক্রিয় করে তুলবে। তাতে এই কথা বলা হয় যে কয়েকটি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত এক একটি মণ্ডল তাদের মণ্ডপে বসে গ্রামীণ উন্নয়ন ও হিতকর্ম পরিচালনা করবে। জেলা ও গ্রামীণ পর্যায়ে ক্রমবিন্যস্ত সংস্থাগুলির সর্বশীর্ষে থাকবে প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা। এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর মিল দেখা যায়। পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ দেশব্যাপী পিরামিড-আকারে ফরাসি বিপ্লবের ধাঁচে কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি গঠনের যে প্রস্তাব করেছিলেন তারও লক্ষ্য ছিল সমান্তরাল সরকারি প্রশাসনের মাধ্যমে ঐভাবে বিদেশী শাসনের মূলোচ্ছেদ ঘটানো। কবি কর্তৃক কল্পিত উক্ত সমাজের রূপায়ণকল্পে সদস্যসংগ্রহ ও প্রতিজ্ঞাপত্র রচিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সমান্তরাল সমাজ ও শাসনব্যবস্থা গড়ার পরিকল্পনা দেশবাসী গ্রহণ করে নি। স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাপ গঠনমূলক পথে অগ্রসর না হয়ে জ্বালাময়ী বক্তৃতা, উত্তেজনা ও সন্ত্রাসবাদী বিক্ষোভের রূপ নেয়। রাজনৈতিক ডাকাতি, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে তাঁর সমর্থন ছিল না। তবে ঐপথে

যেতে গিয়ে দেশের জন্যে যেসব যুবক মৃত্যুবরণ করেন তাঁদের দেশভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি।

নৌরজির সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেসের (১৯০৬) পর দেশের জাতীয় আন্দোলনে নরম ও চরমপন্থীদের বিভেদ প্রকট হয়ে উঠলে রবীন্দ্রনাথ দুদলের মিলনসাধনে তৎপর হন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস নিষ্ফল হয়। তোষণনীতির সমর্থন না করলেও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে তিনি দেশবাসীকে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মেনে নেবার আহ্বান জানান। সুরাট কংগ্রেস (১৯০৭) পণ্ড হয়ে যাবার পর প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে তিনি কিছুটা সরে দাঁড়ান। ১৯০৮ সালে পাবনায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে উভয়পক্ষের মিলনসাধনের জন্য রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করা হয়। পাবনা সম্মেলনের ভাষণও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় বহন করে। রাজনৈতিক বিতণ্ডার পরিবর্তে আগামী দিনের গঠনমূলক দেশসেবার নতুন পথের ইঙ্গিত তাঁর সেই ভাষণে পাওয়া যায়। এর পর কবির জীবনে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা দেখা দেয়; সাহিত্যসাধনায় তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে হিন্দুধর্মের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলন অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছিল। এজন্যে দেশের অন্যান্য বিশেষ করে চরমপন্থী রাষ্ট্র-নায়কদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও কিছুটা দায়ী ছিলেন। আন্দোলনের শেষভাগে তাঁর নতুন চেতনা দেখা দেয়। কবি এই সময় থেকে বিশেষভাবে অনুভব করেন যে সংকীর্ণ ধর্মবোধ ও অন্ধ দেশাত্মচিন্তা থেকে মুক্ত বিশ্বমানবতার আদর্শ প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই নতুন চেতনা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসটিতে। রাষ্ট্র সংক্রান্ত সকল বিষয়কেই তিনি নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ভারততীর্থ' 'দীনের সংগীত' 'অপমানিত' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর নব্য-দেশাত্মবোধ ও বিশ্ব-মানবতন্ত্রী মনোভাব দেখা দেয়। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন যে দেশকে অনভিপ্রেত পথে নিয়ে চলেছিল সে সম্পর্কে তিনি স্থিরনিশ্চিত হন। সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়েও তাঁর নতুন চিন্তা দেখা যায়। এ সময়কার একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা পুত্র রথীন্দ্রনাথের বিধবাবিবাহ দেওয়া (১৩১৬ বঙ্গাব্দ)। 'অচলায়তন' (১৯১২) নাটকে কবি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্যদের অনড় সমাজকে ভাঙার ইঙ্গিত করেন। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে এতকাল প্রধানত ঔপনিষদ প্রার্থনারই স্থান ছিল। অতঃপর বৌদ্ধ, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের আলোচনাও অন্তর্ভুক্ত হল। 'শান্তিনিকেতন' (১-৮ খণ্ড, ১৩১৫-১৬ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থের উপদেশমালায় তিনি সনাতন হিন্দুয়ানি বা আদি ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ আধ্যাত্মিক গণ্ডি অতিক্রমের সঙ্গেই পাশ্চাত্ত্যের উগ্র জাতীয়তাবাদের বিপরীতে নিখিল বিশ্বমানবের বাণী প্রচার করলেন।

সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে কবি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদনা

(১৯১১-১৪) ও পল্লীসংগঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। তৃতীয়বার তিনি ইউরোপ পর্যটনে যান। নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তি (১৯১৩) তার পরের ঘটনা। তাঁর সভাপতিত্বে (১৯১৫) গঠিত বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী সমাজোন্নয়নের এক বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রাক্তন বিপ্লবী অতুল সেন ও তাঁর সঙ্গীদের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে গ্রামাঞ্চলে রূপায়ণের প্রয়াসী হন। অতুল সেন অকস্মাৎ গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হয়ে পড়ায় কবির সে-প্রচেষ্টা অসমাপ্ত থেকে যায়।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধ (১৯১৪) শুরু হয়ে যাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন লেখায় তার প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে। 'লড়াইয়ের মূল' প্রবন্ধে তিনি যুদ্ধের কারণ ও পরিণতি বিশ্লেষণ করেন। বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ইউরোপে রোমাঁ রোলাঁ, আঁরি বারবুস, বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখ বিদ্বৎবর্গ বিশ্বের স্বাধীন বিবেকসম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের এক সংঘবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। তাঁরা 'Declaration of Independence of Spirit' নামে একটি প্রচারপত্র কবির স্বাক্ষরের জন্য পাঠান। কবি তাতে সাক্ষর করে নিজেকে সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন।

বিশ্বশান্তি ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্রস্বরূপ 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা (১৯২১) কবির নবজীবনবোধের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। দেশ ও বিদেশের বহু গুণীর সাহায্যে কবির নিখিলমানব চিন্তা যেন মূর্ত হয়ে ওঠে। সেই সময়ে দেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষাব্যবস্থায় লোকে ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসমস্যার উপর 'অসন্তোষের কারণ' 'বিদ্যার যাচাই' 'বিদ্যাসমবায়' নামে তিনটি প্রবন্ধে এক নতুন আলোকপাত করেন।

১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসে অ্যানি বেসান্টকে সভানেত্রী করার প্রস্তাব নিয়ে যখন তুমুল মতবিরোধ দেখা দেয় তখন রবীন্দ্রনাথের মধ্যস্থতায় প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ও বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেমন চরমপন্থীদের সমর্থন করেছিলেন অন্যদিকে তেমনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৈকুণ্ঠনাথ সেনের নাম প্রস্তাব করে নরমপন্থীদের তুষ্ট করেন। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা ঐক্য সাধিত হয়। এই সময় থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে ঐ বছর ১৩ এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি পরিত্যাগের কথা সুবিদিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে উক্ত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে প্রথমদিকে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই অগ্রণী ছিলেন।[২]

১৯২২ সালে শান্তিনিকেতনের অদূরে শ্রীনিকেতনে Rural Reconstruction বা পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। তার প্রথম পরিচালক ছিলেন

লেনার্ড কে. এল্‌মহার্স্ট। ব্যয়নির্বাহের জন্যে আমেরিকা থেকে অর্থ সংগৃহীত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিমন একদিকে যেমন চাইত কোলাহলমুক্ত নিভৃত পরিবেশে শিল্পসাধনায় আত্মসমাহিত হয়ে থাকতে, অপরদিকে একঘেঁয়ে গৃহজীবন থেকে মুক্ত হয়ে দেশ ও বিদেশের মাটি ও মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে। তার মধ্যে অবশ্য বিশ্বভারতীর জন্যে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যও থাকত। বারো বার বিশ্ব পরিক্রমায় একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া বাকি পাঁচটি মহাদেশের অধিকাংশই তিনি সফর করেন। সে-সব দেশের বহু জননেতা ও মনীষীর সংস্পর্শে আসেন, লাভ করেন বিপুল সংবর্ধনা। রাশিয়ায় স্টালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে নি; ইতালিতে মুসোলিনির আতিথ্যগ্রহণ পরে অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর কবি ফ্রান্সে রণাঙ্গন পরিদর্শন করেছিলেন। বিশ্ব-পর্যটনকালে প্রদত্ত বক্তৃতা, চিঠিপত্র ও দিনলিপিগুলি *Religion of Man, Sadhana, Personality, Nationalism*, 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণকালে নানাস্থানে কবি যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন (১৯১৬-১৭) তারই কয়েকটি একত্রে 'ন্যাশান্যালিজম' গ্রন্থে সংকলিত হয়। তার প্রথম রচনাটিতে তিনি পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্বিরোধ তুলে ধরে দেখিয়েছেন, পশ্চিমী সভ্যতায় একদিকে রয়েছে মুক্ত মানসের অবাধ বিকাশ ও জ্ঞানের অভিযান, যার ফলে ইউরোপ সারা বিশ্বের তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে; অন্যদিকে পশ্চিমী সভ্যতা জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে ব্যক্তিকে উৎসর্গ করে নির্বিবেক ক্ষমতালোলুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিঅর্জনে মত্ত হয়ে পড়েছে। কবির মতে জাতীয়তাবাদ একটি মহামারী, যার ক্রমবিস্তারী আক্রমণে মানবসভ্যতা বিপন্ন; পশ্চিমে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ সেখানকারই সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। দ্বিতীয় রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ আত্মঘাতী পশ্চিমী সভ্যতার অনুগামী জাপানে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিমানুষকে চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা দান করে যে-ইউরোপ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছে, সেখানে চলেছে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান, ক্ষমতার লালসায় ন্যায়নীতির বিসর্জন। ইউরোপীয় সভ্যতার অমৃতধারার আস্বাদ না নিয়ে তার হলাহল পানে জাপানকে উদ্যত দেখে রবীন্দ্রনাথ জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সতর্ক করে দেন। তৃতীয় রচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে, পশ্চিমী সভ্যতা একদিকে ভারতের তমসাচ্ছন্ন জড়তা দূর করে মঙ্গলালোকের পথনির্দেশ করেছে; কিন্তু অপরদিকে সৃষ্টি করেছে জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত পরিবেশ। রবীন্দ্রনাথের মতে ভারতের ঐতিহ্য হল বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও মতের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। সহিষ্ণুতার পথ

ত্যাগ করে আত্মঘাতী জাতীয়তাবাদের প্রতি ভারতের আকৃষ্ট হওয়ার অর্থ সংঘাতকে অনিবার্য করা ছাড়া আর কিছু নয়। জাতিবিদ্বেষের পরিবর্তে ভারত সারা বিশ্বকে এমন এক পথ দেখাতে পারে যা ব্যক্তির বিকাশ ও সার্বজনীন ঐক্যের সাধনায় সমগ্র মানব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বজনীন মনোভাব তীব্র নিন্দা ও সমালোচনার বিষয় হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) ভয়াবহ অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষ নেশন-তন্ত্রে সচেতন হয়ে বিশ্বব্যাপী অবক্ষয়ের পথ পরিত্যাগ করবে বলেই তিনি আশা করেছিলেন। ১৯১২ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে তাঁর বিশ্বজনীন আদর্শ প্রচার করেন।

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে নীতিগতভাবে সায় দিতে পারেন নি। লালা লাজপতের সভাপতিত্বে কলকাতা কংগ্রেসে (১৯২০) অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ঐ-নীতি রবীন্দ্রনাথের কাছে নঞর্থকরূপে প্রতিভাত হয়। তিনি বিদেশী পণ্য বয়কটের পরিবর্তে স্বদেশী শিল্পবাণিজ্য ও বিদেশী শিক্ষার পরিবর্তে দেশীয় ঐতিহ্যবহ শিক্ষার প্রবর্তন চেয়েছিলেন। চরকাতত্ত্ব ও অহিংস রাজনীতির ফাঁকাবুলি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। চৌরিচৌরায় (১৯২২) দেশের নামে জনতার উন্মত্ততা ও চৌকিদারদের হত্যাকাণ্ডের পর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ একটি খোলা চিঠিতে তৎকালীন নেতাদের সতর্ক করে বলেছিলেন যে, অহিংসা মন্ত্রের প্রয়োগে বিপদ অনেক; লোকের মনকে প্রস্তুত না করে আন্দোলনে নামানো আর রণপ্রস্তুতির পূর্বে যুদ্ধে সৈন্য পাঠানো একই। ক্রোধকে উত্তেজিত করে অহিংসার মন্ত্রে তাকে বশ করা যায় না। ক্রোধ তার ইন্ধন খোঁজে।[৪]

১৯৩১ সালে হিজলী বন্দীশালায় রাজবন্দীদের উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় বিভিন্ন জনসভায় তিনি সরকারি আচরণের নিন্দা করেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করেন নি বটে, তবে ১৯৩২ সালে গান্ধীর আমরণ অনশন প্রচেষ্টায় তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে গান্ধীকে অনশন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। ১৯৩৫ সালের ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন যে, ইংরেজ যতদিন এদেশকে তাদের মুঠোর মধ্যে রাখতে চাইবে ততদিন তাদের পক্ষে ভারতীয়দের শ্রদ্ধা, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আশা করা অর্থহীন। কথাটা যখন বলেছিলেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হতে বছর চারেক বাকি। চীনের বিরুদ্ধে সেই সময়ে জাপানের অভিযানকেও তিনি নিন্দা করেন।

১৯৩৬ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে ভারত শাসন আইন সংস্কারের বিরুদ্ধে আহূত জনসভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। দেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ, যুক্তিপূর্ণ ও আধুনিক মনের

পরিচয় পাওয়া যায়। 'কালান্তর' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধ ও 'কালের যাত্রা' নাটিকায় তিনি ধর্মমূঢ়তাকে ধিক্কার জানান এবং হিন্দুমুসলমানের সামাজিক বৈষম্যের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর মতে হিন্দুমুসলমানের মিলনের ফাঁকাবুলি আওড়ালে চলবেনা—চাই উভয়ের সর্বাঙ্গীণ সমকক্ষতা। খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগোচিত ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করে গান্ধীপন্থী নেতারা মুসলমানদের দলে ভেড়ানোর যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তাতে রবীন্দ্রনাথের সমর্থন ছিল না। পরিণামে সেই ধর্মচেতনা ধর্মান্ধতায় রূপান্তরিত হয়—দেখা দেয় নানা বিষয়ে সাম্প্রদায়িক মতবিরোধ। ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে জট পাকানোর সমালোচনা করে তিনি 'সমস্যা' ও 'সমাধান' প্রবন্ধ দুটি লেখেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যার পর তিনি লিখেছিলেন—

> ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুটি মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গল প্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়ই ভুল করব। ছাদের পাঁচটা কড়িকে মানব, বাকি তিনটে কড়িকে মানবই না, এটা বিরক্তির কথা হতে পারে, কিন্তু ছাদ-রক্ষার পক্ষে সুবুদ্ধির কথা নয়। আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে, অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই, অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত।[৫]

রবীন্দ্রনাথ ধর্মকে মানতেন, ধর্মতন্ত্রকে নয়। ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সমতাবোধ ও সম্প্রীতির বিষয়ে তাঁর উপর রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। দেশের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকলেও দেশ ও বিদেশের রাজনৈতিক নেতারা আলাপআলোচনা ও পরামর্শের জন্যে কবির কাছে অহরহ যাতায়াত করতেন। ত্রিপুরী অধিবেশনের (১৯৩৯) পর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিক্ষোভ পরিচালনা ও দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সুভাষচন্দ্রের উপর যে শাস্তিবিধান হয় তা প্রত্যাহার করে নেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। গান্ধী জানান যে, তা সম্ভব নয়। তৎকালীন কংগ্রেসের কর্মধারা সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তীকে কবি এক পত্রে লিখেছিলেন—

> কংগ্রেসনামধারী যে প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে আন্দোলন জাগিয়েছিল তার কথা তো জানা আছে। তার আন্দোলন ছিল বাইরের দিকে। দেশের জনগণের অন্তরের দিকে সে তাকায় নি, তাকে জাগায় নি ; স্বদেশের পরিত্রাণের জন্যে সে করুণ দৃষ্টিতে পথ তাকিয়ে ছিল বাইরেকার উপরওয়ালার দিকে··· কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। যাঁরা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্ট ভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময় তাঁদের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে, বিচারবুদ্ধি সোজা পথে চলে নি। পরস্পরের প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য—যে বৈধতা রক্ষা করলে যথার্থভাবে কংগ্রেসের বল ও সম্মান রক্ষা হত তার ব্যভিচার ঘটতে

দেখা গেছে ; এই ব্যবহারবিকৃতির মূলে আছে শক্তিস্পর্ধার প্রভাব।*

এরপর রাজনৈতিক দলাদলি ও সংঘর্ষে বঙ্গদেশের দ্রুত অবনতি দেখে রবীন্দ্রনাথ ব্যথা প্রকাশ করেন। একদিকে দেশে দলাদলি, রেষারেষি, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির প্রাবল্য, ওদিকে দেশের বাইরে বিশ্বমহাযুদ্ধ লেগে গেছে। রবীন্দ্রনাথ মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হবার জন্যে এক তারবার্তা পাঠান। রাজনীতি ও স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ লেখা হল (৫ জুন, ১৯৪১) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যা শ্রীমতী রাথবোনের ভারতীয় নেতাদের বিশেষ করে জওহরলাল সম্পর্কে লিখিত এক প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। অধিকাংশ দেশনেতা ও জওহরলাল তখন কারারুদ্ধ ছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের মনে বিশেষ ব্যথা লাগে।

জীবনের শেষ জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সারা বিশ্বে প্রসার্যমান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মানব সংস্কৃতির চরম বিনাশের আশঙ্কা প্রকাশ করেন এবং সমগ্র মানবসমাজকে শোনান তাঁর শেষ সাবধানবাণী।

দ র্শ ন চি ন্তা

রবীন্দ্রদর্শনে মানবসভ্যতার দুটি বিরাট ঐতিহ্যের মিলন দেখা যায়। একটি হচ্ছে ভারতের ঔপনিষদ ঐতিহ্য—যার প্রভাবে প্রাচীন মুনিঋষিদের মতো তিনিও মনে করতেন যে, বিশ্বচরাচর বিশেষ এক কল্যাণকর সত্তার অভিব্যক্তি—সর্ববিধ বিষয়ের পিছনে এমন এক চৈতন্যময় পুরুষ বিরাজ করেন যিনি বহু ও বিচিত্র সবকিছুকে সদাই সামঞ্জস্যময় ও সংগতিপূর্ণ করে তোলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে পাশ্চাত্যের রেনেসাঁসধর্মী মানবতন্ত্রী ঐতিহ্য—যার মুখ্য উপাদান যে স্বয়ং মানুষ তা ঐকথাটিতেই সুপরিস্ফুট। প্রোটাগোরাসের "মানুষ সবকিছুর মাপকাঠি" কিংবা কোনো এক চণ্ডীদাসের "সবার উপর মানুষ সত্য"—মানবতন্ত্রের মূলকথা। মানবতন্ত্রে বুদ্ধির চর্চা ও মুক্তির সাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। মানবতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মানুষ কেবল সবকিছুর মাপকাঠি নয়, মানুষই মনুষ্যত্বের একমাত্র উৎস; মানুষের সবকিছু অর্থাৎ তার উৎপত্তি, অবস্থান ও পরিণতির পশ্চাতে কল্পিত কোনো শক্তি বা সত্তা নেই। তা বলে এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নয় যে মানবতন্ত্রের পূর্বসূরীরা সবাই নাস্তিক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরে আসক্তি ও ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হন নি। সেই-সঙ্গে অবশ্য একথাও মানতে হবে যে তাঁদের চিন্তাভাবনা মূলত পার্থিব বিষয়েই আবদ্ধ থাকত এবং তাঁদের চেতনা ও কর্মতৎপরতা যতই দৃঢ় ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ততই তাঁদের মধ্যে মঠমন্দির ও চার্চের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এমনি একজন আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী।

পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত একেশ্বরবাদী চিন্তায় তিনি সর্বেশ্বরবাদী ব্যঞ্জনা প্রদান করেছিলেন। একেশ্বরের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা হেতু তাঁকে জগতের সংস্পর্শ থেকে পৃথকরূপে কল্পনা করা হয়। সর্বেশ্বরবাদীর দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্রষ্টা অভিন্ন ও এক ; সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টা বিরাজ করেন। বিরাজমান সবকিছুই পরব্রহ্মের অন্তর্গত—জন্মমৃত্যু সেই ব্রহ্মেই ঘটে থাকে—সমগ্র কালাকাশ ব্রহ্মেরই অঙ্গ। তাঁর কথায়—

দেবতা দূরে নাই, গির্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, মিলন-বিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীব সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোন কালে নূতন নহে, কোন কালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্তমান অথচ ইহার মহৎ ঐক্য ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্য সত্য প্রকাশ পাইতেছেন।[৭]

পরম সত্তা মানুষের মধ্যেই সর্বাপেক্ষা অধিক বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানুষের কাছে সেই পরম সত্তার শ্রেষ্ঠ রূপ হল বিশ্বমানবের রূপ। নিখিল মানবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মা সবচেয়ে নিকট। বিশ্বমানবরূপী দেবতার সেবা এবং কর্মক্ষেত্রেই মানুষ পরমাত্মার মিলন ও উপাসনার সুযোগ পায়। সকল কাজের লক্ষ্য বৈশ্বিক কল্যাণ—সেই নীতিনির্দিষ্ট কর্ম এবং সেই পথেই একদিকে বৈশ্বিক মঙ্গল সাধন ও অন্যদিকে পরম সত্তার উপাসনা বাঞ্ছনীয়। রবীন্দ্রদর্শনে পরম সত্তার সর্বব্যাপিত্ব যেমন স্বীকৃত, তেমনি প্রেমের পাত্ররূপে ঈশ্বরের বিশ্বনিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যও স্বীকৃত। এখানে তাই একটা দ্বৈতভাব লক্ষণীয়। সর্বব্যাপী ঈশ্বর দুভাবে প্রকাশমান—একদিকে ব্যক্তিমানুষ, অন্যদিকে সমগ্র বিশ্ব। ব্যক্তি ও বিশ্বকে নিয়ে পরম সত্তার লীলা—তারই মাঝে রূপ রস গন্ধ ও বৈচিত্র্যেভরা এই জগৎপ্রবাহ। যে-শক্তি বিশ্বলীলার কারণ তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি দেশ ও কাল, জীব ও জড়কে পরিব্যাপ্ত করে আছেন। বৈচিত্র্যময়, বহুর মধ্যে সেই একই সত্তা বিরাজ করেন। বাহ্যত যিনি লীলাময়, অন্তরে তিনি প্রাণের মানুষ। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শ্রীচৈতন্যের আদর্শ অনুসরণ করেছেন। উভয়েই প্রেমের বন্ধনে পরম সত্তাকে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাই শংকরের মায়াবাদী অবিমিশ্র অদ্বয় দৃষ্টিভঙ্গি উভয়েই গ্রহণ করেন নি।[৮]

বিশ্ব বহু বিশিষ্ট বস্তুর উপাদানে গঠিত নয়, বিশ্ব একই বিরাট সত্তার বিচিত্র প্রকাশ এবং সেই একক সত্তা ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট ; আবার ব্যক্তিমানুষ থেকে স্বতন্ত্র বিশ্বও ব্যক্তিত্বমণ্ডিত। সত্তায় এরূপ ব্যক্তিত্বের প্রত্যয় তাঁর চিন্তার একটি অভিনবত্ব। পারমার্থিক সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানমার্গ

অপেক্ষা প্রেমধর্মী অনুভূতিমার্গের অধিক অনুরাগী ছিলেন।[৯] প্রজ্ঞার অতীত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির দ্বারা পরমের উপলব্ধি সম্ভব। তাঁর কাছে পরম সত্তা নিরাকার, নির্বর্ণ ও নিগূঢ় বিষয়, যা কেবল প্রেমেরই আধার। চূড়ান্ত সত্যরূপে তিনি মানুষ ও তার মনকেই দেখেছেন—শুধু নিয়মনিগড় ও নৈর্ব্যক্তিক সত্তাই নয়। তাই তাঁর দর্শনে একেশ্বরবাদের সঙ্গেই সর্বব্যাপী সর্বেশ্বরবাদের যুগপৎ অবস্থান দেখা যায়। শাশ্বত পরম সত্তার অনন্ত সৃজনীশৈলীর প্রকাশ এবং সত্য ও সুন্দরের অভিব্যক্তিরূপেই তিনি ইতিহাস ও প্রকৃতিকে দেখেছেন। কবির দৃষ্টিতে অতীন্দ্রিয় পরম সত্তার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সৃজনপ্রক্রিয়ার সম্পর্ক অচ্ছেদ্য।[১০]

রবীন্দ্রনাথের দিব্যপ্রেম ধরাছোঁয়ার অতীত নয়: তিনি সর্বব্যাপী প্রেমময়তার জয়গান করেছেন এবং বিশ্বজনকে সেই প্রেমসাগরে অবগাহনের আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেম ও প্রজ্ঞার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। প্রেমই বরং জ্ঞান ও চেতনার পরিণতি। প্রেমের দ্বারাই সর্বজ্ঞ পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায়। দান্তের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে দুনিয়ার যত পাপ ও পঙ্কিলতার কারণ হল এই দিব্য প্রেমানুভূতির অভাব। আত্মার সকল জ্বালা-যন্ত্রণার নিরসন ঘটে প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে। প্রেমেই মুক্তি।

বিশ্বহৃদয়চ্যুত আত্মাভিমানেই অশুভের উদ্ভব হয়। তাই তিনি মানুষকে দর্প, দ্বেষ, লোভ ও রোষমুক্ত হয়ে সর্বব্যাপী দিব্য প্রেমের ধারায় মগ্ন হতে বলেন। সেইসঙ্গে একথাও বলেছেন যে জ্বালাযন্ত্রণা, পাপ ও তাপের উৎপত্তিও ঐশ ক্রিয়াকানুনে ঘটে। মানবাত্মাকে পবিত্রীকরণের প্রক্রিয়াস্বরূপ সেগুলি বিধিরই বিধান। এখানে রবীন্দ্রচিন্তায় কিছুটা যেন খ্রীষ্টীয় প্রভাব দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র এবং জগতের সঙ্গে মানবজীবনেব বাঁধন অচ্ছেদ্য। সেই কারণেই জাগতিক বিধিব্যবস্থার লঙ্ঘন ক্ষতিকর। বৃক্ষলতার মর্মরধ্বনি, নদীর নিরন্তর প্রবাহ, আকাশভরা সূর্যতারা, নিদাঘের দ্বিপ্রহর বিধাতারই অস্তিত্ব ঘোষণা করে। নিয়মনির্দেশের নিগড়ে বাঁধা প্রকৃতির অন্তরালে দিব্য ইচ্ছাই ক্রিয়াশীল থাকে। কালাকাশ ক্রমাগতি বা তাপগতিবিজ্ঞানও যেন নিরন্তর সৃজনশীল শাশ্বত সত্তার নিয়মনির্দিষ্ট সমন্বয় ও মৌল জাগতিক ঐক্যের সুরে সুর মেলাচ্ছে। জগতের যা কিছু বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য তা বিধাতার অসীম সৃজনময় প্রাচুর্যের পরিচয় বহন করে চলেছে। সৃষ্টিই পরম সত্তার নিরন্তর অভিব্যক্তি। সূর্যচন্দ্র, নদীপর্বত, ঝড়বাদলা সবই ঐশ আনন্দের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি নিছক জড় ও শক্তির যান্ত্রিক একটা যোগফল নয়।

বিশ্বের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় রহস্যের উদঘাটন একা বিজ্ঞানের কাজ নয়। জগৎ একটা আত্মাবিশেষ—শাশ্বত সর্বব্যাপী ঐকতানে তা সদাই মুখরিত—তারই মধ্যে পরম সত্তা বিরাজমান। জগৎচরাচরের গভীরে অবস্থান-কল্পনা

সভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতের একটি অনন্য অবদান বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন। সকল বস্তুতে আত্মার এই অবস্থান প্রত্যয় তাঁকে ঔপনিষদ চিন্তা থেকে আধুনিক জড়বিজ্ঞানের প্রভাবে নিয়ে গেছে। প্রকৃতিকে তিনি জীবনসঙ্গী করেছিলেন—তাই বৃক্ষের মর্মরস্বর, নদীর কলতান, পাহাড়ের গুঞ্জনধ্বনি ও বিহঙ্গের সঙ্গীত তাঁর মনে স্পন্দন জাগাত। রবীন্দ্রচিন্তায় প্রকৃতির এই অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য তাঁকে অনুপম বৈশিষ্ট্য দান করেছে।[১১]

বৈসাদৃশ্য, বিশৃঙ্খলা ও শ্রীহীনতার বিরুদ্ধে তাঁর কবিমন বিদ্রোহ করে। সমন্বয়ই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। তিনি চাইতেন এক দিব্য ঐকতান—সমন্বয়কারী পরম সত্তার উপলব্ধিতে পরস্পরবিরোধী দ্বন্দ্ববিধুর মানবশক্তির মিলন। সৃজনশীল অতিমানসের অনুধ্যায়ী দৃষ্টিতেই প্রতিভাত হয় বিশ্ব-চরাচরের অর্থপূর্ণ, আনন্দময়, সুসদৃশ নিগূঢ়তা। গুণগত বিচারে শিল্পীর দৃষ্টি নৈয়ায়িক বিজ্ঞানীর দৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব প্রত্যয়ের মূলে এই ঐকতানের সুর ঝঙ্কৃত—সেই সুরই তিনি শুনিয়েছেন আজীবনকাল। বিধাতার বিশ্বাতীত স্বর্গপুরের সঙ্গে মানুষের ধরাছোঁয়ার এই মর্ত্যলোকের মধ্যেও তিনি সমন্বয় উপলব্ধি করতেন। বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তর্লোকের সর্বত্র বিরাজমান ও প্রকাশমান পরম সত্তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়; বাহিরের ও অন্তরের মিলনদৃশ্য ছিল তাঁর কাছে পরম শ্রেয় বিষয়। প্রকৃতিকে নির্দয়ভাবে খর্ব করার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি চাইতেন মানুষের সৃজনশীলতার অনাবিল সুখের সঙ্গে পার্থিব জগতের সাযুজ্য সাধন। শাশ্বত অতিমানস একদিকে প্রকৃতি ও অন্যদিকে মনুষ্যচেতনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশমান; দিব্যমিলনের পথনির্দেশ প্রকৃতিই দিতে পারে।[১২]

মার্কসবাদী শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সমন্বয়কারী চিন্তার প্রভেদ সুপরিস্ফুট। ইতিহাসের বিচারবিশ্লেষণে তিনি সংঘাত, বিরোধ ও অস্তিত্বের সংগ্রাম প্রত্যয়ে বিশ্বাসী ছিলেন না। সামাজিক মূল্যায়নে তিনি মানবিক হৃদয়বত্তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন; কল্পনা করেছেন সমুদয় সমাজ ও গোষ্ঠীর স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ সুসংবদ্ধতা এবং নগর ও গ্রামের সমবায়ী সম্পর্ক। বর্তমান সমাজ-সংঘর্ষ ও নিরন্তর জয়াভিযানের পরিবর্তে চাই শান্তি, মৈত্রী, সম্প্রীতিমূলক সমন্বয় তথা আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্য। সমন্বয়ের পথেই জড়তা, নৈরাশ্য, ভগ্নমনোবল ও সংশয়ের অবসান ঘটে। সমন্বয়ের পথেই পাওয়া যায় শুভ, সুন্দর, সুসদৃশ এই পৃথিবীকে, যেখানে সকল দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অস্তিত্ব অবর্তমান। তাঁর মতে নিছক বাস্তবেই সত্য বর্তায় না—বাস্তবের সুষম সামঞ্জস্যেই সত্য বিরাজ করে। প্রেম ও সুন্দরই হল সমন্বয়ের একমাত্র রূপ।[১৩]

মানুষের সদাচার বিশ্বব্যাপী মহাজাগতিক নিয়মনীতির অঙ্গ বলে তিনি মনে করতেন; জীব ও জগতের প্রতি হানিকর যে-কোনো আচরণ মঙ্গলময়

দিব্যবিধানের পরিপন্থী : সাম্রাজ্যবাদ, স্বেচ্ছাতন্ত্র, অত্যাচার, উৎপীড়ন নির্দয়তা প্রভৃতি অনাচারের ক্ষতিপূরণ মানুষকে একদিন করতে হবে—সেটাই বিধির অমোঘ বিধান ; দর্প, ঔদ্ধত্য ও লালসার শাস্তি অনিবার্য'।[১৪]

মা ন ব তা বা দ

ইতিহাসে মানবতন্ত্রী চিন্তার যে-দুটি ধারার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি আধ্যাত্মিক এবং অপরটি বস্তুবাদী। মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথের মানবতন্ত্র শেষোক্ত পর্যায়ের। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী সঙ্গীতের সুর ছিল আধ্যাত্মিক। মধ্যযুগের রেনেসাঁসধর্মী মানবতন্ত্রীদের মতো তিনি মানুষকে দিব্যদৃষ্টিতে বিচার করেছেন ; যেখানে ব্যক্তিমানুষ সৃজনশীল পরমসত্তার প্রতিবিম্বমাত্র ; মানুষই ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক ; মানবদেহ ঈশ্বরের সৃজনশীল পরীক্ষা-নিরীক্ষার আধার ; বিধাতা তাঁর নিরন্তর সৃষ্টিকর্মকে বাহ্য জগৎ ও মানুষের মধ্যে দিয়ে মুক্তি দেন।[১৫] চিরন্তনের পরিপ্রেক্ষিতকায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের মূল্যায়ন করেন ; ব্যক্তিত্বের অন্তরে অন্তর্যামী পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত। গুণগত বিচারে বহির্লোক অপেক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মাই অসীমের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ; সীমার মধ্যেই অসীমের বিচিত্র রূপ বিধৃত। কবি মানুষের আত্মিক শক্তির উন্মেষ ও মুক্তি চাইতেন ; তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে আত্মাকে দেশ ও বিদেশের রাষ্ট্রশক্তি অবিরাম অবদমিত করে চলেছে, নানারূপে শক্তিমত্ত সংস্থা নিষ্পেষণ করছে। শুভ ও সুন্দরের উপলব্ধি আত্মাকে মুক্তি দিতে পারে। ব্যক্তিত্ব প্রত্যয়ের সম্যক ধারণা ও চেতনাই মানুষকে তার নিত্যদহনকারী আইন ও শৃঙ্খলার বিভ্রান্তি এবং সামাজিক অনাচার ও অবক্ষয় থেকে অব্যাহতির নিশানা জানায়। জাতি, ধর্ম. ভাষাগত দৈনন্দিন মনোমালিন্য ও সংঘাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ হল মানবতন্ত্রী মনোভাব। মানুষের ভিতরে অনাবিষ্কৃত বহু গুণ ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে—পারস্পরিক বিরোধ ও সংঘর্ষে সেগুলি নিষ্ফল হয়, অনাঘ্রাত কুসুমের মতো।[১৬]

ব্যবহারিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ মানবিক মূল্যবত্তা নিরূপণ করেছেন ; তাঁর 'মানব' প্রত্যয় ও শ্রীঅরবিন্দের 'অতিমানব' এক নয়। অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক সমন্বয়ের মধ্যে তিনি প্রেম, শান্তি ও ঐক্যের সন্ধান করেন। পক্ষান্তরে শ্রীঅরবিন্দ মানুষের বিশ্বাতীত ও দিব্য মূল্যবোধ অর্জনে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কবির মানবতন্ত্র ধরাছোঁয়ার অতীত নয়, অসীম সত্তা নিরন্তর সৃজনশীল এবং সেই সত্তা মানুষের মধ্যে সীমারূপে বর্তমান অসীমকে নিজ কর্মশক্তি ও সৃজনীসত্তা দ্বারা প্রকাশ করা ব্যক্তিমানুষের কাজ।

আধ্যাত্মিক সত্তার স্পন্দন ও গতির মধ্যেই জগতের যাবতীয় শুভ ও সুন্দরের জন্ম। সৃজনপ্রক্রিয়ায় নিহিত পরম সত্তা শিল্পসাহিত্যে পরিণতি লাভ করে; সেই রসাস্বাদেই মানুষের তৃপ্তি ও সার্থকতা।[১৭]

সত্তার আদিতত্ত্ব বিশ্লেষণকল্পে নিখাদ দার্শনিক বাদবিতণ্ডায় তাঁর বিশেষ রুচি ছিল না; সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরের মহানুভবতা উপলব্ধি করানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাঁর মতে নিরুত্তাপ নৈয়ায়িক যুক্তিতর্কের কুজ্‌ঝটিকায় প্রবেশবিমুখ ঈশ্বর নিরভিমান সাধারণ মানুষের হৃদয়েই প্রবেশ করেন; অতি সাধারণ জীবিকাকর্মেও সৃষ্টিশক্তিধরের প্রাণোচ্ছ্বাস দেখা যায়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম থেকে শিল্পকলার সাধনা অবধি যাবতীয় কাজ ঈশ্বরোপাসনার মতো পবিত্র। তাঁর কাছে কি রাজপ্রাসাদ কি পর্ণকুটির সবই সমান। ঈশ্বরের আরাধনা মন্দির, মসজিদ, গির্জায় সীমিত রাখা অর্থহীন; ক্ষেতখামার ও কলকারখানার কাজও তাঁর উপাসনাবিশেষ।[১৮]

ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি মানুষকে উচ্চস্তরে উন্নীত করে; সৃজনশীল আত্মোৎকর্ষই অসীম পরম সত্তার প্রকাশ। মানুষ বহুবিধ গুণ ও শক্তির আধার; তার সহজাত প্রকৃতি হল অন্তর্নিহিত দিব্য সৃজনসত্তার বিকাশ সাধন। মানুষের অনুভূতি পবিত্র ও মহান—রাষ্ট্রশক্তির সেখানে কোনো অধিকার নেই; রাজা ও রাজশক্তির নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিভূ বলে দাবি করাটা সঙ্গত নয়।

কবির সত্যের প্রত্যয় ছিল মানবতন্ত্রী; সত্যপ্রিয়তা মানুষের একটি সহজাত গুণ। সেই দৃষ্টিতে তিনি বিবেকের নির্মলতা কামনা করতেন, বিবেকই ন্যায়পরায়ণতার উৎস আর নীতিবোধ স্বজ্ঞায় (Intuition) নির্ভরশীল। এবিষয়ে বস্তুবাদী মানবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে সহজাত যুক্তিপ্রবণতা থেকে মানুষ নীতিনিষ্ঠ হয়। লোকাচার বা শাস্ত্রীয় অনুশাসন নৈতিক আদর্শের একমাত্র উৎস যে নয় সেকথা রবীন্দ্রনাথও মনে করতেন।[১৯]

ভারতীয় জনমনে আবহমানকাল যাবৎ বৈরাগ্য ও জীবনবিমুখিতার যে-ধারা বয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করেন নি। মানুষের সহজাত শুভ ও সুন্দর প্রবণতাগুলিকে অনুশাসনের নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন করার তিনি বিরোধী ছিলেন; মানুষের সর্বাঙ্গীণ ও পরিপূর্ণ বিকাশই ছিল তাঁর কাম্য। পাহাড়ের গুহায় অথবা অরণ্যের গভীরে গিয়ে ভগবৎ মহিমা অন্বেষণের কোনো প্রয়োজন নেই; হাসিকান্না ও আশানিরাশার মধ্যেই তিনি জীবনকে গ্রহণ করেন। সমাজ-সংসার ছেড়ে নিভৃতস্থানে পরমার্থের সাধনায় তাঁর আস্থা ছিল না। ত্যাগ ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন স্বাভাবিক জীবনের অন্তরায়। ভগবান মঠমন্দিরে যেমন বিরাজ করেন, তেমনি ভগ্নগৃহেও অবস্থান করেন।[২০]

কবির দৃষ্টিতে পারস্পরিক সংযোগ ও বিনিময়েই সমাজের সার্থকতা নির্ভর করে। তাই দরকার সংবেদনশীল, অনুভূতিপ্রবণ মনোভাব। অবহেলিত ও অসহায় মানুষের প্রতি দরদ ও সাহচর্য মানবতন্ত্রী নীতির অন্যতম

মূলকথা। মানুষের প্রতি ভালবাসা ও ইহমুখী কর্মের মাধ্যমেই অসীম পরমার্থকে পাওয়া যায়। মানবতন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ জলটুঙ্গির ঘরে বসে, পারিপার্শ্বিক থেকে মুখ ফিরিয়ে, দুঃখী প্রতিবেশীর প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন করেন নি।

ই তি হা স চি ন্তা

ইতিহাসকে কবি প্রচলিত ধারণা থেকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেছেন, সে-দৃষ্টিতে ইতিহাস নিছক রাজারাজড়ার যুদ্ধবিগ্রহ ও বিজয়-অভিযান অথবা রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের উত্থানপতন নয়। তাঁর মতে ব্যক্তিমানুষের মুক্তির আবেগ ও নিরন্তর সৃষ্টির প্রয়াস তথা জীবন ও মননের পরিপূর্তির সঙ্গে মানুষে-মানুষে ঐক্য ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে যাবতীয় নৈসর্গিক বাধাবিপত্তির লঙ্ঘন ও গতিশীলতাই ইতিহাস ও মানবসভ্যতার লক্ষণ।[২১]

মানুষকে নিয়েই ইতিহাস রচিত—সে-ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত এক একটি খণ্ডচিত্র। ইতিহাস হল আত্মোপলব্ধিকল্পে অজানা যাত্রাপথে মানুষের পদচারণা। রাষ্ট্রের উত্থানপতন, ধনৈশ্বর্য আহরণ ও তার নির্বিবেক অপচয়, স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু গড়া ও ভাঙার খেলা, সৃষ্টির রহস্যালোক উদ্ঘাটনের নানাপথ আবিষ্কার, নতুনের নেশায় বহুশ্রমলব্ধ পুরাতনের পরিহার প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে মানুষ যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলেছে —নিজের উপলব্ধি ও পরিপূর্তির তাগিদে, যাবতীয় সঞ্চয় ও চিন্তাভাবনার মূলে থাকে আত্মার ক্ষুধা—তাই সে সকল বাধাবিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে—অনন্ত যাত্রাপথে মানুষের ভুলভ্রান্তি ও জ্বালাযন্ত্রণা পর্বতপ্রমাণ—প্রসববেদনার মতোই তা দুঃসহ; পরিবর্তে মানুষ যে পরিপূর্তি লাভ করে তার প্রয়োজন ও সম্ভাবনা অপরিমেয়। অন্তরাত্মার এই তৃপ্তি ও পূর্তির তাগিদ না থাকলে মানুষের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াকলাপ অর্থহীন ও অসহ্য প্রতিপন্ন হত। ইতিহাসে মানুষ পুরুষানুক্রমে সত্যের সন্ধানপথে চেতনার ক্রমবিস্তৃতি সাধন করেছে এবং উচ্চতর পর্যায়ে সর্বাত্মক ঐক্য ও মহাসত্যের নিকটতম হয়েছে।[২২]

স্থান ও কালের পশ্চাৎপটে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গরূপে দেখেছেন, যার মর্ম হল বহু বিচিত্রের মিলন। নানা দেশ ও কালের ইতিবৃত্ত বিচিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। তাই ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি অতীতের পটভূমিকায় মানবসভ্যতার বিচার, বর্তমানের পর্যালোচনা এবং অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে মানবাত্মার উন্নয়নকামী বিবর্তনের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন যে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় জীবাত্মা একের পর এক জড়প্রকৃতির

নানা বিঘ্ন অতিক্রম করে নতুন বিঘ্নের সম্মুখীন হয়েছে। সেই বিঘ্নগুলি কর্মকুশলতার ফলে যথারীতি অতিক্রান্ত হয়েছে, বলপ্রয়োগের প্রয়োজন ঘটে নি। প্রকৃতির নিয়মনির্দিষ্ট গতিপথে জীবাত্মার গঠন ও বিকাশ রহস্যাবৃত। অস্তিত্বের সংগ্রামে জয়ী হয়ে জীবাত্মা ক্রমে মানুষের মধ্যে চরিতার্থ হয়েছে মননের উদ্ভবে। মানবজীবনে মননের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। জীবন ও মননের প্রকৃতি এক নয়। পশুরও সীমিত মানসিক ক্রিয়া থাকে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মননশীলতা নিরঙ্কুশ বিকাশের সুযোগ পায়—সেখানে তা সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তির আবেগ ও শক্তি সঞ্চার করে। জৈব বিবর্তন ধারায় উৎপন্ন মননশীল মানুষের মধ্যে স্থান ও কালাতীত এক চিরন্তন মূল্যবত্তা আছে যার উপলব্ধি অধুনাকালে সদাই ব্যাহত হচ্ছে।[২৩]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় হারবার্ট স্পেনসার (১৮২০-১৯০৩), টমাস হেনরি হাক্সলি (১৮২৫-৯৫) ও অঁরি বের্গসঁ (১৮৫৯-১৯৪১)-র প্রভাব লক্ষিত হয়। স্পেনসার জাগতিক সবকিছুকে তাঁর অভিব্যক্তিবাদের (evolution) প্রত্যয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের চিন্তাধারাকে তিনি প্রচলিত আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত করেন। কবি সেই অভিব্যক্তিবাদকে সাহিত্যতত্ত্বে প্রয়োগ করেছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) গীতিনাট্যের প্রেরণা সেই আদর্শেই তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু স্পেনসারের অজ্ঞাবাদী আদর্শ গ্রহণ করেন নি। ইতিহাসের বিবর্তনকে তিনি বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার সার্থকতা ও অমোঘ শক্তির লীলারূপে দেখেছেন। হাক্সলির বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিও কবির রচনায় প্রতিফলিত হয়। বের্গসঁ-র সৃজনশীল বিবর্তনবাদ (Creative Evolution) কবিমানসে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে। বের্গসঁ-র মতে জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল ; সবেরই রূপান্তর ঘটে ও ঘটবে ; তাকে তিনি becoming বা হওয়া বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুর অন্তরালেও গতি ছাড়া আর কিছু নেই। অনাদি অনন্ত ধারায় পরম শক্তিস্বরূপ এই গতি চিরন্তন। চলার পথে বাধাপ্রাপ্ত সে শক্তির বিপরীত গতি হল বস্তু। বস্তু গতিরই এক অবস্থান। বস্তুর গতিধারা খণ্ডরূপে মানুষের দৃষ্টিতে প্রতীয়মান হয়। অতীত ও ভবিষ্যতের মাঝে বর্তমান ক্ষণিকের এক কালবিন্দু। রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁ-র গতিবাদকে আপনার স্বভাবসুলভ কবিদৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন। অবশ্য তত্ত্বগতভাবে নয়। 'রূপ ও অরূপ' প্রবন্ধে কবি বলেছেন যে যা অনন্ত সত্য ও স্থিতি তা অনন্ত গতির মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কবি আস্থাবান ছিলেন। ভবিষ্যতের পথ যতই সংকটময় হোক না কেন মানুষ নিজ শক্তিবলে তার সঠিক লক্ষ্যপথ রচনা করে। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, মানুষের মধ্যে মননশীল শক্তির প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতি পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমগ্র মানবসমাজের

কল্যাণে সেই শক্তির ব্যবহারে যথোচিত তৎপর নয়। এটিকে তিনি মানবসভ্যতার কাছে এক মস্ত চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেছেন। সেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার জন্যে তিনি ভারতীয় চিন্তার শাশ্বত ধারার অনুধ্যানে বিশ্বাসী ছিলেন।

ভারতীয় ইতিহাসকে তিনি ভাবের ইতিহাস বলে মনে করতেন। নানা সংঘর্ষ ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে ভারতীয় ভাব ও ঐতিহ্য নানা জাতির সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে পরিপুষ্ট হয়েছে এবং রচনা করেছে সমন্বয়ের পথ। অন্য দেশকে অনুকরণ না করে ভারতের নিজস্ব ভাবেতিহাসের ধারা অনুসরণ করার জন্যে তিনি দেশবাসীকে আহ্বান জানান।[১৪]

তাঁর মতে মানুষের মধ্যে প্রেমই সভ্যতার মাপকাঠি—ধনৈশ্বর্য নয়। তিনি যে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখতেন তা বিশ্বের সকল জাতি ও ধর্মের নিষ্কর্ষে গঠিত এক বিশ্বজনীন মানবতন্ত্রী সংস্কৃতিরূপে কল্পিত। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন ও বৈজ্ঞানিক বিজয়ে পশ্চিমী সভ্যতার অবদান ও প্রচেষ্টাকে তিনি অস্বীকার করেন নি। মন তাঁর প্রকৃতই উদার ও গুণগ্রাহী ছিল। তাই পশ্চিমী সভ্যতায় বিভিন্ন জাতির সমবায়ে রচিত যুক্তিবাদ মানবতাবাদ ও জ্ঞানের আশিসে লব্ধ সৃষ্টিশক্তির মুক্তি তথা সংস্কৃতির বিকাশ তাঁকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা তাঁর ঐ সভ্যতার প্রতি অনুরাগ ভেঙে দেয়। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ প্রসার ও উৎপীড়ন তাঁর কবিমনে তীব্র আঘাত হানে। জীবনের অন্তিমকালে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সেকথাই যেন ব্যক্ত করেছেন।

প্রতীচ্যের হাতে প্রাচ্যের অবদমন ও লাঞ্ছনা এবং বিজিতদের হীনবীর্য ও হতবুদ্ধি করে তোলার ফলে সমন্বয়ধর্মী মনুষ্যত্বেরই অবমাননা ঘটে। গভীর বেদনায় তিনি প্রাচ্যের মুনিঋষিদের প্রদর্শিত শান্তি মুক্তি ও আলোর পথকেই বেছে নেন। উপলব্ধি করেন যে প্রেম প্রীতি শুভ সুন্দর সত্য ও ঐক্যের কথা একমাত্র ভারতই শোনাতে পারে। অনুভব করেন যে আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলিকে ক্রমান্বয়ে পদানত করে রাখার ফলে একদিন ইউরোপের বিনাশ ঘটবে। তাঁর মতে প্রাচ্যই মুক্ত আকাশের সন্ধান দিতে পারে যেখানে প্রতীচ্য সুখে তার পাখা মেলবে। তাই উভয়ের চাই ঐক্য ও সমন্বয়।[১৫] এখানে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বিশেষ মিল দেখা যায়।

কবির দৃষ্টিতে সামাজিক সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই ভারতের সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে; সমাজজীবনে রাজনীতির প্রাধান্য ছিল না। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে বৃহত্তর সামাজিক প্রশ্নগুলিই ছিল বড়। এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যায় প্রাচীন গ্রীক সভ্যতায়; সেখানে এক একটা রাজ্য প্রাচীরবেষ্টিত সংকীর্ণ পরিবেশে গড়ে ওঠে, রাজশক্তির দাপটই ছিল বেশি। অপরদিকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহুর সমন্বয়ে বা বিবিধ ধারার সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে। আর্যরা এদেশের মাটিতে ধর্ম ও কাব্যের বীজ বপন করে। দ্রাবিড়রা তাতে ভাব ও

আবেগের বারি সিঞ্চন করে। বৌদ্ধরা নৈতিক আদর্শে ভারতীয় জীবনতরুকে মহামহীরুহে পরিণত করে। এমনিভাবে ভারতের মাটিতে আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে। ভারতভূমিতে অতিমানসের অভিব্যক্তিস্বরূপ এই সমন্বয়ের সাধনাই প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে—বিবিধের মাঝে মহান মিলনের সাক্ষ্য বহন করে।[২৩]

রা ষ্ট্র দ র্শ ন

রবীন্দ্রনাথ মানুষকে কল্পনাপ্রবণ, ভাবুক ও সামাজিক জীব হিসাবে দেখেছেন। সমাজেরই একটি আংশিক ও পেশাগত বিষয় হল রাজনীতি। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজকেই তিনি অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন এবং আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় সমাজকে জৈব (organic) প্রত্যয়ে বিচার করেছেন। মানুষের দুটি প্রবণতা তাঁর চোখে ছিল বড়; একটি আত্মতৃপ্তি এবং অপরটি আত্মোন্নতি। মানুষ বিষয়আশয়ে সুখের সন্ধান করে আত্মকেন্দ্রিক জৈব প্রবৃত্তির তাড়নায়। তাছাড়াও মানুষের মধ্যে আর একটি বৃত্তি নিহিত থাকে—সেটা হল সকলের শুভকামনা তথা সমাজের মঙ্গলচিন্তা। বংশ ও জাতি রক্ষার্থে এই পরার্থপরতার উৎস হল সহজাত জৈব প্রবৃত্তি। মনুষ্য-প্রকৃতির এ-দুধারা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> We have a greater body which is the social body. Society is the organism, of which we as parts have our individual wishes. We want our own pleasure and licence. We want to pay less and gain more than anybody else. This causes scramblings and fights. But there is that other wish in us which does its work in the depths of the social being. It is the wish for the welfare of the society[২৪]

সামাজিক কাঠামোয় মানুষ বুদ্ধি ও বিবেক সংযোগ করে এবং সেই কাঠামোটা পারস্পরিক চিন্তা ও অনুভূতির সাযুজ্য বজায় রাখে। মানুষের শুভ ও সুন্দর বোধের উৎস হল সমাজ; সমাজের প্রয়োজন তার কাছে স্বভাবগত। মানুষের অহং ভাবকে সমাজই অতিক্রম করে এবং তার প্রবৃত্তিগুলিকে চরিতার্থ করে। সমাজের মধ্যে দিয়েই সকল মানুষের মিলন ঘটে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> Society as such has no ulterior purpose. It is an end itself. It is a spontaneous self-expression of man as a social being. It is a natural regulation of human relationships; so that men can develop ideals of life in co-operation with one another. It has

also a political side, but this is only for a special purpose. It is for self-preservation. It is merely the side of power, not of human ideals. And in the early days it had its separate place in society, restricted to the professionals.[২৮]

সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীস্বরূপ—সমষ্টিগতভাবে মানবিক মূল্যবত্তা একদিন সমাজের আত্মারূপে প্রতিভাত হয়। সমাজ দিব্যমানসের অভিব্যক্তি। মানুষের স্মরণ রাখা উচিত যে তার অন্তর্নিহিত সত্তার সাহায্যে সে বিকশিত হয়ে মহানুভবতা প্রদর্শন করতে পারে। সমাজের মধ্যে নিজেকে সম্প্রসারণের ফলস্বরূপ মানুষ এক নিগূঢ় ঐক্যের প্রাবল্য অনুভব করে। তিনি বলেছেন—

For man, the best opportunity for such a realisation has been in men's society. It is a collective creation of his, through which his social being tries to find itself in its truth and beauty ...In this large life of social communion man feels the mystery of unity, as he does in music.[২৯]

কার্যকারিতার দৃষ্টিতেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের মূল্যবিচার করেছেন। সমাজের কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসই সামাজিক উৎপীড়নের কারণ। আদিমকালে সামাজিক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রেখে কাজের বিভাগ-প্রয়োজনে জাতিবিন্যাসের উৎপত্তি ঘটে। আর্য ও দ্রাবিড়দের সংঘর্ষ এড়িয়ে একটা সমন্বয় ও সংহতি সাধনে সেই প্রথা কার্যকর হয়েছিল। সময়ের পরিবর্তনে ঐ প্রথায় ভাঙন ধরেছে। ব্রাহ্মণদের কাজ ছিল মননের পুষ্টিসাধন, তাঁরা সেকাজে মৌরুসিস্বত্বের ভোগ ছাড়াও অব্রাহ্মণদের জন্মগতভাবে পদানত করে রেখেছিলেন। তাতে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটিয়ে ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণীবিশেষের উপর দেবত্ব আরোপের নিষ্ফল চেষ্টা করা হয়; বর্ণাশ্রম তাই ক্রমে হৃদয়হীন ও হানিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোঁড়ামির যূপকাষ্ঠে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ, অনুভূতি ও কর্মক্ষমতাকে বলি দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করতেন মুক্তির আস্বাদ গ্রহণে মানুষ তখনই সক্ষম হবে যখন সামাজিক ভেদাভেদ ও সংকীর্ণতার অবসান ঘটবে। সেজন্যে তিনি বলেছেন —

It is evident that the caste-idea is not creative; it is merely institutional It adjusts human beings according to some mechanical arrangement. It emphasises the negative side of the individual—his separateness. It hurts the complete truth in man.[৩০]

বংশানুক্রমিক মানমর্যাদার অধিকারের পরিবর্তে মানুষ নির্বিশেষে সর্বজনের সামাজিক সকল সুযোগসুবিধায় সমানাধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। আবহমানকালের এই অপ্রতিরোধনীয় নিয়মনিগড়ে সমাজ স্রোতহীন জলাশয়ের

ন্যায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে—হারিয়ে ফেলেছে তার স্থিতিস্থাপকতা। জাতিভেদ শুধু পুরুষানুক্রমকেই বজায় রাখে এবং সমাজের স্বাভাবিক গতি ও পরিবর্তন-শীলতাকে রোধ করে। জাতিভেদ-প্রথার বিরোধিতায় তিনি লিখেছেন: "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান"।

বিচিত্রকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিকেই রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার অন্যতম মানদণ্ড বলে মনে করতেন। ইউরোপে ঐক্য অর্জিত হয়েছে রাষ্ট্রের মাধ্যমে। সেজন্যে ইউরোপে রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঐক্যই শ্রেয়। ভারত বিচিত্রকে গ্রথিত করেছে সমাজের সূত্রে। নেশনের মধ্যে দিয়ে ইউরোপ যাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে তারা সবর্ণ, ভারত যাদের একত্র করেছে তারা অসবর্ণ। রাষ্ট্রতান্ত্রিক ঐক্য অন্যায় নয়, তবে ভারতের কাছে তা গৌণ। ইউরোপে রাষ্ট্রই প্রধান, ভারতে প্রাধান্য পেয়েছে সমাজ। ইউরোপে চরমস্বরূপ রাষ্ট্রকে জানার ফলে নেশনকে মানতে হয়েছে। ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতর নেশন রূপ পরিগ্রহ করে এবং নানা তাগিদেই নেশন-স্টেট গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শক্তির উপর নির্ভর করে, সহযোগিতার উপর নয়। রাষ্ট্র জাতিকে বলবান করে; আর মানুষকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় সমাজ। নেশনবাদের পরিপোষণ করে নেশন-স্টেট। ভারতের জীবন সমাজকেন্দ্রিক; সেক্ষেত্রে ইউরোপের জীবন নেশন-স্টেটকেন্দ্রিক। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানুষ সার্থক হতে চায় নিজেকে সবার স্বার্থে বিলিয়ে দিয়ে, মানুষ কল্যাণকামী, সে চায় সবার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন, মানুষের সমাজবোধের সার্থক পরিণতি বিশ্বমানবতায়। সেখানে সকল জাতি হয় একাত্মবোধে আবদ্ধ। কবি সেই মঙ্গলদায়ক সমাজ গড়তে চেয়েছেন; এ-চাহিদা নেশন-স্টেট মেটাতে অক্ষম। বিরোধিতাকে ভারত অপাঙক্তেয় করে নি, পরকে শত্রু মনে করে নি, বহুমুখী পথ ও বিচিত্র মতকে সমাজে ঐক্যবদ্ধ করেছে; সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে সকলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। নেশন-স্টেট ভারতীয় ভাবধারার পরিপন্থী এবং শক্তির দম্ভে মত্ত; মিলনের পরিবর্তে নিরঙ্কুশ জবরদখলেই তার তুষ্টি; সেখানে প্রেমের স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ যে-স্বদেশী সমাজের চিত্র তুলে ধরেন সেখানে ব্যক্তিমানুষের সত্তাকে সকলের সমবায়ে শক্তিশালী করার কথাই বলা হয়েছে। তাঁর মতে সমাজদেহের মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির সত্তা বিচ্ছুরিত হয়। সমাজবন্ধনের শিথিল ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার পরিবর্তে চাই সুষ্ঠু সুসংবদ্ধ রূপ। সমাজজীবন প্রকৃতই প্রাণবন্ত ও সার্থক হয়ে উঠবে যদি তার অধিবাসীরা নিজেদের কর্তব্য নিষ্ঠাসহকারে পালনের সঙ্গে পারস্পরিক সমতাবোধ পোষণ করে।[৩১]

রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী রাষ্ট্রদর্শনে মানুষের নীতিপ্রবণ সমবায়ী সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। হেগেল ইতিহাসকে march of the absolute এবং রাষ্ট্রকে Divine Idea রূপে দেখেছিলেন। তদনুসারে যাবতীয়

কল্যাণপ্রয়াস ও নৈতিকতার ধারক ও পরিপোষক হল রাষ্ট্র; মানুষের ভূমিকা কেবল রাষ্ট্রের কাছে অনুগত থাকা। উচ্চাসনে আসীন মুষ্টিমেয় মঙ্গলকামী ব্যক্তি সেখানে ইতরজনের শিক্ষক ও গুরুরূপে কাজ করেন। তাঁরাই রাষ্ট্রের দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা এবং সমাজের প্রণম্য। হেগেলের উত্তরসাধক মার্কস উৎপাদনাশ্রয়ী শ্রেণী সম্পর্কের পটভূমিতে রাষ্ট্রের চরিত্র ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। রাষ্ট্রকে মার্কস উৎপীড়নকারী (coercive) বলে মনে করতেন। শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং ক্রমে রাষ্ট্রের বিলোপ সাধিত হবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি না চাইলেও সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র পৃথকরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৩২]

অধিকারতত্ত্ব

মানুষের অধিকারকে রবীন্দ্রনাথ যথোচিত মূল্য দিয়েছেন। তবে অধিকার কেবল নিঃশর্ত ভোগের জন্যে নয়—উচ্চতর মূল্যবত্তায় নিঃস্বার্থ অবদানেই অধিকারের সার্থকতা নির্ভর করে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি বলেছেন—

> In fact, the only true human progress is coincident with this widening of the range of feeling. All our poetry, philosophy, science, art and religion are serving to extend the scope of our consciousness towards higher and larger spheres. Man does not acquire rights through occupation of larger space, nor through external conduct, but his rights extend only so far as he is real, and his reality is measured by the scope of his consciousness.[৩৩]

প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঐক্যবন্ধ জীবনের আস্বাদ পেলে মানুষকে কতকগুলি অধিকারের জন্যে অনর্থক যুঝতে হয় না—তার অধিকারগুলি অন্তরাত্মার অমর অধিকারস্বরূপ দৃঢ়তা ও স্বীকৃতি অর্জন করে। জাত্যভিমান ও শক্তিমত্তায় মনুষ্যত্বের যে-অবমাননা ঘটে কবি তার প্রতিকারস্বরূপ ঐশ বিধানকে সুবিচার ও স্বাধিকারের রক্ষকরূপে দেখার নির্দেশ দেন। ভোগের লালসা ও দুর্নিবার শক্তিলিপ্সা প্রবল হলে ঐশ শান্তিও বিঘ্নিত হয়।

বিবেকানন্দের মতো তিনিও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগতভাবে অধিকার অর্জনের জন্যে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন। পরাধীনতার গ্লানি অন্তরের ঐশ প্রভাবকে নিষ্প্রভ করে তোলে—সেটা অসত্য ও অবিচারের কাছে মাথা নত করার সামিল। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন বিদেশী শাসকদের উৎপীড়ন ও অত্যাচারকে রুখতে হলে প্রথমে নিজেদের নৈতিক শক্তিকে জাগিয়ে তোলা

দরকার।

তাঁর মতে পরাধীনতা মানুষের নৈতিক অধঃপতন শুধু ঘটায় না, মানুষের আত্মাকেও অবমানিত ও অবদমিত করে। বস্তুত আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারেই মানবিক অধিকার নির্ভর করে। ভারতের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তাই রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

মু ক্তি র প্র ত্য য়

মানুষের মুক্তির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানবচরিত্রকে মাপকাঠি করেছেন। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে দুটি দিক আছে। একদিকে সে স্বতন্ত্র, আর একদিকে সে সকলের সঙ্গে যুক্ত।[৩৪] এর একটিকে বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে তা অবাস্তব। তিনি উভয়ের সমন্বয় চেয়েছিলেন। পশ্চিমী রাষ্ট্রদর্শনে যাকে 'ফ্রিডম' বলা হয় রবীন্দ্রনাথ তাকে চঞ্চল, ভীরু, স্পর্ধিত ও নিষ্ঠুর আখ্যা দিয়েছেন।[৩৫] ভারতীয় ভাবানুসারে 'ফ্রিডম' বা মুক্তির তিনি ভিন্ন রূপ নির্দেশ করেন—তার মর্ম হল আত্মার বিকাশ ও তার চরম উপলব্ধি; কোনো সংকীর্ণ মতবাদে তা আবদ্ধ নয়। পূর্ণাঙ্গ মানবদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পিত এই মুক্তির উৎস মূলত ঔপনিষদ দৃষ্টিভঙ্গি; পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রদর্শনের পরিধি অপেক্ষা তা বহুলাংশে বৃহত্তর। পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চিন্তায় মানুষ কিছুটা স্বার্থান্বেষী ও আত্মকেন্দ্রিক। সেখানে কখনো দৃষ্টবাদ এবং কখনো বা বস্তুবাদের প্রাবল্য—আত্মার স্থান সেখানে গৌণ। আবার সমষ্টিবাদী চিন্তায় মুক্তির কোনো স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথের মুক্তমানুষ অহংবাদী নয়—বিরাট-বিশ্বের সঙ্গে তার আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘনিষ্ঠ। মুক্তির জন্যে মানুষের চেতনা ও সংগ্রামের প্রয়োজন যেমন তিনি ঘোষণা করেছেন, তেমনি লব্ধ মুক্তিকে মানবিক কল্যাণার্থে দায়িত্ব ও কর্তব্যে যুক্ত করতে চেয়েছেন।[৩৬]

প্রকৃতি ও ইতিহাসের নির্দেশনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে জৈব তাগিদে মানুষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়। বাহ্যজগতের বন্ধন থেকে মুক্তি যদি পাওয়া যায় তাহলে মানুষের আধ্যাত্মিক জগতে বাধাহীন বিচরণ অসম্ভব। একমাত্র মুক্ত আধ্যাত্মিক জগৎ সৃজনসত্তার অনুকূল। অতিমানস-শক্তির অপরিসীম সৃজন-প্রবাহ আর্টের উৎকর্ষ সাধন করে। সৃজনসত্তায় আধ্যাত্মিকতার বীজ নিহিত থাকে—মুক্তি সেই বীজোদ্গমেরই ফল। কবির মতে জৈব তাগিদের বন্ধন থেকে মানুষ ক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।[৩৭]

মানুষের কর্মতৎপরতার অবাধ অধিকার যেমন তাঁর কাম্য ছিল, তেমনি মননেরও তিনি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কামনা করেছেন। কেন্দ্রীভূত শক্তিকে তাই তিনি নিন্দা জানিয়েছেন; সংকীর্ণ সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও যান্ত্রিক

আচারবিচারও মুক্তির পরিপন্থী বলে মনে করতেন।[৩৮] মানবাত্মার অনাবিল স্বাধীনতাই ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর মতে প্রেমই হল মুক্তির পথ। আত্মোপলব্ধির দ্বারা উদ্ভাসিত অন্তরই মুক্তির বাণী বহন করে। সহৃদয় সাহচর্য, হৃদয়গভীর সমবেদনা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটে ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। অহংবোধ মানুষের জীবনকে নিরানন্দ ও বৈচিত্র্যহীনতায় আচ্ছন্ন করে তোলে এবং মুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে। সমবেদনা ও সমন্বয়ের পথে মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মশক্তি মুক্তি ও মিলনের দিকে অগ্রসর হয়। সর্বব্যাপী অসীম সৃজনীশক্তির আধার ঈশ্বরের নিষ্কাম উপলব্ধিতেই মুক্তির পথ সুগম হয়ে ওঠে।[৩৯]

কবির নিগূঢ় মুক্তির প্রত্যয় ভারতীয় রাষ্ট্রদর্শনে একটি বিশেষ অবদান। তাঁর কাছে স্বাধীনতার অর্থ বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য নয়। স্বাধীনতার দ্বারা আনন্দময় সামাজিক সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। সর্ববিধ যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবিধি ও নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তে তিনি মুক্ত, সৃজনশীল জীবনের জয়গান করেছেন। যে-যূথবাদী সভ্যতায় ব্যষ্টিকে গোষ্ঠীর বেদীমূলে বলি দেওয়া হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নামে ব্যক্তিসত্তাকে দমন করা হয় তার তিনি তীব্র নিন্দা করেন।[৪০]

সকল দেশেরই রাজনৈতিক মুক্তির দাবি তাঁর কণ্ঠে শোনা যায়। তাঁর মতে ভারতের স্বাধীনতা একদিকে যেমন এদেশকে উজ্জীবিত করবে অন্যদিকে তেমনি ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক আদর্শের ক্রমবিকাশকে পূর্ণ করে তুলবে। ১৯৩২ সালে গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ ভারতের মৌলিক অধিকারস্বরূপ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেন এইজন্য যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভারতের নিশ্চল জীবনে গতি সঞ্চার করবে, দেশবাসীর মনে গণতান্ত্রিক চেতনার সহায়ক হবে। পূর্বে তিনি স্বরাজ্য দলের কাউন্সিল প্রবেশ নীতিকেও সমর্থন করেছিলেন; কিন্তু শাসন সংস্কার বানচাল করে দেবার যে-পন্থা ঐদল অবলম্বন করে তাতে তিনি সায় দিতে পারেন নি। গান্ধীর রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে যোগদানকে তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সহযোগী সম্পর্ক গড়ার পক্ষপাতী ছিলেন তা সমপর্যায়ভুক্ত বন্ধুত্বের। মুক্তি ও সমানাধিকারের প্রশ্ন স্বতঃসিদ্ধ।

দণ্ডনীতি

রবীন্দ্রনাথ 'দণ্ডপ্রয়োগের অতিকৃত রূপকে' বর্বরতা বলে মনে করতেন। হিংসার দ্বারা হিংসার প্রতিকার হয় না বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। এমনকি নির্জন কারাকক্ষবাস, দ্বীপান্তর ও নির্বাসনেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। মৃত্যুদণ্ডদান

তাঁর কাছে অকল্পনীয় অমানুষিকতা হিসাবে বিবেচিত। তাঁর মতে প্রচলিত শাস্তিবিধানের দানবিক দন্তবিকাশ নির্মম স্পর্ধার সঙ্গে যেন সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে। শাস্তিদানের নির্দয় প্রণালী এদেশে পাঠশালা থেকে পাগলা গারদ পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কারণ মানুষের মনে বর্বরতা রয়ে গেছে, নির্দয়তায় সে তৃপ্তি পায়। সভ্য দেশে এই প্রথা কিছুটা রহিত হয়েছে।

সাধারণত অপরাধীদের সম্বন্ধে এমন একটা সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে তাদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহারে মন বাধা পায় না। ধরে নেওয়া হয় তারা সকলের মতো নয়; তাই তাদের প্রতি আচরণ নির্মম অত্যাচারের রূপ নিলে সারা সমাজের সমর্থন পাওয়া যায়। সমাজের অন্তরে সুপ্ত নির্দয় প্রবৃত্তি এদের মাধ্যমে চরিতার্থ হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে সমাজের দুষ্ট প্রবৃত্তি সংশোধন করা কর্তব্য। কারাশ্রয়ী দণ্ডবিধির দুর্বিষহ উগ্রতা আপন সীমা অতিক্রম করে। তাই তাকে কোনো-মতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। জেলখানাগুলিকে তিনি "হিংস্রতার ঠগিধর্ম-উপাসক ফ্যাসিজমের জন্মভূমি" বলে অভিহিত করেন।

কাজির বিচারের দিন চলে গেছে। এখন অপরাধের নিঃসংশয় প্রমাণের জন্যে প্রমাণতত্ত্বের অনুশাসনের মাধ্যমে বৈধ সাক্ষ্যের সন্ধান ও বিশ্লেষণ, অভিজ্ঞ বিচারক ও বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর নিয়োগ প্রচলিত হয়েছে। তবুও অপরাধের যথোচিত মীমাংসা হয় না, নির্দোষ মানুষ দণ্ডভোগ করে। নিঃসন্দেহে দোষ প্রমাণের অসুবিধা থাকলে শাস্তিবিধানে করুণার স্থান রাখা বাঞ্ছনীয়। রাজনৈতিক খুনজখম, লুটপাটের জন্যে যারা দায়ী তারাও অন্যান্য অপরাধীদের চেয়ে কম ঘৃণ্য নয় বলে তিনি করতেন।[৪১]

স্বরাজ ও স্বদেশপ্রেম

স্বরাজ শব্দটি সম্পর্কে ভারতের তৎকালীন বিভিন্ন জননেতার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির কথা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। স্বরাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথেরও একটি নিজস্ব মনোভব ছিল। তিনি মনে করতেন—

> বিশ্বে বিধাতার যে অধিকার আছে সেই হচ্ছে তাঁর স্বরাজ অর্থাৎ বিশ্বকে সৃষ্টি করবার অধিকার। আমাদেরও স্বরাজ হচ্ছে সেই ঐশ্বর্য অর্থাৎ আপন দেশকে আপনি সৃষ্টি করে তোলবার অধিকার। সৃষ্টি করার দ্বারাই তার প্রমাণ হয়, এবং তার উৎকর্ষসাধন হয়।[৪২]

এই সৃষ্টিকর্ম আনন্দ, আত্মোপলব্ধি ও আত্মশক্তির পরিবর্ধক—সকলের সমবায়ে সকলের মঙ্গলবিধানই তার লক্ষ্য। মঙ্গলকর্মকে তিনি সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন—"স্বাস্থ্যের সঙ্গে, বুদ্ধির সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে,

আনন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই মানুষের সব ভালো পূর্ণ ভালো হয়ে ওঠে।" স্বদেশের সেই ভালোর রূপটিকেই তিনি দেখতে চেয়েছেন।

স্বরাজসাধনায় চরকা তত্ত্বের তিনি বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে চরকা কেটে যিনি স্বরাজসাধনা করেন তিনি যন্ত্র, নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন; সেই কাজে সামগ্রিক অভ্যুন্নতির কোনো আশা নেই। তিনি বলেন—

> যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অন্ন-উপার্জনে আনন্দ-বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজলাভের পথে প্রদীপ জেবলেছে; তার পরে একটা দীপের থেকে আর একটা দীপের শিখা জ্বালানো কঠিন হবে না; স্বরাজ নিজেই নিজেকে অগ্রসর করতে থাকবে, চরকার যান্ত্রিক প্রদক্ষিণপথে নয়, প্রাণের আত্মপ্রবৃত্ত সমগ্রবুদ্ধির পথে।[৩]

স্বদেশপ্রেম সম্পর্কেও তাঁর বৈপ্লবিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশকে তিনি গভীরভাবেই ভালবাসতেন। দেশের জন্যে তাঁর চিন্তাভাবনা ও কাজের পরিমাণ অপরিমেয়। কিন্তু তাঁর ভালবাসার পিছনে কোনো অন্ধ আবেগ ছিল না। দেশকে ভালবাসতেন তিনি দেশের অধিবাসী হিসাবে নয়; মানুষ হিসাবেই তিনি দেশবাসীর যাবতীয় দুর্গতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বন্ধু এন্ডরুজকে তিনি এক পত্রে লিখেছিলেন—

> I love India, but my India is an Idea and not a geographical expression. Therefore I am not a patriot—I shall ever seek my compatriots all over the world.[৪]

জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে তাঁর যে সুস্পষ্ট দর্শন ছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বরাজ ও স্বদেশচিন্তাকে রূপ দিয়েছেন। স্বদেশপ্রেমের জন্যে তিনি অপরের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ককে ক্ষুন্ন হতে দেন নি; চেতনাকে সংকুচিত করেন নি। তাই নেশন হিসাবে ইংরেজের আচরণকে গর্হিত মনে করলেও উন্নতমনা ইংরেজের প্রতি ভালবাসা জানাতে দ্বিধা বোধ করেন নি। যে কোনো দেশের হিংসা, লোভ, অত্যাচার ও আধিপত্য বিস্তার-প্রচেষ্টার নিন্দা করেছেন। আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষকে তিনি যেমন নিন্দা করেন তেমনি কোরিয়ায় জাপানি সাম্রাজ্যবিস্তারী ক্রিয়াকলাপকেও ধিক্কার জানান।

জাত্যভিমান না থাকায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ বলে কিছু ছিল না বললেই চলে। সারা বিশ্বই তাঁর স্বদেশ। ১৯২০ সালের পর গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে জাতিবিদ্বেষ ও ঘৃণার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করে তিনি তা সমর্থন করেন নি। আবার ভারতীয়দের উপর ইংরেজের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেও কোনো দিন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। অন্ধ দেশহিতৈষার অন্তরালে তিনি স্থূলতা, নির্বিবেক লালসা এবং মানবিকতার পরিবর্তে আত্মম্ভরিতা প্রত্যক্ষ করেন। অন্তরের ন্যায়, নীতি ও যুক্তির মানুষটিকে কবি স্বদেশপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন; সমকালীন

স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যধারায় তিনি বিশ্ববিমুখ মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম ছিল বিশ্বমানবতার প্রাথমিক স্তর। সমগ্র মানবসমাজেরই তিনি মুক্তি ও উন্নতি কামনা করেছিলেন ; ভারতপ্রেম তার খণ্ডচিত্র।[৫]

ন্যা শ ন্যা লি জ ম

যে সমাজচিত্রপটে ইউরোপে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটেছিল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সে পটভূমিকায় জন্মায় নি। উভয়ের উদ্ভব, পরিবেশ ও কারণগুলি ছিল ভিন্ন। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ, বিশ্বব্যাপী বাজার দখল, পররাজ্য গ্রাস ও শোষণের তাগিদে উদ্ভূত হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঐ আধিপত্য থেকে মুক্তির প্রেরণায় উৎপন্ন হয়। তাই ভারত ও ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ বন্ধুত্বের নয়, বৈরিতার। সামনের দিকে তাকালেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মন ছিল পিছনটানে বাঁধা—কারণ সাহস, শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চয়ের জন্যে ভারতকে অতীতের দিকে মনোনিবন্ধ করতে হয়েছে ; সেজন্যে অন্ধ বিশ্বাস, উচ্ছ্বাসপ্রবণতা ও সংকীর্ণ মনোভাবে ভারতীয় চিন্তা আবদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পরিবর্তনশীল, বিশ্বপ্রগতির দিক থেকে সংকীর্ণ ও প্রতিক্রিয়াশীল। রামমোহনের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ এদেশের জাতীয়তাবাদী আদর্শে সায় দিতে পারেন নি।

'ন্যাশন্যালিজম' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি বলেছেন যে, জাতীয়তাবাদ মানুষকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ও তার মনুষ্যত্বকে অবরুদ্ধ করে। কাল্পনিক এক সমষ্টির কাছে ব্যক্তিকে বলি দিয়ে মানুষের সৃজনশীল সত্তার বিকাশকে ব্যাহত করে। নেশনের দাপটে ব্যক্তি যে শুধু যন্ত্রে পরিণত হয় তাই নয়, তার গতি ও প্রকৃতি নিরঙ্কুশ শক্তিমত্ততা ও ভীতির উপর অবস্থান করে। সেজন্যে তিনি বলেন যে, মানবতার প্রয়োজনে আজ আমাদের শক্ত সোজা দেহে সরব হতে হবে এই বলে যে জাতীয়তা এক নির্মম মহামারী ; তার পাপপঙ্কিল সংক্রামক ব্যাধি আজ মানবসমাজে ঘুণ ধরিয়ে মানুষের প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে তুলছে।[৪৬]

দেশবিদেশে জাতীয়তাবাদের যে-চিত্র ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার তিনি তুলনা করেছেন। অপরের স্বাধিকার খর্ব করে নিজের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থি। অকাট্য যুক্তি ও ঔদার্যের সাহায্যে তিনি এমন এক আদর্শ সমাজচিত্র তুলে ধরেন যেখানে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকবে না—ঐক্য ও মিলনই একমাত্র লক্ষ্য ও পরিণতি। এই মিলনের মাঝখানে রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সীমার কোনো স্থান নেই। এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ অনুগামী বলা যায়।

স্বদেশকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবেই ভালবাসতেন। যে-মাটিতে তাঁর জন্ম

ও যেখানকার জলহাওয়ায় তিনি পরিপুষ্ট তার প্রতি তাঁর অনুরাগ আবেগ ও আকর্ষণ কিছু কম ছিল না। তবে দেশ বলতে তিনি কোনো ভৌগোলিক গণ্ডিকে মনে স্থান দেন নি, দেশ তাঁর কাছে মানসিক ; সেই অর্থে রবীন্দ্রনাথের কোনো দেশ নেই, সারা বিশ্বই তাঁর দেশ ও বিচরণক্ষেত্র, সকল দেশই তাঁর জীবনসাধনার পুণ্যভূমি। সমগ্র মানবসমাজ তাঁর চোখে এক ও অখণ্ড। তাই তিনি বিশেষ কোনো দেশের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী গণ্ডিতে বিচরণ করতে অক্ষম ছিলেন।

মানুষের আত্মিক সৌহার্দ ও সংযুক্ত বিশ্বরাষ্ট্রই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। তাঁর কাছে জাতীয় সরকারের বিশেষ আবেদন ছিল না। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদ মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, যার রুদ্ররূপদৃষ্টে মানবসভ্যতা সংকটাপন্ন। জাতীয় গরিমা সংকীর্ণ চিন্তার পরিচিতি বহন করে এবং আধ্যাত্মিক মন ও অনুভূতির অভাব দর্শায়। সাম্রাজ্যবাদের অংকুরও অন্ধ দেশভক্তি ও জাতীয়তাবাদে নিহিত। তাঁর কাছে জাতির চেয়ে মানুষই ছিল বড়। ভারতের শাশ্বত ভাবধারায় তিনি সেই প্রেরণাই পান ও তাকে উজ্জীবিত করার প্রয়াসী হন। তিনি বলেন—

> স্বার্থের আদর্শ, বিরোধের আদর্শ যতই দৃঢ়, যতই উচ্চ, যতই রন্ধ্রহীন হইয়া ধর্মের গতিকে বাধা দিতে থাকে ততই তাহার বিনাশ আসন্ন হইয়া আসে। য়ুরোপের নেশনতন্ত্রে এই স্বার্থ বিরোধ ও বিদ্বেষের প্রাচীর প্রতিদিনই কঠিন ও উন্নত হইয়া উঠিতেছে। নেশনের মূলপ্রবাহকে অতিনেশনত্বের দিকে বিশ্বনেশনত্বের দিকে যাইতে না দিয়া, নিজের মধ্যেই তাহাকে বন্ধ করিবার চেষ্টা প্রত্যহ প্রবল হইতেছে। আগে আমার নেশন তার পরে বাকি আর সমস্ত কিছু, এই স্পর্ধা সমস্ত বিশ্ববিধানের প্রতি ভ্রূকুটিকুটিল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে।[৫৩]

জাতিপূজা তাঁর কাছে ছিল বর্জনীয়। তাঁর মতে জাতীয়তাবাদের নেশায় আচ্ছন্ন মানুষ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে নিজেরই সৃষ্ট দানবের হাতে খেলার বস্তু হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, ক্রমে উপনিবেশ বিস্তারের লালসায় নিজের সমূহ শক্তিকে বিনিয়োগ করে। জাতীয়তাবাদের সংঘশক্তির দাপটে নিজ অস্তিত্বের শুভ উদ্দেশ্য মানুষ ভুলে যায়—প্রেম, প্রীতি, মুক্তি ও নৈতিক আদর্শ বলে আর কিছু থাকে না। জাতীয়তাবাদ আজ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির রণহুঙ্কারে মুখরিত ; মানুষের শুভসত্তাকে খর্ব করে শাসকেরা মানুষকে যুদ্ধের পুতুলে পরিণত করেছে।[৫৪]

জাত্যভিমানের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে ঐশ রাজ্যের নাগরিক করে তুলতে চেয়েছেন। বিশ্বমানবকে তিনি সংঘবদ্ধ, সর্বগ্রাসী জাতীয়তাবাদী যন্ত্রদানবের সঙ্গে সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছেন ; মানুষের সুপ্ত শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, মানুষের

মননশীলতার যথোচিত কর্ষণেই জাত্যভিমান মোচন করা যায়।

পশ্চিমী সভ্যতায় বেনিয়া মনোভাব ও তারই তাগিদে পররাজ্য গ্রাসের প্রবৃত্তিকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কার জানান। সেইসব অত্যাচারী দেশগুলির পররাষ্ট্র নীতিতেও বিদ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভীতির মনোভাব পরিস্ফুট। সেখানে প্রেম ও প্রীতির স্থান নিয়েছে যুদ্ধের উপকরণ।

পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান ও গবেষণায় তিনি যথেষ্টই শ্রদ্ধাবান ছিলেন; সেখানকার সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ও উদারতার মন্ত্রে তিনি প্রেরণা সঞ্চয় করেন। পশ্চিমী রাজনীতিতে মানুষের সামাজিক অধিকার, নাগরিক বোধ ও চেতনারও তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদের নামে পশ্চিম যে সংঘবদ্ধ দানব শক্তি প্রদর্শন করে তার প্রতি রবীন্দ্রনাথ তীব্র কশাঘাত হানেন। আফ্র-এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির রক্তশোষণ ও নিপীড়নে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের অবাধ লোভ ও লালসা পরিণামে মানবতা ও সভ্যতার পক্ষে চরম বিপদ বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বুদ্ধিবিবেক বর্জিত সাম্রাজ্যবাদের রক্তলোলুপ দৃষ্টির সম্প্রসারণ শান্তিকামী নিরীহ প্রাচ্যের নিকট ভয়াবহ সংকটরূপে উপস্থিত হয়েছে। প্রতীচ্যের এই দানবীয় আচরণকে অনুসরণের জন্যে তিনি জাপানেরও নিন্দা করেছিলেন।[৪২]

কবি অনুভব করেন যে রুশো, বার্ক প্রমুখ দার্শনিকদের প্রভাব ইউরোপে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে: বিজ্ঞানের যূপকাষ্ঠে সেখানে মানবতাকে উৎসর্গ করা হয়েছে; রাজনৈতিক আধিপত্যের তাগিদে সামাজিক মূল্যবত্তাকে জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে! পশ্চিমী মনোভাবে মানবিক আদর্শ ও সমবেদনা অপসৃয়মান; অপর দেশকে অর্থনৈতিক শোষণের অভিসন্ধি তার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অবনত করেছে। এই যান্ত্রিক ও নির্মম প্রবৃত্তি একদিন হীনবীর্য হয়ে পড়বে—রবীন্দ্রনাথের সে-সতর্কবাণী আজ প্রমাণিত হয়েছে।

গান্ধীর রাজনৈতিক পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ তেমন গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ তিনি মনে করতেন গান্ধীনীতি সংকীর্ণ চিন্তাপ্রসূত জাতীয়তাবাদে প্রতিষ্ঠিত—ভারতের সনাতন বৈশ্বিক ভাবধারা থেকে গান্ধীনীতি পৃথক। বিদেশী বস্ত্র পোড়ানোয় জাতিবিদ্বেষই প্রকাশ পায়—তাই সে-নীতিকে তিনি সমর্থন করেন নি।[৪৩]

ক মি উ নি জ ম

রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে বিশ শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা হল রুশ বিপ্লব, যা তাঁর মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিলেন। পরশ্রমজীবী ও পরিশ্রমজীবীর সংগ্রামে কবির সহানুভূতি ছিল শেষোক্ত শ্রেণীর অনুকূলে।

তাই বলে তিনি বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করেন নি। আত্মকেন্দ্রিক নির্বিবেক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তাঁর যেমন রুচি ছিল না, তেমনি অন্ধ সাম্যবাদেও তাঁর সমর্থন ছিল না। লক্ষ্য ও পদ্ধতির (end and means) মধ্যে সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী ছিলেন বলে রক্তঝরা বিপ্লবের পথ তিনি অনুমোদন করেন নি। অত্যাচার, অবিচার, দুর্নীতি ও জাতিগত বিদ্বেষবন্ধন থেকে মুক্তির বাণী রুশ বিপ্লবে ধ্বনিত হয়েছিল। তাই মানবতন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রথমে অভিনন্দিত করেছিলেন। কিন্তু রুশ দেশ ভ্রমণে তাঁর ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়। 'রাশিয়ার চিঠি' গ্রন্থে গোড়ার দিকে উচ্ছ্বসিত প্রশস্তিবাচন আছে, কিন্তু শেষের দিকটা ক্রমেই সংশয়মিশ্রিত হয়ে ওঠে।

খোলা মন নিয়েই তিনি সোভিয়েত দেশ ভ্রমণে যান ; দেখার "প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোকের দিক"।[৫১] কিন্তু সেখানকার অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি ; প্রত্যক্ষ করেন, "আর-সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই"।[৫২] বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলিকে সমাধানের নামে যে "যথেষ্ঠ জবরদস্তি আছে" তাও তিনি লক্ষ্য করেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন ; তাই রাশিয়ায় সমষ্টির নামে ব্যক্তিস্বার্থের বলিদানকে নিন্দা করেছেন। দ্বাদশ চিঠিতে লিখেছেন—

> মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সীমা এরা যে ঠিকমত ধরতে পেরেছে তা আমার বোধ হয় না। সে হিসাবে এরা ফ্যাসিস্টদেরই মতো। এই কারণে সমষ্টির খাতিরে ব্যষ্টির প্রতি পীড়নে এরা কোনো বাধাই মানতে চায় না। ভুলে যায় ব্যষ্টিকে দুর্বল করে সমষ্টিকে সবল করা যায় না, ব্যষ্টি যদি শৃঙ্খলিত হয় তবে সমষ্টি স্বাধীন হতে পারে না। এখানে জবরদস্ত লোকের একনায়কত্ব চলছে।[৫৩]

সমাজকে নবরূপে গড়ে তুলতে হলে সর্বাগ্রে চাই উপযুক্ত শিক্ষা—একথা রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্বেই উপলব্ধি করে সেই কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সোভিয়েত দেশের একনায়কতন্ত্র তাঁর পছন্দ না হলেও সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার বিরাট উদ্যোগ ও অগ্রগতি তাঁর মনকে বিশেষ স্পর্শ করে। সেখানে গিয়ে তিনি রাজনীতির কথা বিশেষ তোলেন নি। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শন সম্পর্কেই তিনি আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতা করেন।

পুঁজিবাদীদের শোষণ ও বৈষম্যমূলক আচরণের ফলেই কমিউনিজমের উদ্ভব ; তার ভিতরে মানবিক মূল্যবত্তাগুলি ক্রমে একদিন যে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে সেই আশা তিনি ব্যক্ত করেন। সোভিয়েত দেশ দেখে এসে লেখা তাঁর প্রশংসাপত্র পড়ে স্বদেশের লোক যাতে কোনো ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত না হয় সেজন্যে যেন উপসংহারে তিনি সবিস্তারে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার ভাল ও মন্দ উভয় দিকের একটা ভারসাম্য ব্যাখ্যা করেছেন—

সোভিয়েত রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ ; সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি...যেখানে আশুফললাভের লোভ অতি প্রবল সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মতস্বাতন্ত্র্যের অধিকারকে মানতে চায় না।... সেখানকার পলিটিকস মুনাফালোলুপদের লোভের দ্বারা কলুষিত নয় বলে রাশিয়া-রাষ্ট্রের অন্তর্গত নানাবিধ প্রজা জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সমান অধিকারের দ্বারা ও প্রকৃষ্ট শিক্ষার সুযোগে সম্মানিত হয়েছে।[৫৪]

সম্পত্তির যৌথ অধিকার প্রত্যয়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। অবশ্য পুঁজিবাদী দেশে সম্পত্তিতে সর্বনাশা একচেটিয়া স্বত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাহলেও গ্রীন বা হেগেলের মতো তিনিও মনে করতেন যে, সম্পত্তি ব্যক্তিত্বেরই একটি চাহিদা। মানুষের রুচি, কল্পনাশক্তি ও সৃজনসত্তা সম্পত্তির বাহ্য রূপ পরিগ্রহ করে। তবে রবীন্দ্রনাথ লালসার সম্ভাররূপে সম্পত্তিকে দেখেন নি—শাশ্বত সত্তার স্ফুরণে সহায়কস্বরূপ সম্পত্তির প্রয়োজন ও সার্থকতা অনুভব করতেন। কমিউনিজমের বৈপরীত্যে প্রকারান্তরে তিনি সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার সমর্থক ছিলেন। সমবায়ী প্রণালীতে শ্রমজীবীদের নিজ অবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হবার জন্যে তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছেন। সব কিছু বিষয়ে সরকারের উপর নির্ভরতার মনোবৃত্তি তাঁর মতে অসঙ্গত। উৎপাদিত বস্তুর অসম বণ্টন এবং ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদের নীতি-বিবর্জিত মতিগতিকে তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে নিন্দা করেছেন।[৫৫]

ফ্যাসিজম

১৯২৬ সালে মুসোলিনির আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ ইতালি দেশ পরিভ্রমণ করেন। তার আগে মুসোলিনি শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারে বিস্তর গ্রন্থ দান করেছিলেন। সোভিয়েত দেশ দেখবার যেমন "প্রধান লক্ষ্য ছিল আলোর দিক", ইতালিকেও তিনি অনুরূপ দৃষ্টিতে দেখে মুসোলিনির প্রশংসা করেন। সারা ইতালি ঘুরেও সেখানকার বীভৎস রূপ তাঁর চোখে পড়ে নি। ফেরার পথে রোমাঁ রোলাঁ, অধ্যাপক সালভাদোরির স্ত্রী প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝতে পারেন কী চিন্তা ও কর্মপন্থায় ফ্যাসিবাদ সভ্যতা ও মানবতার আমূল পরিপন্থী। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে সেইসময়ে এন্ডরুজকে লিখিত এক পত্রে ফ্যাসিবাদের নগ্ন চিত্র তিনি উদঘাটিত করে দেন। সেইসময়ে তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত ভ্রান্তি নিরসনকল্পে সেই পত্রে তিনি লেখেন—

The methods and the principle of this Fascism concern all

humanity, and it is absurd to imagine that I could ever support a movement which ruthlessly suppresses freedom of expression, enforces observances that are against individual conscience and walks through a blood stained path of violence... That barbarism is not altogether incompatible with material prosperity may be taken for granted but the cost is terribly great—it is fatal [৫৬]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে তাঁর অন্যতম প্রিয়পাত্র সুভাষচন্দ্রের মনে রবীন্দ্রনাথের এই চেতনা আদৌ রেখাপাত করে নি। সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। মুসোলিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্রের আদর্শ। কবি সে-বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি। কবি বিশ্বের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জাতীয়তাবাদীরা সেদিন যুদ্ধের সুযোগে ইংরেজদের হঠাতে চেয়েছিলেন। ব্যতিক্রম ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, মানবেন্দ্রনাথ ও আম্বেদকর, যাঁরা ঐযুদ্ধকে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গির একজন অংশভাক্। একটি চিঠিতে তিনি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন—

এই যুদ্ধে ইংলণ্ড-ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না। ('চিঠিপত্র'। খ. ১১। পৃ. ৩০৫)

বিশ্বজনীনতা

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজনীনতা আজকালকার ফাঁকাবুলির মতো ছিল না। তাঁর চিন্তার পিছনে ছিল সুস্পষ্ট দার্শনিক প্রত্যয়। মানুষকে তিনি চিরন্তন পথিকরূপে দেখেছেন; পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে পথিক পাকা বাসা বাঁধার প্রয়াসী হলে তাকে পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হতে হয়। অন্তরের অসীম অনায়ত্তের অনুসন্ধানে সে ঐ পথের পথিক। উক্ত অনুসন্ধান বৈষয়িক কোনো সুখের দ্বারা তাড়িত নয়; স্বরচিত স্থূল বাধাবিপত্তিগুলিকে অতিক্রম করে অন্তরের নিগূঢ় সত্যকে উদ্ধার তথা জনারণ্যে বৈশ্বিক মানবকে প্রকাশমান করার তাগিদে মানুষ সর্বশক্তি প্রয়োগে উদগ্রীব। মানুষের জীবনসাধনার লক্ষ্য শৃঙ্খলিত আত্মার বন্ধন মোচন দ্বারা মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া—এই সাধনার বিষয়বস্তু হল মানুষ ও তার বিশ্বপরিবেশ। মানুষের জৈব অস্তিত্বের কাল সীমাবদ্ধ, কিন্তু তার মনুষ্যত্বের মেয়াদ সীমাহীন। মানুষ চায় সর্বজনস্পর্শী ও সর্বকালব্যাপী

হতে—সেজন্যে যে-সত্যের প্রকাশ সে কামনা করে তা চিরন্তন ও বিশ্বজনীন। জৈব অস্তিত্বের অতিরিক্ত প্রাচুর্যে মানুষ নিজের স্থূল সত্তা অতিক্রম করে অসীম বৈশ্বিক মানুষে উপনীত হতে চায়।[৫৭] আইনস্টাইনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

My religion is in the reconciliation of the Super-personal Man, the universal human spirit, in my own individual being.[৫৮]

রবীন্দ্রনাথ অনুশোচনা করেছেন যে, চেতনা ও উপলব্ধির অভাবে বৈশ্বিক মানুষের বিকাশ সদাই ব্যাহত হয়। মানুষে মানুষে নৈকট্য সাধিত হলেও তার মধ্যে সৌহার্দ ও সমবায়ী মনোভাব অনুপস্থিত। নৈতিক বিকার মহামারীর মতো পরিব্যাপ্ত। সারা দুনিয়া জুড়ে বিরাজ করছে অসূয়া, লোভ, ঘৃণা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও জাতিবিদ্বেষ। মানুষের এই পাশব শক্তির পরিহার ও আত্মার মুক্তির জন্যে কবি মানবসমাজের উদ্দেশে বলেছেন—

claim the right of manhood to be friends of men and not the right of particular proud race or nation[৫৯]

যে-সময়ে সারা বিশ্ব জাতীয়তাবাদের বিদ্বেষ ও বিভেদ প্রসূত হলাহল পানে উন্মত্ত সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবসমাজকে একই মালায় গাঁথতে চেয়েছিলেন; তিনি এই বলে সতর্ক করে দেন যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে আত্মম্ভরিতা ও দ্বন্দ্ব চলতে থাকলে পরিণামে তা আত্মঘাতী হতে বাধ্য। মানুষের ধর্ম তার ঐক্যের মধ্যে নিহিত। শ্রীঅরবিন্দও সেই একই কথা বলেছিলেন। পৃথিবীটাকে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক রেষারেষি ও কলহের আধার হিসাবে না দেখে মানুষের শাশ্বত আত্মার পবিত্র বাসভূমিরূপে দেখেছেন; হৃদয়গভীর আবেগে তিনি কামনা করেন বিশ্বজনীন মিলন; সেই বিশ্বজনীন মিলনের পথ হল সকল জাতির শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন বিকাশ। বিভিন্ন দেশ ও জাতির মাঝে যে-প্রাচীর গাঁথা হয়েছে তার আশু অপসারণ চাই, যাতে অবাধ সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণে সম্প্রীতি, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সমবায়ী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমরাঙ্গনে মানুষের মনোমালিন্যের নিষ্পত্তির প্রয়াস তার দেউলিয়া মনেরই পরিচয় দেয়।[৬০]

তিনি উপলব্ধি করেন আধ্যাত্মিক বোধ ও অনুভূতির উপর বিশ্বমানবতন্ত্র রচিত হবে। সেজন্য চাই বর্বর রীতিনীতির পরিবর্তে উপযুক্ত আন্তর্জাতিক আইন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা; যাতে ভয়, অবিশ্বাস, বিভেদ, দ্বন্দ্ব ও জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমান অতিক্রম করে শান্তি, মৈত্রী, সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হয়। ভারতের শাশ্বত বাণীর প্রতীক এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সেতুবন্ধরূপে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা তাঁর সেই চিন্তারই নিদর্শন।

আ র্থ নী তি ক চি ন্তা

অর্থনীতির তত্ত্বগত চিন্তা রবীন্দ্রসাহিত্যে বেশি কিছু পাওয়া না গেলেও সে-সম্পর্কে তাঁর কালোপযোগী চেতনা ও সুস্পষ্ট মনোভাব ছিল। তাঁর জীবন-কালে দেশের শিল্পোন্নয়ন ধীর গতিতে দেখা দেয়; প্রধানত অনুন্নত কৃষিকর্মেই দেশের অর্থনৈতিক ধারা ছিল প্রবাহিত। আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের প্রশ্ন স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। অবশ্য সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ কাটিয়ে বুর্জোয়া অর্থনীতির গোড়াপত্তন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই শুরু হয়।

আধা সামন্ততান্ত্রিক বংশোদ্ভূত হলেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারি প্রথাকে সুনজরে দেখেন নি; মনে করতেন ঐ সব কায়েমি স্বার্থান্বিত শ্রেণীর লোকেরাই বিদেশী শাসনকে বাঁচিয়ে রেখেছে; তাছাড়া পূর্বের সামন্ততান্ত্রিক অধিপতিদের শৌর্য-বীর্যের বিন্দুমাত্র পরিচয় সমসাময়িক জমিদার ও রাজন্যবর্গের মধ্যে অবর্তমান বলে তিনি অনুভব করেন; তারা নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত—সমাজের মঙ্গলবিধানে তাদের কোনো চিন্তা নেই। পরাশ্রিত (parasite) এই শ্রেণীর লোকদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন।[৬১] দেশ ও সমাজের নবরূপায়ণ বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে যে সম্ভব নয় সে কথাও তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীই সমাজোন্নয়নের নেতৃত্ব দেবে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা তিনি বলেন নি। ফিউডাল, বুর্জোয়া ও সোসালিষ্ট অর্থনীতির কোনোটিকেই গ্রহণ না করে তিনি চতুর্থ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছেন তা হল সমবায় অর্থনীতি।

আইরিস কবি জর্জ রাসেলের আদর্শে রবীন্দ্রনাথের কিছু আত্মীয়বর্গ সমবায় প্রথার রূপায়ণে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের অনুগামীরূপে ঐ প্রথাকে তত্ত্বগতভাবে প্রচার ও কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগে তিনি তৎপর হন। সোভিয়েত দেশ ভ্রমণেও তিনি সেই আদর্শের আংশিক প্রেরণা লাভ করেছিলেন। শ্রীনিকেতন কবির সেই প্রচেষ্টার নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে, দুঃখ দারিদ্র্য রোগ ও নিরানন্দ জীবন থেকে সমবায় প্রথার সাহায্যে মুক্তি পাওয়া যায়। 'সমবায়নীতি' পুস্তিকার প্রথম অধ্যায়ে তিনি লিখেছেন—

> আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর সকল দেশেই এই প্রণালী একদিন বড়ো হইয়া উঠিবে। এখনকার দিনে ব্যবসা বাণিজ্যে মানুষ পরস্পর পরস্পরকে জিতিতে চায়, ঠকাইতে চায়; ধনী আপন টাকার জোরে নির্ধনের শক্তিতে শস্তা দামে কিনিয়া লইতে চায়; ইহাতে করিয়া টাকা এবং ক্ষমতা কেবল এক এক জায়গাতেই বড়ো হইয়া উঠে এবং বাকি জায়গায় সেই বড়ো টাকার আওতায় ছোট শক্তিগুলি মাথা তুলিতে পারে না।

কিন্তু সমবায়-প্রণালীতে চাতুরি কিম্বা বিশেষ একটা সুযোগে পরস্পর পরস্পরকে জিতিয়া বড়ো হইতে চাহিবে না। মিলিয়া বড়ো হইবে। এই প্রণালী যখন পৃথিবীতে ছড়াইয়া যাইবে তখন রোজগারের হাটে আজ মানুষে মানুষে যে একটা ভয়ংকর রেষারেষি আছে তাহা ঘুচিয়া গিয়া এখানেও মানুষ পরস্পরের আন্তরিক সুহৃদ হইয়া, সহায় হইয়া মিলিতে পারিবে।[৬১]

অর্থনীতির ক্ষেত্রেই শুধু আবদ্ধ না রেখে সমবায়নীতিকে তিনি সর্বব্যাপী ও সুসংবদ্ধ সামাজিক কাঠামোর বনিয়াদরূপে কল্পনা করেন; সর্বক্ষেত্রে সংঘাতের পরিবর্তে চান সহযোগিতা—বিভেদ ও শোষণের পরিবর্তে সমবায়। সমবায়ের মধ্যে দিয়েই ধন-বৈষম্য ও শোষণ বিদূরিত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। তবে সেইসঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করতেন যে "শক্তি উদভাবনার জন্যে অহমিকা ও প্রতিযোগিতার প্রায়াজন আছে"।[৬২] অবশ্য পরিমাণ লঙ্ঘনকারী সেই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে বিধিসম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেছেন। আর্থিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে "ধর্মের দোহাই বা গায়ের জোরের দোহাই এই দুয়ের কোনোটাই মানব-সমাজের দারিদ্র্য-মোচনের পন্থা নয়" বলে তিনি মনে করতেন। রক্তঝরা বিপ্লব পরিণামে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিবোধকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। এ বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির মিল দেখা যায়।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; এখানকার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রধানত কৃষিকর্মের উন্নয়নেই যে নির্ভর করছে সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যথোচিত অবহিত ছিলেন। কৃষি-অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জমির মালিকানা প্রসঙ্গে তিনি মনে করতেন যে, শুধু জমিদারি প্রথার অবসানে এ-সমস্যার সমাধান হবে না: জমির অবাধ হস্তান্তরের অধিকার কৃষকের থেকে গেলে দারিদ্র্যহেতু ক্রমে সমস্ত জমি মহাজন ও জোতদারের কুক্ষিগত হয়ে পড়বে। তাই লাঙল যার জমি তার এ-নীতিকে সাবধানতার সঙ্গে রূপায়িত করা উচিত বলে তিনি মনে করতেন। কৃষিকর্মে সমবায় প্রথার সঙ্গেই উন্নত প্রণালীতে উৎপাদনের তিনি সমর্থক ছিলেন। শ্রমের লাঘব ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কৃষিতে যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন চাইতেন। গ্রামীণ সংস্কৃতি, কুটিরশিল্প ও সমবায় প্রণালীতে গুরুত্ব দিলেও ভারী শিল্পোন্নয়নেও তিনি সমধিক উৎসাহী ছিলেন। গান্ধীর চরকানীতি এবং গ্রামনির্ভর অর্থনীতির সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আধুনিক ও যুক্তিবাদী—দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নগর ও গ্রামীণ জীবনের ভারসাম্য বিকাশই ছিল তাঁর কাম্য। গ্রামে ফিরে চল নীতিকে তিনি গ্রহণ করেন নি।

বিদেশী শাসকদের যোগসাজশে দেশীয় পুঁজিপতিদের একচেটিয়া স্বত্বে সাধারণ মানুষের যে দুরবস্থা ঘটবে সে বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। রাজস্ব

বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার আমদানিকৃত পণ্যের উপর শুল্ক বসাতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বহুপূর্বে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন—

দেশীয় কলওয়ালা এবং রাষ্ট্রনীতিকেরা গভর্ণমেণ্টের এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিলেন, তাঁহাদের বক্তব্য এই যে শুল্ক স্থাপিত হইলে দেশীয় শিল্পের সুবিধা হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে ইহার ফলে কাপড়ের দাম চড়িবে এবং সেই চড়া দাম বস্ত্রক্রেতা দিবে, ব্যবসায়ী দিবে না।[৬৪]

মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বিপুল বিত্তের সঞ্চয় ও মুনাফাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মনুষ্যত্বের অবনতি সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। পারস্পরিক বিশ্বাস, সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবসান ঘটানো ছিল তাঁর কামনা। তাঁর মতে বিত্তবণ্টন ও ত্যাগের সাহায্যে ধনবৈষম্য দূরীকৃত করা বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ তিনি চাইতেন না।[৬৫]

প্রাক-স্বাধীন আমলে মনে করা হত যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন রাজনৈতিক মুক্তি ব্যতীত সম্ভব নয়—সেজন্যে রাজনৈতিক আন্দোলনকালে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগঠনমূলক প্রচেষ্টা বিশেষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল স্বতন্ত্র। সমাজ সংস্কারের অঙ্গস্বরূপ তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর মতে আর্থিক ও সামাজিক সংস্কারের মধ্যে দিয়ে জনচেতনাকে দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন না করে ধর্মান্ধ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের ঘাড়ে রাজনৈতিক আন্দোলন চাপিয়ে দিলে তা নিষ্ফল হবে।

শিক্ষাচিন্তা

রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা কেবল লেখা ও ভাবনার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে হাতেকলমে প্রযুক্তও হয়েছে। দূর থেকে মূলনীতি নির্দেশ ও উপদেশ বর্ষণ না করে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছিলেন। মননের বিকাশ, সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক থেকে সেই ব্যবস্থা রচিত হয়।

কবির দৃষ্টিতে মানুষের মুক্তির প্রকৃত রূপ হল, অবিদ্যা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি। জ্ঞান ও সত্যের উপলব্ধি ও পরিপূর্ণ জীবনলাভের জন্যে শিক্ষা অপরিহার্য। অবিদ্যাপ্রসূত যাবতীয় বন্ধনমোচন একমাত্র জ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব।[৬৬]

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার যাবতীয় গলদের প্রধান কারণ হল যে সেটা জীবন ও সমাজের সঙ্গে প্রকৃত অর্থে যুক্ত নয়। কবির শিক্ষাতত্ত্ব তাঁর জীবনদর্শনেরই

অঙ্গ। প্রকৃত শিক্ষার অভাবেই মানুষের জীবনে নৈরাশ্য দেখা দেয়—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন হয়ে পড়ে শূন্য—জীবন হয়ে দাঁড়ায় অর্থহীন।

মনের বিকাশ ও মার্জিত সমাজাচারের জন্যেও শিক্ষার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বজ্রআঁটুনিতে শিশুমনকে রুদ্ধ করা হয়। শৈশব থেকে যে শিক্ষা শুরু হয় তার পরিবেশ স্বাধীন, দরদী ও ভাবোদ্দীপক হওয়া চাই। ছোটবেলা থেকে নানা নিয়মনিগড় ও সিলেবাসের নিষ্পেষণে শিশুমনের নাভিশ্বাস ওঠে। আনন্দের পরিবর্তে শিক্ষাব্যবস্থা তাদের কাছে হয়ে দাঁড়ায় আতঙ্কের বিষয়। শান্ত সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল মন গড়ার জন্যে তিনি চাইতেন অনুকূল মুক্ত পরিবেশ। মানবিক ব্যক্তিত্বের আদর্শেই তাঁর শিক্ষানীতি রচিত হয়।[৬৭]

পুঁথিগত বিদ্যা ও অর্থকরী শিক্ষায় তাঁর উৎসাহ ছিল না। বিদ্যার্থীর সুস্থসবল মন, সক্রিয় স্বভাব, মার্জিত আচরণ ও জানার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলে, দায়িত্বে ও কর্তব্যে আদর্শ নাগরিকরূপে তিনি তাদের গড়ে তোলার প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিত্বের চরম উৎকর্ষ দানই বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত। জাতি, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সমষ্টিগত প্রয়োজনের ছাঁচে শিক্ষাদানের তিনি বিরোধী ছিলেন। নাগরিক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যের চেতনা অবশ্যই সঞ্চারিত করা দরকার—তারই সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে ব্যক্তিমানুষের রুচি ও ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীন বিকাশ ও প্রকাশের সুযোগ থাকা দরকার। জনৈক শিক্ষাব্রতীকে তিনি এক পত্রে লেখেন—

> বিদ্যালয়ে শিশুকাল থেকে আমরা বাঁধা খোরাকে অভ্যস্ত হই বলে আমাদের মননশক্তির সজীবতা হারাই—বুদ্ধির ক্ষেত্রে নিজেরা চরে খাবার অভ্যাস যারা না করে তাদের চিত্ত কোন কালে সবল হয় না। তোমরা গয়লার কাজ ছেড়ে দিয়ে রাখালের কাজ কোরো।[৬৮]

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। তাতে বলেছেন বিদেশী ভাষার মাধ্যম আদৌ কার্যকর নয়। ইংরেজি ভাষাশিক্ষাকে তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকলেও সাধারণ ও প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা এদেশে অনুপযোগী ও শিক্ষাবিস্তারের অন্তরায় বলে মনে করতেন। জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় না রেখে শিক্ষাকালে কতকগুলি বাঁধা কথা ও শব্দ মুখস্ত করানোর রীতি তাঁর মতে খুবই ক্ষতিকর।

অধীত বিদ্যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের আদর্শ ও কাজেরও কোনো মিল না থাকায় পরিণত জীবনে নতুন ও জটিল অবস্থা ও সমস্যার সামনে লোকে অসহায় হয়ে পড়ে। দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে তিনি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় (১৯০১) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সমকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেও তিনি মূলত ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করতেন—তাতে ভারতীয় সমাজমনের প্রতিফলন দেখা যায় না। সেখানে ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীন চিন্তাশক্তিরও উন্মেষ ঘটে না; রুচিবোধ ও সৃজনীসত্তারও

বিকাশ হয় না। এদেশে পশ্চিমের প্রভাব কেবল মস্তিষ্কেই ঘটেছে, এখানে তার হৃদয়ের স্পন্দন ধ্বনিত হয় নি। অথচ হৃদয়ই সুকুমার বৃত্তি ও সংস্কৃতির উৎস। নানা দেশ ও জাতির মিলন এবং চিন্তার আদানপ্রদানের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈচিত্র্যময় সত্যোপলব্ধির মধ্যে দিয়ে মানুষের মনকে জানা ; প্রাচ্য সংস্কৃতির ঐক্যগত বিভিন্ন ধারার অধ্যয়ন ও গবেষণার সাহায্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন ; প্রাচ্যের জীবন ও মননের সেই ঐক্যের মনোভাব নিয়ে পশ্চিমের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং উভয় গোলার্ধের মানবমনে শান্তি ও স্বাধীন চিন্তার মিলনক্ষেত্র গড়ে তোলা।

সোভিয়েত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে চমৎকৃত করে। সেখানকার জনশিক্ষার উদ্যোগ-আয়োজন এবং সুদীর্ঘকালের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অগণিত মানুষের মানবিক অস্তিত্বের প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের জ্ঞানবিস্তারের প্রয়াসকে তিনি অকুণ্ঠচিত্তে অভিনন্দিত করেন। পরে অবশ্য একথাও বলেছিলেন যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সেখানকার মানুষগুলিকে একই ছাঁচে গড়ে তোলার পদ্ধতি তাদের ক্রমে যান্ত্রিক ও নিষ্প্রাণ করে তুলবে, স্বাধীন মন ও চিন্তাশক্তি খর্ব হবে।[১৮]

ভারতে দীর্ঘকালীন যাবতীয় দুর্গতির কারণস্বরূপ তিনি শিক্ষার অভাবকেই অভিযুক্ত করেন। মুক্ত আকাশের নীচে পড়াশুনা, বজ্রকঠিন নিয়মনিগড়ের অবসান, প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান, পরীক্ষার উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব না দেওয়া, অধ্যয়নকালে বৈচিত্র্য ও কৌতূহল-প্রবণতায় উৎসাহ দান, ভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের সুযোগ, সৃষ্টিকর্মে সহায়তা, বিশ্বজনীন মনোভাব গঠন ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এ-সব বিষয়ে তাঁর উপর বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও কেশবচন্দ্রের প্রভাব লক্ষণীয়। তাঁর সরল নিরাড়ম্বর শিক্ষার এই পদ্ধতি প্রাচীন তপোবনের আদর্শে রচিত হয়েছিল।

অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গান্ধীর নির্দেশানুযায়ী শিক্ষাক্ষেত্র পরিত্যাগকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেন নি। 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে তিনি শিক্ষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সংমিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা দর্শিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষার পরিবেশকে তিনি রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝা এবং গতানুগতিক ছাত্রবিক্ষোভ থেকে মুক্ত রাখতেন।

গ্রামীণ ও সমষ্টি উন্নয়নের যে পরিকল্পনা ইদানীং এদেশে রূপায়িত হয়েছে তার উদ্ভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা বহু পূর্বেই তিনি করেছিলেন তাঁর শ্রীনিকেতন পল্লীশিক্ষাকেন্দ্রে। গ্রামীণ সংযোগ, গ্রামবাসীদের আত্মনির্ভরতা, সমবায় প্রথায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ এই কেন্দ্রটি শান্তিনিকেতনের অদূরে এক গ্রামে পত্তন করেন।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বের চোখে আধুনিক ভারত যে-দুটি মানুষের নামে পরিচিত তাঁরা হলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। যদিও দুজনেই ছিলেন ভারতের সনাতন ধারার অনুরাগী, তাহলেও দুজনের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। উপনিষদের সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ দাদু, কবীর ও নানকের ধারা বহন করেছেন। অপরদিকে গীতার একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী গান্ধী তুলসীদাসের পথ অনুসরণ করেন। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নীতি ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে সর্বাধিক প্রাধান্য দেন এবং সর্ববিধ শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্য, শক্তিমত্ততা ও হিংসাবৃত্তিকে নিন্দা করেন। দুজনেই ভারতের গ্রামীণ জীবন ও কৃষিকর্মকে গুরুত্ব দিয়েছেন। দুজনেই শহর থেকে দূরে প্রাকৃতিক পরিবেশে আশ্রম গড়েছেন এবং কৃষি ও কুটিরশিল্পের প্রসারে যত্নবান হয়েছেন। দুজনেই ছিলেন বিকেন্দ্রিত প্রশাসনের পক্ষপাতী। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধী সংগ্রামী পথ অনুসরণ করেন, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রমানস ছিল সংগ্রামবিমুখ।

গান্ধীর নিষ্ঠা, সততা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও মানবপ্রেমিকতার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অন্তর থেকে যেমন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তেমনি 'সত্যের আহ্বান', 'সমস্যা', 'চরকা'. 'স্বরাজ সাধন' প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি গান্ধীকে কঠোর সমালোচনাও করেছেন। খিলাফৎ, চরকা, অসহযোগ. পশ্চিমী বিদ্বেষ, ঐশী প্রেরণা, জাতীয়তাবাদ. জীবনবিমুখতা, আত্মনিগ্রহ প্রভৃতি বহু বিষয়েই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর সমালোচনা করেন। গান্ধী ১৯৩৪ সালে বিহার ভূমিকম্পের পিছনে অস্পৃশ্যতাজনিত পাপকেই কারণস্বরূপ দেখেছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ সেই ব্যাখ্যার তীব্র সমালোচনা করেন।

দুজনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। কারণ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শিল্প ও সুন্দরের সাধক। সমন্বয়ই ছিল তাঁর চিন্তার মর্ম। পশ্চিমী শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তিনি বর্জন করেন নি। অপরদিকে গান্ধী ছিলেন রক্ষণশীল। পশ্চিমী সভ্যতাকে তিনি অন্তঃসারহীন, বাহ্যজীবনসর্বস্ব ও জড়বাদী বলে মনে করতেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমী ধারার প্রতি বহুলাংশে আকৃষ্ট হন। তলস্তয় ও রাস্কিনের চিন্তায় গান্ধী প্রভাবিত হন। দারিদ্র্যকে তিনি মহত্ব দান করেছেন। যিশুর মতো তিনিও দারিদ্র্যের ছাড়পত্র নিয়ে রামরাজ্যে প্রবেশাধিকার চান। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ দেশের মাটি ও তার পর্ণকুটিরকে মর্যাদা দিয়েছেন—জীবনকে মুক্তির মানদণ্ডে আধুনিক ভারসাম্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছেন। দারিদ্র্যকে তিনি জয় করতে চেয়েছেন, বরণ করতে নয়।

গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই আধ্যাত্মিক সুরে মানবতন্ত্রের জয়গান করেন। গান্ধী ভোগবিরোধী ও জীবনবিমুখ ছিলেন , সেদিক থেকে কবির দৃষ্টিভঙ্গি

ছিল ইহমুখী। গান্ধী সত্যের তাগিদে অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন ও শহিদের পথ বেছে নেন। রবীন্দ্রনাথ সমন্বয় ও সহিষ্ণুতার পথে সৃষ্টিধর্মী সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ভারতের একটি অলংকার, অঙ্গ নন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেশের জনমানসে কবি যে-প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি সেরূপ স্বীকৃতি পান নি। তাঁর রচিত গান যদিও আজ দেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ভারতীয়েরা গ্রহণ করে নি। ভাষা, প্রদেশ, ধর্ম ও জাতীয়তার ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতাই তার প্রমাণ। রাজনীতি কবিমনের বিচরণক্ষেত্র ছিল না, তাহলেও আধুনিক বিশ্বের রাষ্ট্রদর্শনের ভাণ্ডারে তাঁর অবদান অসামান্য।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রদর্শন তাঁর আধ্যাত্মিক মানবতাবাদী দর্শনের অঙ্গ। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের পরিবর্তে তিনি মানুষকে শাশ্বত সৃজনশীল পরম সত্তার আধারস্বরূপে নিরন্তর সৃষ্টি ও আনন্দের প্রতীকরূপে কল্পনা করেছেন। বিভেদ, বিদ্বেষ, শক্তিমত্ততা, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি যাবতীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি সাম্য, মৈত্রী ও সমন্বয়কারী যে সমাজদেহের কল্পনা করেন তার উৎস ছিল তাঁর সেই মানবতন্ত্রী দর্শন। ভীত, ত্রস্ত, মানবসমাজকে তিনি প্রেমের অভয়-বাণী শুনিয়েছেন। মূলত তিনি ছিলেন শিল্পী; জাত্যভিমানের পরিবর্তে সহজাত সৃজনশক্তির পরিপূর্তি ও প্রকাশের জন্যে তিনি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন; জয়গান গেয়েছেন শান্ত, শিব ও সুন্দরের।

প্লেটো ও গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় মিল যে তিনিও তাঁদের মতো রাজনীতিকে নৈতিকতার দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। আশু রাজনৈতিক কার্যকারিতার তাড়নায় যে-কোনো উপায় অবলম্বন বা সুবিধাবাদী ও অশুভ পথ অনুসরণের তিনি বিরোধী ছিলেন। নীতিকে বিসর্জন দেওয়া এযুগের এক ভয়ংকর প্রবণতা; বিজ্ঞান সেখানে ব্যর্থ। তাই রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিকাশকেই অবলম্বন করতে চেয়েছেন। তাঁর দৃষ্টিতে সমষ্টির নামে ব্যষ্টির অবদমন সভ্যতার অন্তরায়; গণতন্ত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেই জাতির শক্তি ও সম্ভাবনা নির্ভর করে। যুক্তিবহ চিন্তা ও নীতিনির্ভর আচরণ ইতিহাসেরই শিক্ষা; অন্যথায় দেখা গিয়েছে রাষ্ট্রজীবনে ন্যায়নীতির বিসর্জন ভীষণাকারে প্রত্যাগত হয়ে নির্বিচারে সকলকেই শাস্তিদান করে, ব্যষ্টি বা গোষ্ঠী কেউই রেহাই পায় না। রবীন্দ্রনাথ তাই কেবল অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদেরই অন্যায়ের পথ ত্যাগ করতে বলেন নি, উপরন্তু এদেশের সন্ত্রাসবাদীদের সে-পথ

পরিহারের আবেদন জানান। নীতিবিবর্জিত রাজনীতিতে তাঁর আদৌ রুচি ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের নিন্দায় তিনি যেমন সরব ছিলেন, তেমনি জাতীয়তাবাদী অন্ধ আবেগেরও অনুরূপ নিন্দা করেছেন।

উগ্র, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে রবীন্দ্রনাথ তীব্র কষাঘাত করেছেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে তাঁর এই মনোভাব কিছুটা কবিসুলভ—জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা সেখানে উপেক্ষিত। তাঁদের মতে জাতীয়তাবাদকে সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তুলনা করা অনুচিত; জাতীয়তাবাদের শুভ দিকও আছে; জাতীয়তাবাদ সামন্ততন্ত্র থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছে; স্বেচ্ছাচারী সাম্রাজ্যবাদেরও প্রতিষেধক হল এই মতবাদ; সুপ্ত ভাবাবেগেরও উৎস জাতীয়তাবাদ; সেই মতবাদইতো মানুষকে শ্রেণী, গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে উন্নীত করেছে। সেইসব সমালোচকের মতে জাতীয় ধন, ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্য ব্যতিরেকে বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীন মহানুভবতা ফাঁকাবুলির সামিল।

রবীন্দ্রনাথ সমাজকে রাজনীতির উপর স্থান দিয়েছেন। হবহাউস, ম্যাকাইভার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিকরাও সামাজিকতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বস্তুত রাজনীতি সমাজেরই একটি ক্রিয়া। একথা ঠিক যে, আজকের দিনে পার্টি-পলিটিক্‌স ও রাষ্ট্রক্ষমতা-দখল একটা নোংরামিতে পর্যবসিত হয়েছে—সেখানে সুরুচি, সহিষ্ণুতা, নৈতিকতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উপেক্ষায় পরিণত। সেজন্যে হয়তো অন্যান্য অনেক দার্শনিকের মতো তাঁরও রাজনীতিতে নিস্পৃহতা জাগে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতবাসীরা নগর থেকে দূরে অবস্থান করে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও উত্তাপকে এড়িয়ে চলত। রাজনীতি ছিল মুষ্টিমেয় রাজন্যবর্গের কাজকারবার। কিন্তু বর্তমানকালে সমাজ ও জীবনের সঙ্গে রাজনীতি অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। রাজনীতির প্রতি তাই নিস্পৃহ নিশ্চেতন মনোভাব নিজেরই পক্ষে ক্ষতিকর। সেজন্যে প্রয়োজন রাজনীতির সঠিক পথনির্ধারণ।

সমাজের উপর এই গুরুত্বদানের অর্থ রাষ্ট্রের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশকে তিনি কেবল নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, অরবিন্দ প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের মতো রবীন্দ্রনাথও মাতৃত্বের ব্যঞ্জনায় দেশের উপর পরমত্ব আরোপ করেছিলেন। জীবনের প্রথম দিকে তাঁর মধ্যেও ধর্ম ও জাতীয়তার ভেদবুদ্ধি দেখা যায়। অবশ্য তিনি তা কাটিয়ে ওঠেন। ইতিহাসের ব্যাখ্যায় তিনি ইউরোপীয় সভ্যতা বিরোধমূলক ও ভারতীয় সভ্যতা মিলনমূলক বলে চিহ্নিত করেছেন। ঠিক এইভাবে কোনো সভ্যতা বা সংস্কৃতিকে অপরিবর্তনীয় বলা যায় না; বস্তুত প্রত্যেক দেশের সামাজিক ধারায় জীবনের উপযোগী আচারগত বৈশিষ্ট্য থাকে। আর

ভারতীয় সভ্যতায় যথেষ্ট হানাহানি ও বিরোধের পরিচয়ও পাওয়া যায়।

রামমোহন ও দ্বারকানাথের উত্তরসাধক রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন দেশকে ভিক্ষানীতি ছাড়াতে আর দেশবাসীকে সমাজের সঙ্গে যুক্ত করতে—সে-সমাজ হল স্বদেশী-সমাজ বা পল্লীসমাজ, অভিজাত শ্রেণী-শাসিত সমাজ নয়। ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে তাঁর মনে ইংরেজের লিবার্যাল আদর্শ সঞ্চারিত হয়েছিল; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারী রূপ তাঁর সেই আদর্শে অনাস্থা সৃষ্টি করে।

তিনি চিরকালই রাষ্ট্রীয় আন্দোলন অপেক্ষা গঠনমূলক কর্মসূচির উপর অধিক বিশ্বাসী ছিলেন; নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবি কিংবা ক্ষমতা অর্জনকে বড় করে দেখেন নি। স্বরাজ ও স্বাধীনতার প্রয়োজন সম্পর্কে যথোচিত অবহিত থেকেই তিনি অনুভব করেন যে জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের শিক্ষা ও চেতনা না থাকলে স্বাধীনতা পাওয়াও যেমন কঠিন, তেমনি স্বাধীনতা পেলেও তা নিষ্ফল হবে। স্বাধীনতা বাইরে থেকে পাওয়া যায় না, জাগ্রত ব্যক্তিত্বের বুদ্ধি, অনুভূতি ও সক্রিয় ইচ্ছার সাহায্যে তা অর্জন করতে হয়। কিন্তু রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে প্রকাশ্য আন্দোলন ও সংগ্রামেরও যে-প্রয়োজন থাকে কবি সে বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন নি।

ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আইরিশ জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতির বেশ প্রভাব দেখা যায়। পার্নেল, ডি ভ্যালেরা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের আদর্শ এবং 'সিন ফিন' কর্মপদ্ধতি অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করে। অপরদিকে আয়ার্ল্যান্ডের জর্জ রাসেল, হরেস প্ল্যাঙ্কেট প্রমুখ নেতৃ-বৃন্দের গ্রামীণ সংগঠনচিন্তা ও সমবায় আন্দোলন রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

বলা হয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কবি, রাষ্ট্রনায়কের সংগ্রামী ভূমিকা তাঁর জীবনে দেখা যায় না। কথাটি যদি রাজনৈতিক দলাদলি, ক্ষমতাদখল, চরকাকাটা আর সংকীর্ণ দেশপ্রেমিকতার অর্থে বলা হয় তাহলে তাঁর রাষ্ট্র-নায়কের কোনো ভূমিকা নেই। বস্তুত কবিত্ব জীবন ও সমাজেরই একটি অঙ্গ। কবিও একজন মানুষ ও সামাজিক জীব। তাঁর নিরঙ্কুশ আত্মপ্রকাশের জন্যে গতিশীল সমাজ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকে। মানুষের সহজাত সৃষ্টি-শক্তির বিকাশ অর্থাৎ শিল্পিমনের প্রকাশ ও তার উপভোগ যাবতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বন্ধনে যে অসম্ভব এ-চেতনা তাঁর চিন্তায় সুপরিস্ফুট। কবি তাঁর সাধনায় নেতিবাচক সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে শিক্ষাবিস্তার, সমবায় সংগঠন, হাসপাতাল পরিচালনা, পুকুর কাটানো প্রভৃতি যাবতীয় কল্যাণকর্মে নিজের নিষ্ঠাকে প্রমাণিত করেন। উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, নিজের আদর্শ অনুযায়ী দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করা।

ফ্যাসিজমের জন্মের বহু আগেই কবির 'ন্যাশন্যালিজম' গ্রন্থটি প্রকাশিত

হয়েছিল। আজকাল সাধারণত যাকে Totalitarianism বলা হয়ে থাকে কবি সে-সময়ে তা 'Statism' নামে অভিহিত করেন। রাষ্ট্রসর্বস্বতার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম ধ্বনি তুলেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ একই। তিনি তার কোনো অর্থনৈতিক বিচারবিশ্লেষণ না করলেও ওজন তার কিছু কম নয়।

ভারত বৈদেশিক শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ বাহ্যত কিছু গৃহীত হয়েছে। ভারতের গ্রামীণ সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েতী প্রশাসন, সমবায় প্রথার বিস্তার ইত্যাদি তারই প্রমাণ। কিন্তু উক্ত ব্যবস্থাদিও প্রলেপ দিয়ে রোগ ঢাকার মত হয়ে চলেছে। প্রকৃত রোগ নিরাময়ের কোনো লক্ষণ নেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রেরই রূপ নৈরাশ্যজনক। লব্ধ স্বাধীনতা ফলপ্রসূ হয় নি। মানুষ যে তিমিরে ছিল সেখানেই রয়েছে। এর কারণ মানুষের যথোচিত শিক্ষা ও চেতনার প্রশ্ন অবহেলিত রয়েছে। জনজীবনে অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, স্বার্থবুদ্ধি ও মানসিক জড়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অথচ তাঁর নামে দেশে ঘটার অন্ত নেই। গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি উপভোগের সঙ্গে তাঁর ভাবুক জীবনকে যদি কবির অনুরাগীরা অনুধ্যান ও তাঁর আদর্শকে সাধ্যমত রূপ দেবার প্রয়াসী হন তাহলে দেশের বর্তমান অনভিপ্রেত গতির মোড় ফেরানো সম্ভব হয়। কবি কর্তৃক প্রদর্শিত পথে শুধু ভারতই নয়, সারা বিশ্বের মানবসমাজ পারস্পরিক বিশ্বাস, সামঞ্জস্য ও শান্তির সন্ধান লাভ করতে পারে।

উৎস নির্দেশ

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক'। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১। পৃ ৪৫।

২. প্রফুল্লকুমার সরকার। 'জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ'। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। পৃ ২৬।

৩. অমল হোম। 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। পৃ ৮১।

৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনকথা'। ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ। পৃ ১৬২।

৫. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১৩। পৃ ৩৫৯। ('কালান্তর')

৬. তদেব। পৃ ৩৮২।

৭. তদেব। খণ্ড ১৪। পৃ ৭৫৩।

৮. হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রদর্শন'। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। পৃ ৫৪।

৯. তদেব। পৃ ৩১।

১০. Rabindranath Tagore. *Personality: Lectures delivered in America*. 1959. p. 65.

১১. *Ibid*. p. 74.

১২. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958. p. 15. (Hibbert Lectures)

১৩. Rabindranath Tagore. *Creative Unity.* 1959. p. 32.

১৪. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958. p. 235.

১৫. *Ibid.* pp. 112-113.

১৬ Rabindranath Tagore. *Sadhana.* 1957. pp. 98-100.

১৭. Rabindranath Tagore. *Personality.* 1959. p. 32.

১৮. *Ibid.* p. 70.

১৯. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958. pp. 92, 102, 236.

২০. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ২। পৃ ২৯১। ('গীতাঞ্জলি') এবং খণ্ড ১২। পৃ ৬১২। ('মানুষের ধর্ম')

২১ Rabindranath Tagore. *Nationalism.* 1917. p. 13.

২২. Rabindranath Tagore. *Sadhana.* 1957. pp. 33-34.

২৩. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958 pp. 25-28.

২৪. Rabindranath Tagore. *Nationalism.* p. .28.

২৫. *Ibid.* p. 25.

২৬. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১৩। পৃ ১৫৪-১৫৫। ('পরিচয়')।

২৭. Rabindranath Tagore. *Sadhana.* 1957. p. 85.

২৮ Rabindranath Tagore. *Nationalism.* 1917. pp. 19-20.

২৯ Rabindranath Tagore. *Creative Unity.* 1959. pp. 21-22.

৩০. *Ibid.* p. 96

৩১. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১২। পৃ ৬৯৭। ('স্বদেশী সমাজ')

৩২. তদেব। পৃ ৭০৩।

৩৩ Rabindranath Tagore. *Sadhana* 1957. pp 18-19.

৩৪. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১০। পৃ ৭৩০। ('রাশিয়ার চিঠি')

৩৫. তদেব। খণ্ড ১২। পৃ ১০২৫। ('ভারতবর্ষ ও স্বদেশ')

৩৬. তদেব। পৃ ৬১৩। ('মানুষের ধর্ম')

৩৭ Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958. pp. 183-185.

৩৮. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১৩। পৃ ২৩৩। ('কর্তার ইচ্ছায় কর্ম')

৩৯. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man.* 1958. Ch. 13.

৪০. Rabindranath Tagore. *Creative Unity.* 1959. pp. 144-145.

৪১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। "দণ্ডনীতি"। 'প্রবাসী'। আশ্বিন, ১৩৪৪।

৪২. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১৩। পৃ ৩৪২। ('স্বরাজ সাধন')।

৪৩. তদেব। পৃ ৩৪৩।

৪৪ Rabindranath Tagore. *Letters to a friend.* 1928. p. 80.

৪৫. Rabindranath Tagore. *Creative Unity.* 1959. pp. 38-39.

৪৬. Rabindranath Tagore. *Nationalism* 1917. p. 28.

৪৭. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১২। পৃ ৮৮৪। ('সমূহ')

৪৮. Rabindranath Tagore. *Nationalism.* 1917. p. 58.

৪৯. *Ibid.* p. 70.

৫০. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। খণ্ড ১৩। পৃ ৩০৩। ('কালান্তর')
৫১. তদেব। খণ্ড ১০। পৃ ৭০৪। ('রাশিয়ার চিঠি')
৫২. তদেব।
৫৩. তদেব। পৃ ৭১৭।
৫৪. তদেব। পৃ ৭২৮-৭২৯।
৫৫. তদেব। পৃ ৭৩১-৭৩২।
৫৬. *The Visva-Bharati Quarterly*. V. 4. No. 3. October, 1926. p. 276.
৫৭. Rabindranath Tagore. *Man*. 1937. pp. 42-48.
৫৮. Rabindranath Tagore. *The Religion of Man*. 1958. Appendix.
৫৯. *Ibid*, p. 163.
৬০. 'রবীন্দ্র রচনাবলী' খণ্ড ১৩। পৃ ২১৬। ('কালান্তর')
৬১. তদেব। পৃ ৪২৯। ('সমবায়নীতি')
৬২. তদেব। পৃ ৪১৮।
৬৩. তদেব। পৃ ৪২৯।
৬৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক'। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১। পৃ ৩৭৯
৬৫. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮। খণ্ড ১০। পৃ ৬৯০। ('রাশিয়ার চিঠি')
৬৬. Rabindranath Tagore. *Sadhana*. 1957. pp. 72-74.
৬৭. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১১। পৃ ৫৩৩। ('শিক্ষা')
৬৮. অনাথনাথ বসু। 'গ্রন্থাগার'। সম্মেলন সংখ্যা, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। (৮ম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ)
৬৯. 'রবীন্দ্র রচনাবলী'। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ। খণ্ড ১০। পৃ ৬৭৬। ('রাশিয়ার চিঠি')

দুই. জাতীয়তাবাদী ও সমাজতন্ত্রী ভাবনা

পরিপ্রেক্ষিত

বিভিন্ন দেশের ও বিশ্বরাজনীতির বহু যুগান্তকারী ঘটনার পিছনে জাতীয়তাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শ হিসেবে কাজ করেছে। তার উৎপত্তির ইতিহাস যেমন জটিল, বিকাশও তার ঘটেছে তেমনি বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী গতিপথে। জাতীয়তবাদের ইতিহাসে একদিকে দেখা যায় ত্যাগ, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের মহৎ কীর্তি; আবার অন্যদিকে অন্ধ আবেগ, নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা।

জাতি থেকেই জাতীয়তাবাদ—জাতির ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ন্যাশ্যান্যালিটি' ও 'নেশন'—দুই-ই হতে পারে। প্রথমটি জাতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে কোনো জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত লোকেদের পারস্পরিক সংযুক্ত থাকার ইচ্ছা ও আবেগ থেকে গড়ে ওঠে; সেটা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মিশ্রণে একটা নেশন হিসেবে রাজনৈতিক অভিধা লাভ করে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেখা দেয় নেশন-স্টেট; ন্যাশন্যালিজম বা জাতীয়তাবাদ হল তার ভাবগত পশ্চাৎপট।

ইউরোপে মধ্যযুগ থেকে এক এক অঞ্চলের স্বাধীন শক্তিশালী নৃপতির অধীনে জনগোষ্ঠীর সংযুক্ত থাকার প্রবণতা দেখা দেয়। রেনেসাঁসের বিভিন্ন পর্বে জাতীয়তাবাদী ভাবনা ক্রমে অংকুরিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে যখন মানবাধিকার নীতি স্বীকৃতি পায়, তখন থেকে লোকের আস্থা, অনুরাগ ও আনুগত্য রাজার পরিবর্তে রাষ্ট্রের উপর বর্তাতে শুরু করে। বিপ্লব--উত্তরকালে নেশন-স্টেটের সত্তা ও প্রভাব ক্রমে বেড়ে ওঠে। বিপ্লব-উত্তর ইউরোপে শিল্প-সাহিত্য-দর্শনে যে রোমান্টিক আদর্শ উদ্ভূত হয়েছিল তার মর্ম ছিল নেশনের আবেগে নান্দনিক নতুন মূল্যবোধ ও মানুষের সৃজনশক্তির স্বাধীন চর্চার অবকাশ।

সেদিনের ইউরোপে স্বাধীন সুসংবদ্ধ ও সৃজনশীল সমাজ এবং দেশ-হিতৈষার তাগিদে জাতীয়তাবাদের ছিল বিশেষ ভূমিকা। রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয় আবেগ।

জাতীয়তাবাদের বিকাশের ধারায় নেশন-স্টেট ক্রমে সমাজের প্রধান সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংকীর্ণ হয়েছে সমাজের পরিসর। বহুজাতি সমন্বিত দেশ বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। নেশন-স্টেটের বিকাশের মূলে গণতান্ত্রিক

আদর্শের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক মাত্রার সমান প্রাধান্য দেখা যায়। নবোদ্ভূত ধনতন্ত্র ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের অন্তরায়। শিল্প বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের যুক্ত ধারায় নতুন পুঁজিবাদী শ্রেণী সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটায় ও আধুনিক নেশন-স্টেটের পথ প্রশস্ত করে তোলে। নতুন জীবনযাত্রার প্রবণতা এবং যুক্তিবহ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল জাতীয়তাবাদ। প্রতিটি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরিচালনার আকুতিকে জাতীয়তাবাদ উৎসাহিত করে। পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা অর্জনের অনুকূল জাতীয় আন্দোলনের প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে।

ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামন্ততন্ত্রী আমলে জাতীয় চেতনা বলে কিছু ছিল না। অতীতের একই স্মৃতিসম্পদের উত্তরাধিকারগত আবেগ ও একতা দেখা যেত না। আর্থ-সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে সুসংবদ্ধতাও গড়ে ওঠে নি। প্রাচীন ভারতে রাজার নিয়ন্ত্রণে একদিকে থাকত ব্রাহ্মণ-বুদ্ধিজীবীদের ধর্মীয় অনুশাসনের আধিপত্য, অন্যদিকে রণকুশল ক্ষত্রিয়দের প্রশাসন। মধ্যযুগে বহিরাগত মুসলিম শাসকদের সঙ্গে দেশীয় জনসাধারণের সম্পর্ক খুব বিশেষ গড়ে ওঠে নি। স্বভাবতই সেইসময়ে দেশব্যাপী একটা নেশন চেতনা ছিল কল্পনার বাইরে। বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা ছিল পরস্পর অসংবদ্ধ। সামন্ততান্ত্রিক বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজশক্তি হয় নিজেদের মধ্যে নয়তো দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসকদের সঙ্গে প্রায়শই সংঘর্ষে লিপ্ত হত। স্বভাবতই সেদিন নেশনযুক্ত একটা আদর্শ গড়ে ওঠার অবকাশ ছিল না। সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো জাতীয় আবেগ থাকাতো দূরের কথা।

এদেশে বণিক ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আঠারো শতক থেকে দানা বাঁধে। আধুনিক নেশনের ভিত্তি স্থাপনের ভূমিকা তাদের উপর বর্তালেও তারা তখনও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে ওঠে নি। অপেক্ষায় থাকে উদীয়মান এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর আগামী দিনের ভারতীয় নেশন গঠনের দায়িত্ব।

আঠারো শতকে মারাঠা শক্তির উত্থানকে ভারতে জাতীয়তাবাদের দিকে প্রথম পদক্ষেপ বলা চলে। মারাঠা অধিপতিরা বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের প্রভাবে ক্ষয়িষ্ণু মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর বিভিন্ন হিন্দু রাজ্যের মধ্যে একটা সংঘবদ্ধতার পরিকল্পনা করেছিলেন। জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই পরিকল্পনা কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছিল। তার পিছনে সামন্ততন্ত্রী রাজাদের চেয়ে ক্ষমতা বেশি ছিল বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের, যাঁরা রাজন্যদের স্থান শান্তিপূর্ণভাবে দখল করে নেন। শেষাবধি সংঘবদ্ধতার প্রয়াস ভেঙে যায়। জাতীয় ঐক্যের পরিবর্তে শতধা বিভক্ত দেশে তখন দেখা দেয় চূড়ান্ত নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা।

ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর দেশে শান্তি ফিরে আসে। উনিশ শতকের

ত্রিশের দশকে সারা দেশে একই ধরনের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ক্ষুদ্রকায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা ছিলেন পরবর্তীকালের জাতীয় চেতনার পুরোধা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ইংল্যান্ডের গণতন্ত্রী ও উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শন ও সেখানকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের আদর্শে সেদিন এদেশের বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসকেরা শতধা বিভক্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে ক্রমে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সংযুক্ত করেছিল।

এদেশে সেদিনের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই সরকারে দেশবাসীর প্রতিনিধিত্বের দাবিতে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সংহতি গড়ে তোলে। সেই সংহতির পিছনে পুরোনো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত আবেগমণ্ডিত কোনো জাতীয়তাবোধ বা মানসিকতা ছিল না। উনিশ শতকের সত্তর ও আশির দশকে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দেখা দেয় সেটা ছিল ইংরেজ শাসকদের প্রতি বিরাগসূত্রে গঠিত এবং স্বভাবতই সেটা ছিল একপেশে ও নেতিবাচক; অর্থাৎ এদেশে ইংরেজ প্রবর্তিত সরকারের ভিতর এদেশবাসীর প্রতিনিধিত্বের দাবিতে একটা শিথিল মতাদর্শ ও আন্দোলন মাত্র।

আদিপর্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের যাঁরা ছিলেন জনক তাঁরা নিয়মতন্ত্র ও গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। সমাজ সংস্কারে তাঁদের ছিল সার্থক ভূমিকা। ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গৌরববোধ সৃষ্টি থেকে জাতীয়তাবাদী চেতনা অংকুরিত হয়। সামাজিক অনাচার, কুসংস্কার, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, নিরক্ষরতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁরা আন্দোলনে সক্রিয় থাকতেন।

সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছাড়াও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসরকারি প্রশাসনের উচ্চপদে এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়োগের সীমাবদ্ধতা এবং ব্যবসাবাণিজ্যে এদেশের ব্যবসায়ীদের উপর নানা বাধানিষেধ আরোপের দরুন সঞ্চিত বিক্ষোভের ফলে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও প্রগতিশীল ব্যবসায়ীদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আবেগ ও চেতনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁরাই ক্রমে সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তির সঙ্গে সংগঠিত আন্দোলনের পথ প্রস্তুত করেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশবাসীর অসন্তোষগুলিকে তুলে ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে একটি জাতীয় দাবিসনদ প্রস্তুতির তাগিদে। সমাজ সংস্কারের কর্মসূচি ছেড়ে কংগ্রেস দল ক্রমে রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কালক্রমে জাতীয় স্বাধীনতা মুখ্য দাবিতে পরিণত হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের তত্ত্বগত ভাবভূমি হিসেবে গড়ে ওঠে জাতীয়তাবাদ। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে দলীয় রাজনীতির বাইরে অথবা ভিতরের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা জাতীয়তাবাদকে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার

করেছেন। তাঁদের মধ্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি, বস্তুবাদী ব্যঞ্জনা অথবা ভাববাদী মনোভাব দেখা যায়।

বিশ্বের অন্যত্র জাতীয়তাবাদের আলোর দিকটা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এসে ম্লান হয়ে পড়ে এবং তার অন্ধকার দিকটা বড় হয়ে দাঁড়ায়। তার একদা গণতন্ত্রী মানবতাবাদী ভূমিকা সংকীর্ণ জাত্যাভিমান, অসহিষ্ণু অন্ধ দেশভক্তি, সংখ্যালঘুদের উপর পীড়ন, জাতিবিদ্বেষ ও পররাজ্য গ্রাসের আচরণে ঢাকা পড়ে যায়। ফরাসি ভাবুক আর্নেস্ট রেনাঁ নেশনের উপাদান হিসেবে ভাষা, ধর্ম, জাতি ও ভৌগোলিক সংযুক্তি মানতেন না। তাঁর মতে, সবার মনে অতীতের স্মৃতিসম্পদের গরিমাবোধ এবং একসঙ্গে বসবাসের দৃঢ় ইচ্ছাই নেশনের শ্রেষ্ঠ উপাদান।

রেনাঁর সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ"। দুটি জিনিস এই মানস পদার্থের "অন্তঃপ্রকৃতি" গঠন করেছে। একটা হচ্ছে "সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর-একটি, পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা।" জাতীয়তাবাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করে-ছিলেন যে একদিকে তাতে সমষ্টিগত স্বার্থপরতার তাড়নায় ব্যক্তিমানুষের মনে বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হয়, অন্যদিকে সমষ্টির নামে সেটা রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিমানুষকে উৎসর্গ করে। তাঁর দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ একটি মহামারী বিশেষ, যেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের নৈতিক প্রাণশক্তিকে গ্রাস করছে। দেশপ্রেমের নামে যে ভূগোল প্রতিমার পুজো চলেছে তাকে তিনি পরিহার করেন।

বিবেকানন্দের মতে জাতীয়তাবাদের প্রচলিত চেতনা হল দ্বিবিধ: এক, নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সহানুভূতিবোধ এবং দুই, অপর জাতির প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ। অন্ধ স্বজাতি-বাৎসল্য ও বিজাতি-বিদ্বেষকে তিনি সমর্থন করতেন না।

জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে দেশাভিমান, জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ, বৈরিতা ও সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি ছেড়ে বিশ্বজনীনতার আশ্রয়ে সর্বদেশের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন কর্তব্য। জাতীয়তাবাদ তাঁর দৃষ্টিতে আধুনিকতা ও প্রগতির অন্তরায়, জাতির বিমূর্ত স্বার্থে জাতীয়তার নামে জনসাধারণকে ত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। দেশের ঐক্যের অজুহাতে লোকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে হরণ করা হয়। জাতীয়তা-বাদের পক্ষপুটে ও সমাজতন্ত্রের ছদ্মবেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে।

'সোস্যালিজম' ও 'কমিউনিজম' শব্দ দুটি সমার্থক। অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় যে দুঃসহ অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দেয় তার প্রতিকার হিসেবে সোস্যালিস্ট চিন্তার

উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। সোসালিজমের মর্ম হল সাম্য, সম্প্রীতি, স্বাধীনতা, সমবায় প্রভৃতি কিছু মূল্যবোধের সমষ্টি। শব্দটি বিভিন্ন স্থান ও সময়ে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

'সোসালিজম' শব্দটি ইংল্যান্ডে ১৮২৭ সালে 'কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিন' পত্রিকায় রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) তাঁর এক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ১৮৩২ সাল থেকে ফ্রান্সে শব্দটির চলন দেখা যায়, সিসমঁদি, ফুরিয়ার ও সাঁ সিমন অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসানকল্পে লেখনী ধারণ করেন। উনিশ শতকের চল্লিশের কোঠায় লুই ব্লাঙ্ক ও প্রুধোঁ উপলব্ধি করেন যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্যে দরকার রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ডে চার্টিস্টরাও (১৮৩৮-৪৮) সক্রিয় হয়ে ওঠে। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস যুগান্তকারী 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রচার করেন। ইউরোপে ১৮৩৮-৪৮ কালপর্বের সমুদয় বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর প্রায় বিশ বছর যাবৎ সেখানে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন হীনবল হয়ে থাকে। ১৮৬০ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের শেষাবধি সমাজতন্ত্রী আন্দোলনে মার্কসীয় ধারার ছিল সর্বাধিক প্রাধান্য।

মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হল সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র এবং শিল্প-বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ ; সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার মাধ্যম হল বৈপ্লবিক কর্মসূচি। ইউরোপের সমাজতন্ত্রী বিভিন্ন দল অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদের কর্মসূচি গ্রহণ করলেও উল্লিখিত অন্যান্য কর্মপন্থা সমানভাবে গ্রহণ করে নি। সেইসব দল শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে সম্ভব বলে মনে করতেন।

রুশ বিপ্লবের পরে ইউরোপের সমাজতন্ত্রী আন্দোলন কমিউনিস্ট ও সোসাল ডেমোক্র্যাট নামে দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। উভয় ধারার লক্ষ্য কিন্তু একই, অর্থাৎ উৎপাদন-বণ্টন-বিনিময় ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ। তবে লক্ষ্যে উপনীত হবার পথ হয়ে দাঁড়ায় ভিন্ন।

ভারতে সমাজতন্ত্রী আন্দোলন ও চিন্তাভাবনা কার্যত রুশ বিপ্লবের পরে দেখা দেয়। কিন্তু ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে কেউ কেউ সমাজতন্ত্রী ভাবধারার উৎপত্তি ও বিকাশ সমসাময়িককালেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। 'সোসালিজম' শব্দটি যিনি প্রথম ব্যবহার করেন সেই ইংরেজ রাষ্ট্রদার্শনিক রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহনের পত্রবিনিময় এবং সমাজতন্ত্রের অন্যতম প্রধান ভাবুক সিসমঁদির-সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রও সমাজতন্ত্রী আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাঁর লেখায় 'ইন্টারন্যাশন্যাল'-এর উল্লেখ দেখা যায় ; মার্কস প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সংস্থার (১৮৬৪-৭৬) কথাই হয়তো তিনি বলতে চেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ প্রথম যিনি নিজেকে সোসালিস্ট বলে ঘোষণা করেন ; সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর বিস্তারিত মন্তব্য দেখা যায়।

সাম্যচিন্তায় চাষীদের দুর্গতি, ক্ষেতমজুর ও গ্রামবাসীদের দুঃসহ জীবনের কথা ডিরোজিওর অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই লিখেছেন। শ্রমিকদের স্বার্থে সাংগঠনিক উদ্যম ছিল কেশবচন্দ্র সেন ও শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জাতীয় স্তরে দেশবাসীর অর্থনৈতিক দুর্গতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নৌরজি, রানাডে, গোখলে, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বুদ্ধিজীবী। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় (১৮৯৩) অরবিন্দ 'নিউ ল্যাম্প ফর দ্য ওল্ড' নামে সাতটি প্রবন্ধে তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেসে প্রলেটারিয়েট শ্রেণীর প্রতি উপেক্ষার কথা উল্লেখ করেন। পরবর্তীকালে ব্রিটেনের লেবার পার্টির আদর্শে অ্যানি বেসান্ত, লাজপত রায় প্রমুখ নেতারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতে মার্কসীয় ধারায় সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের প্রবর্তন করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। তাসখন্দে তাঁর নেতৃত্বে প্রবাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৯২০)। ইউরোপ থেকে বই, পত্রপত্রিকা ও চিঠির সাহায্যে এবং দূত মারফত তিনি ভারতে পার্টি সংগঠন গড়ে তোলা এবং সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ প্রচারে সক্রিয় থাকেন। ঐ সময়ে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি বইয়ের মধ্যে 'ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন' বইটি একজন ভারতীয়র লেখা প্রথম মার্কসীয় গ্রন্থ।

কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের সঙ্গে রায়ের বিচ্ছেদের (১৯২৯) পর ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে—একটি রায় গ্রুপ অফ কমিউনিস্টস এবং অপরটি ইন্টারন্যাশন্যালের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। দুটির মধ্যে কর্মকৌশলগত পার্থক্য থাকলেও, মূল মার্কসীয় মতাদর্শে কোনো প্রভেদ ছিল না। পরে অবশ্য মার্কসীয় মতাদর্শের ভ্রান্তি ও অসংগতি মানবেন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিনি মার্কসীয় প্রভাব ছেড়ে 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম' নামে নতুন এক রাষ্ট্রদর্শন প্রচার করেন।

ভারতে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের তৃতীয় ধারাটির উদ্ভব ঘটে (১৯৩৪) ত্রিশের দশকে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা ও কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হবার ফলে। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি নামে অভিহিত এই দলটির মুখ্য নেতা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, নরেন্দ্র দেব, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন, এম আর মাসানি প্রমুখ বিক্ষুব্ধ কিছু যুবক। কংগ্রেসের ভিতরে থেকে জাতীয় আন্দোলনকে সমাজতন্ত্রী পথে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। মূলত মার্কসীয় মতাদর্শ অনুসরণ করলেও তাঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন গান্ধীবাদে বিশ্বাসী, আবার কেউবা ব্রিটিশ লেবার পার্টির আদর্শে প্রভাবিত। অহিংসায় বিশ্বাসী না হলেও তাঁরা জাতীয় সংগ্রামে চাইতেন গান্ধীর নেতৃত্ব।

কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত না থেকে সমাজতন্ত্রী আদর্শে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র। বস্তুত জওহরলালকে

স্বাধীন ভারতের সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির রূপকার বলা যায়। ছাত্রাবস্থায় বিলেতের ফেবিয়ান সোসালিষ্টদের আদর্শে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ; কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবিত হন সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ (১৯২৭) করে সেখানকার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে। জওহরলালের সমাজতন্ত্রী আদর্শ ও চিন্তাভাবনার প্রয়োগ ও বিবর্তনের পরিচয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন (১৯২৯) থেকে ভুবনেশ্বর অধিবেশন (১৯৬৪) অবধি পরিব্যাপ্ত। গোড়ার দিকে মার্কসীয় মতাদর্শে অনেকাংশে আস্থা থাকলেও তাঁর চিন্তায় পরবর্তীকালে মিশ্র অর্থনীতি ও গণতন্ত্রী সমাজবাদ প্রাধান্য পায়।

সুভাষচন্দ্রের মধ্যে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের প্রভাব যথেষ্টই ছিল। তবে কোনো বিশেষ ধরনের সমাজতন্ত্র তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির প্রতি তিনি প্রসন্ন ছিলেন না। তিনি চাইতেন ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজন বুঝে এখানকার সমাজতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার প্রবর্তন। সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলার জন্যে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁর আপত্তি ছিল না। সেজন্যে তিনি কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম —এই উভয় মতাদর্শের সমন্বয়ে একটি নতুন মতাদর্শ তুলে ধরেন।

স্বাধীনতার পর দশক দুয়েকের মধ্যে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যাওয়ায় সমাজতন্ত্রী দলের সংখ্যা অনেক গুণ বেড়ে যায়। মার্কসীয় এবং গণতন্ত্রী সমাজবাদ—উভয় ধারায় সেগুলির মতাদর্শ নিবদ্ধ। কংগ্রেসও সমাজতন্ত্রী মতাদর্শ গ্রহণ করেছে। মানবেন্দ্রনাথের দলহীন রাজনীতির নিদর্শনে জয়প্রকাশ নারায়ণ দলহীন গণতন্ত্রের পথে অগ্রসর হন।

সত্তর বছরেরও বেশি কাল ধরে মার্কসীয় ও গণতন্ত্রী সমাজবাদের প্রয়োগ বিভিন্ন দেশে হয়ে চলেছে। সাধারণভাবে এখানে তার কিছু মূল্যায়ন করা যেতে পারে। মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন পুঁজিবাদের বিনাশ ছিল অনিবার্য। মনে করা হত যে পুঁজিবাদের চরমাবস্থা হল ফ্যাসিবাদ এবং দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পরে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে শিল্পোন্নত দেশে মন্দা আসে নি এবং পুঁজিবাদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। তবে তার পরিবর্তন ঘটেছে বিস্তর।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে উন্নতির পথে চলেছে। উৎপাদন বৃদ্ধির দরুন শ্রমিকদের আয় অনেকাংশে বেড়েছে। জনকল্যাণকর বহুবিধ বিধিব্যবস্থার ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী লাভবান হয়েছে।

অপরদিকে যুদ্ধোত্তরকালে কমিউনিজম ও সোসাল ডেমোক্রেসিরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রুশদেশে সর্বপ্রথম এবং যুদ্ধোত্তরকালে পূর্ব ইউরোপের

বিভিন্ন দেশে একচ্ছত্র কমিউনিস্ট সরকার গঠিত হয়েছিল। সেসব দেশে মার্কসীয় চিন্তা প্রয়োগের ফলে কালক্রমে তার দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা নানা অভিজ্ঞতায় ফুটে উঠতে থাকে। ষাটের দশকের শেষ থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে ভাঁটা পড়তে শুরু করে। সংকট দেখা দেয় যেসব দেশে কমিউনিস্টরা ক্ষমতাসীন। তার বিস্ফোরণ ঘটে ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে। মূল সোভিয়েত দেশ সমেত পূর্ব ইউরোপের দেশগুলি পর্যন্ত বহুদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন এবং মিশ্র অর্থনীতির পন্থা গ্রহণ করেছে।

ইতিমধ্যে সোসাল ডেমোক্র্যাটিক দলগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। অনেক দেশেই তারা ক্ষমতাসীন। তারা নিছক ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদে বিশ্বাসী নয়। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় রেখে পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তায় তারা সমধিক আস্থাবান।

পশ্চিমের এই নব্যচিন্তা ও অভিজ্ঞতা ভারতের মত অনুন্নত দেশগুলির কাছে বিশেষ মূল্যবান। অনুন্নত দেশে সমবণ্টন অপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশ্ন অনেক বেশি জরুরী। বেসরকারি মূলধনের সম্ভাবনা ও গুরুত্ব অস্বীকার না করেও ভারতে নির্বিচারে সবকিছু রাষ্ট্রীয়করণের প্রবণতার ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্যের অন্তহীন লোকসানের দায় জনসাধারণের ঘাড়ে চাপছে, বেসরকারি মূলধন ও উদ্যম সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির দশা এখন শোচনীয়।

ভারতে সমাজতন্ত্রী মূল্যবোধ সঞ্চারের প্রধান অন্তরায় হল তার সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা। যে-সমাজে সাম্য অপেক্ষা স্বার্থবুদ্ধি প্রবল, শ্রেণীচেতনা অপেক্ষা জাতবিচারে মানুষের মন আচ্ছন্ন, ধর্ম-ভাষা-প্রদেশের নামে চলে হানাহানি থেকে গণহত্যা, সেখানে যথার্থ সমাজতন্ত্রের অবকাশ কম। যুক্তিবহ শিক্ষা ও চেতনার সাহায্যে লোকের দৃষ্টিভঙ্গির মৌল পরিবর্তন ছাড়া সমতাবোধ, সৌভ্রাত্র ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন অসম্ভব। মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কয়েকটি ধ্বনিসর্বস্ব ধোঁয়াটে চিন্তা ও স্বপ্নজাল সৃষ্টি সমাজতন্ত্রের অন্তরায়।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ১৮৮০-১৯৬১

উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলের বিখ্যাত দত্ত পরিবারে ভূপেন্দ্রনাথের জন্ম। তিন ভাইয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত, মধ্যম মহেন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনার কথা সুবিদিত এবং কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ ছিলেন বিপ্লবী, সমাজতন্ত্রী, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিত। কুড়ির দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে মননশীলতায় পরিপুষ্ট করার পিছনে তাঁর ছিল বিশেষ অবদান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কিংবা ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টিতে যোগ না দিলেও শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর ছিল বিশিষ্ট ভূমিকা। যুগপৎ তিনি কৃষক, ছাত্র ও যুব আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি সেই সময়ে "বুদ্ধিজীবী স্বদেশী মহলের কাছে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত হিসাবে খ্যাত ছিলেন।"[১]

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটন ইনস্টিটিউসনে ভূপেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় শিবনাথ শাস্ত্রীর সান্নিধ্যে আসেন এবং ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে যোগ দেবার সংকল্প ছাপিয়ে তাঁর মনে দেশের মুক্তি আন্দোলনের আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে। অনুশীলন দলে শরীরচর্চা ও অস্ত্র শিক্ষা থেকে ক্রমে ঐদলের বৈপ্লবিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হন। সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী অনুশীলন সমিতির একটি গোষ্ঠী সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করে (১৯০৬)। বারীন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ঐ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ, অবশ্য সম্পাদক হিসেবে পত্রিকায় কারো নাম থাকত না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি 'সোনার বাংলা' নামে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। বেআইনী বলে ঘোষিত সেই ইস্তাহারটি সে-সময়ে বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার করেছিল।

১৯০৭ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশের দায়ে তাঁর এক বছর কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার পরে তাঁর আবার গ্রেপ্তার হবার আশঙ্কায় ভগিনী নিবেদিতা প্রমুখ শুভার্থীরা তাঁকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দেন। সেখানে আবার তাঁর ছাত্রজীবন শুরু হয়। ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করে তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্যে গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু সেকাজ তাঁর অসমাপ্ত থেকে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে ছাত্রাবস্থায় তিনি সেখানে লালা হরদয়ালের নেতৃত্বে সদ্যগঠিত (১৯১৩) গদর পার্টির সংস্পর্শে আসেন। তার আগে তিনি নিউ ইয়র্কে ব্রুকসপার্ক সোসালিস্ট ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ইউরোপে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বার্লিন কমিটি নামে পরিচিত ইন্ডিয়ান রেভোলিউশনারী কমিটি নামে একটি সংগঠনের মাধ্যমে জার্মানিতে প্রবাসী ভারতীয়দের সংযুক্ত করেন। উক্ত কমিটির সঙ্গে গদর পার্টির ঘনিষ্ঠ সহযোগ গড়ে ওঠে। যুদ্ধ শুরু হবার পর গদর পার্টির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বার্লিনে চলে আসেন। সেখানে তখন অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীরাও জড়ো হয়েছিলেন। কমিটির সঙ্গে জার্মান ও তুরস্ক সরকারের একটি চুক্তি হয় এই মর্মে যে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে এই দুই দেশ ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দেবে।

যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণার কাজ অসমাপ্ত রেখে ভূপেন্দ্রনাথ বার্লিনে চলে আসেন (১৯১৫)। সেখানে তিনি বছর দুয়েক (১৯১৬-১৮) ঐ কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। যুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে বার্লিন কমিটি ভেঙে দিয়ে নতুন আর একটি কমিটি গঠিত হয়। সে-সময়ে কয়েকজন ভারতীর বিপ্লবীর উদ্যোগে 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেস' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকের প্রকাশনা শুরু হয়। ভূপেন্দ্রনাথ সেটির সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়েই ১৯১৫ সালে মহেন্দ্রপ্রতাপ ও বরকতউল্লা জার্মান সরকারের সাহায্যে আফগানিস্তানে যান ও কাবুলে প্রবাসী ভারত সরকার গঠন করেন। রুশ বিপ্লবের পর বিভিন্ন ধারায় বহু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী সোভিয়েত দেশে, বিশেষ করে মধ্য এশিয়ায় আশ্রয় নিতে শুরু করেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ শাসনে বীতশ্রদ্ধ খিলাফতী মুহাজির। সোভিয়েত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যুদ্ধোত্তর নানান জটিল পরিস্থিতি ও মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধে। বরকতউল্লা কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রোপাগান্ডা নামে একটি সংস্থা গঠন করেন ও রুশ সরকারের পক্ষে প্রচারাভিযান চালান। এদিকে ১৯২০ সালে তাসখন্দে আগত মুহাজিরদের নিয়ে আবদুর রব বার্ক ও প্রতিবাদী আচারিয়া ইন্ডিয়ান রেভোলিউশনারি অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। এঁদের সহযোগেই মানবেন্দ্রনাথ রায় তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিলেন (১৭ অক্টোবর, ১৯২০)।

ইতিমধ্যে মস্কোয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেস (১৯২০) হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব মানবেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। তারই মধ্যে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের অদম্য বাসনা তাঁর প্রবল হয়ে ওঠে। আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারতে প্রবেশ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানোর উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ খিলাফতী মুহাজিরদের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একটি মুক্তি বাহিনী গড়ে তোলেন। তাসখন্দে স্থাপিত সেই সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের জন্যে রুশ কর্তৃপক্ষ অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম, টাকাকড়ি ইত্যাদি দিয়ে সহায়তা করেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা ও

আফগানিস্তানের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খল অবস্থার দরুন পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়। সমর শিক্ষাকেন্দ্রের কিছু বাছাই করা শিক্ষার্থীকে নিয়ে রায় মস্কোয় ফিরে আসেন।

ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের একত্র সংগঠিত ও একযোগে কাজ করার উদ্দেশ্যে মানবেন্দ্রনাথ পূর্বতন বার্লিন কমিটির সদস্যদের মস্কোয় আসার জন্যে আহ্বান জানান।[৩] তাতে সাড়া দিয়ে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বার্লিন কমিটির চোদ্দ জনের একটি প্রতিনিধি দল ১৯২১ সালে মস্কোয় পেঁছন। সেই দলের অন্যতম সদস্য ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। সদস্যদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ, গোলাম লুহানি ও পান্ডুরঙ্গ খানখোজে ছিলেন মার্কসীয় চিন্তার অনুবর্তী। তাঁরা বিশ্ববিপ্লব কার্যক্রমের একটি থিসিস এবং ভারত সম্পর্কিত একটি স্মারকপত্র কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহক সমিতির কাছে দাখিল করেন।

উল্লিখিত থিসিসের মূল বক্তব্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উপর গুরুত্ব দেওয়াই প্রাথমিক কর্তব্য, একাজ সম্পন্ন হলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। কৃষি বিপ্লব বা অনুরূপ সামাজিক পরিবর্তনের কথা তাঁরা বিশেষ বলেন নি। তাঁরা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নিঃশর্তে সমর্থন করেন। লেনিনের সঙ্গে সাক্ষাতে তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ পান নি। তবে লেনিন তাঁদের থিসিস দেখে বলেছিলেন—"But why the new thesis?" ওঁরা কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের থিসিস পড়ে দেখুন।[৩]

মাসখানেক পরে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এককভাবে আর একটি থিসিস দাখিল করেন। তখনও লেনিন অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করেন। লেনিন কয়েক ছত্রের একটি চিঠিতে ভূপেন্দ্রনাথকে জানান যে, শ্রেণী সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই, ভারতে কৃষক সংগঠন কিছু থাকলে তার তথ্য সংগ্রহ করুন। রুশ গবেষকদের মতে ভূপেন্দ্রনাথের থিসিসে তাঁর সঙ্গীদের থিসিস থেকে একটু ভিন্ন সুরে বলা হয়েছিল যে, যতদিন বিদেশী শক্তি ভারত শাসন করবে ততদিন সব শ্রেণীর একযোগে বিপ্লবসাধনই কর্তব্য। লেনিনের কাছে সে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হয় নি। তাঁর মতে বিভিন্ন শ্রেণীর যৌথ সংগ্রামে কৃষকদেরও স্বার্থান্বিত সংযোগ থাকা চাই। যাঁরা নিজেদের কমিউনিস্ট বলে মনে করেন তাঁদের সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত। ভূপেন্দ্রনাথ লিখেছেন যে, জাতীয় আন্দোলনে কৃষকদের স্বার্থ সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। লেনিনের মন্তব্য তাঁর চোখ খুলে দেয় এবং জাতীয় আন্দোলনের নতুন পথের নিশানা দেখায়।

লেনিন প্রত্যক্ষ করেন যে কমিউনিস্ট আন্দোলনে যারা যোগ দিতে আসে তারা—"brought into it their prejudices, their reactionary

fantasies, their weaknesses and errors"। রুশ গবেষণাগ্রন্থে উক্তিটি ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ সেদিনের মস্কো ভ্রমণকারীদের উদ্দেশে ব্যবহার করা হয়েছে।[৪০]

মস্কোয় আগত উক্ত ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। আগত ভারতীয়রা চেয়েছিলেন দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে গৃহীত ঔপনিবেশিক থিসিস নাকচ করতে। সেটা একমাত্র সম্ভব ছিল আসন্ন তৃতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে। তার আগে সেবিষয়ে কোনো নিশ্চয়তা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাঁরা কমিউনিস্ট আন্দোলনে যোগ দিতে চেয়েছিলেন দলগতভাবে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেওয়াই ছিল নিয়মসঙ্গত। তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দেওয়াও ছিল তাঁদের অন্যতম প্রধান দাবি।[৫] নিজেদের মধ্যেও তাঁরা সর্ববিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছতে পারতেন না, কলহ দেখা দিত। অবিশ্বাস, ক্ষোভ ও নিরাশা নিয়ে দলের অধিকাংশ সদস্য বার্লিনে ফিরে যান।

মস্কো থেকে বার্লিনে ফিরে আসার পর ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণার কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করেন। অনেকটা সেই কারণে তিনি জার্মানিতে সমকালীন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখতে পারতেন না। তবে বার্লিনে ফেরার পর তিনি ও তাঁর সহযোগীরা একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। সেই পার্টির অন্যতম সদস্য আবদুল ওয়াহেদ ইতালিতে মুসোলিনীর কাছে যাতায়াত করতেন। দেশে ফেরার পরেও ভূপেন্দ্রনাথের সঙ্গে ওয়াহেদের প্রত্যক্ষ সংযোগ বজায় ছিল।[৬]

১৯১৯ সাল থেকে ভূপেন্দ্রনাথ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্বের উপর গবেষণা চালিয়ে ১৯২২ সালে হ্যামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি পান। তিনি ১৯২০, ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে যথাক্রমে বার্লিনের অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি, জার্মান এশিয়াটিক সোসাইটি ও প্যারিসের অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন।

১৯২৫ সালে ভূপেন্দ্রনাথ ভারতে ফিরে আসেন ও জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ছাত্র ও যুব সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়া এবং বিভিন্ন পাঠচক্রে মার্কসীয় মতাদর্শ ব্যাখ্যার কাজে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত থাকেন। একই সঙ্গে তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঝরিয়া সম্মেলনে তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৩১ সালে কলকাতা অধিবেশনে কমিউনিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে যখন রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস গঠন করেন তখন তার কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ। সেই বছরেই জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে ভূপেন্দ্রনাথ মৌল অধিকার সংক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনাসূত্রে কয়েকটি

অতিরিক্ত প্রস্তাব রেখেছিলেন। সম্ভবত সেগুলি গৃহীত হয় নি। তাই তিনি পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন যে—

কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত মৌলিক অধিকার সমূহের শর্তগুলি⋯বিশেষত শ্রমিক বা মূল শ্রমশিল্প সম্পর্কিত শর্তসমূহ সম্পূর্ণ ফ্যাসিস্ট পদ্ধতি অনুসারী।[৭]

সরকারি গোপন নথিতে জানা যায় যে ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে আত্মশক্তি নামে গোপন বিপ্লবীদল ইন্ডিয়ান প্রলেটারিয়ান রেভোলিউসনারি পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন। ভূপেন্দ্রনাথ, বঙ্কিম মুখার্জী, রাধারমণ মিত্র প্রমুখ ছিলেন সেটির সংগঠক।

কৃষক আন্দোলনেও ভূপেন্দ্রনাথের ছিল নিরবচ্ছিন্ন নেতৃত্ব। তাঁর সভাপতিত্বে বর্ধমান জেলা ক্ষেতমজুর সঙ্ঘ গঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের বাঁকুড়া (১৯৩৭) এবং হুগলি (১৯৩৮) অধিবেশনে তিনি ছিলেন সভাপতি মণ্ডলীর অন্যতম। চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তিনি ক্রমশ কমিউনিস্টদের সমালোচক হয়ে ওঠেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি তাঁর ছিল প্রচ্ছন্ন সমর্থন। দেশ স্বাধীন হবার পরে তিনি রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেন। চল্লিশের দশকে কংগ্রেস সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন—

ফ্যাসিস্টদের ন্যায় ধনতান্ত্রিক বুর্জোয়াদের আদর্শই কংগ্রেসের আদর্শ।[৮]

কিন্তু স্বাধীনতার এক দশক পরে জাতীয় কংগ্রেসের তারিফ করে তিনি লেখেন যে কংগ্রেস প্রবর্তিত দেশের সংবিধানে—

রাজনীতিক, অর্থনীতিক এবং সামাজিক ন্যায্যতা বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে⋯সমানাধিকার প্রদান করা হয়েছে।⋯এখন জাতীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের ঢঙ-এ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্গঠনের আদর্শ গ্রহণ করেছে।[৯]

নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ভারততত্ত্বে সুপণ্ডিত ভূপেন্দ্রনাথের লেখা বইয়ের সংখ্যা প্রায় কুড়ি। নিজের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

যৌবনের প্রারম্ভে লেখক ম্যাটসিনির রাজনীতিক সাম্যবাদের বাণী শুনিয়াছেন, যৌবনের মধ্যাহ্নে নিজের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক লেস্টার ওয়ার্ডের 'সমাজের শাসক সমাজ' (sociocracy) এই বাণী শুনিয়াছেন, আর এই তথ্যই মার্ক্স-লেনিনবাদ স্পষ্ট করিয়া লেখককে বুঝাইয়া দিয়াছে।[১০]

দর্শনচিন্তা

বিভিন্ন লেখায় ভূপেন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার বিক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। সবিস্তারে ও সুসংবদ্ধভাবে কোনো দার্শনিক প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ কিছু লেখেন

ন। তাঁর দার্শনিক বিচারভঙ্গি বলা বাহুল্য মার্কসীয় চিন্তায় গঠিত। মার্কসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ অনুযায়ী ভূপেন্দ্রনাথ সমাজের গতিপ্রকৃতির বিশ্লেষণসূত্রে বলেন যে, সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সামাজিক যাবতীয় বিধিব্যবস্থার রূপান্তর ঘটে এবং সেই সঙ্গে "সমাজস্থিত মানবের চিন্তা-ধারাও পরিবর্তিত হয়"। সামাজিক গতির পশ্চাতে কাজ করে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

তিনি প্রাচীন গ্রীস ও ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে এই দ্বান্দ্বিক নিত্য পরিবর্তনশীলতা প্রত্যয়ের উল্লেখ করেন। উনিশ শতকের প্রথমাংশে হেগেল প্রত্যয়টিকে মানবেতিহাসে প্রয়োগ করেন ভাববাদী দৃষ্টিতে। পরিবর্তে মার্কস তাতে বস্তুবাদী ব্যঞ্জনা আরোপ করে প্রত্যয়টিকে সমাজের গতিপ্রকৃতি নিরূপণের জন্যে তাঁর সমাজতত্ত্বে গ্রহণ করেন। তত্ত্বটিকে ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে বলেন যে, নিত্যপ্রবহমান এই গতিশীল ধারায় সনাতন বলে কিছু নেই। এই ক্রমবিবর্তনের ধারায় মনোবিজ্ঞানের আত্মজ্ঞান (cognition) প্রভাব বিস্তার করে। বস্তু নিজের প্রভাবে সমাজকে বদলায় না। "আত্মজ্ঞান" প্রভাব বিস্তার করে, অর্থাৎ "ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা সমাজ প্রভাবান্বিত হয়"[১১]।

ঐ আত্মজ্ঞানের অভাবে নিপীড়িত ও শোষিত শ্রেণী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে ; এদেশের প্রাচীন পণ্ডিতেরা "আত্মানং বিদ্ধি" কথাটি বারংবার বলেছেন কেবল ধর্মক্ষেত্রে সাধকদের উদ্দেশে। দেশ ও সমাজ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকেরা নীরব বলে তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতে যেসব দার্শনিক মত সৃষ্ট হয়েছিল সেসব ছিল শাসক শ্রেণীর পক্ষীয় মত। এদেশের পণ্ডিতেরা প্রাচীন পুরাণ ও দর্শনের তথ্য সমূহের জাবর কাটেন। কিন্তু ভারতীয় সমাজ এক জায়গায় স্থানুভাবে বসে না থাকলেও প্রথমাবস্থার দর্শনই সনাতন সত্য, একথা আজও লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়। কথাটি মার্কসীয় দর্শনের ক্ষেত্রেও যে প্রযুক্ত হতে পারে, সে প্রসঙ্গে তিনি যান নি। জ্ঞানের প্রসার অনুযায়ী দর্শনের পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক ও সঙ্গত। সেই নিরিখে পুরোনো সমস্ত দর্শনের সঙ্গে মার্কসীয় দর্শনেরও যে নিরন্তর মূল্যায়ন হতে পারে সে-বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন।

বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে কি ধরনের দর্শন উদ্ভূত হতে পারে এবং কোন্ কোন্ সামাজিক শ্রেণীর অবস্থা বা স্বার্থের প্রতিধ্বনি করে এবং কোন্ ধরনের দর্শনের প্রয়োজন সে-সম্পর্কে তাঁর মতে ভারতীয় দার্শনিকেরা অবহিত নন। স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত উল্লেখ করে ভূপেন্দ্রনাথ অতীতকালের দর্শনকে শ্রেণীগত দর্শন (class philosaphy) বলে অভিহিত করেছেন। শোষিত শ্রেণীর উপযোগী একটি দর্শনের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন, সেটাও কি একটা শ্রেণীবিশেষের দর্শনে পরিণত হবে না ? বস্তুত দর্শন হওয়া উচিত জাতপাত শ্রেণী নির্বিশেষে সমগ্র মানব সমাজের। সেই দৃষ্টিতে মানবেন্দ্রনাথ

মার্কসবাদকে কোনো শ্রেণীগত দর্শন বলে মনে করতেন না।

ভূপেন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন যে কপিল, কণাদ, বৃহস্পতি, চার্বাক, আর্যভট্ট প্রমুখ বস্তুবাদী প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তাধারা অন্তর্ধান করেছে। সেসবের স্থান নিয়েছে শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত পুরোহিততন্ত্রীয় শাস্ত্রগ্রন্থ। কিন্তু নিজে তিনি ঐসব বস্তুতন্ত্রী ভারতীয় দর্শনের আলোচনা ও প্রচারের উদ্যম নেন নি, সেসব দর্শনচিন্তার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করেছেন মাত্র।

ভূপেন্দ্রনাথ ডারউইনের মতানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জীব-জগতের মহাসত্য 'আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম' ব্যতীত মানুষ উন্নত হতে পারে না। আত্মরক্ষার জন্যে জীবনের এই সংগ্রামের মূলে থাকে 'আইডিয়া' অর্থাৎ ভাব। কারণ বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হলে জীবনসংগ্রামে মানুষ পরাজিত হয়। জৈব বিবর্তনের ধারায় কেবল মস্তিষ্কের জোরে মানুষ বিশিষ্টতা অর্জনের মাধ্যমে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছে। আবার মানব জাতিসমূহের মধ্যে উদ্দীপনা ও বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যারা নিজেদের নিত্যই নতুনের সঙ্গে উপযোগী করে নিতে পেরেছে তারা জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করেছে। মানুষের এই ক্রমবিকাশ 'আইডিয়া'-র উপর নির্ভর করে। 'আইডিয়া' থেকেই দেখা দেয় উদ্ভাবন শক্তি।[১২] এখানে ভূপেন্দ্রনাথ মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সরে এসে নিজের স্বাধীন মতামত কিছুটা ব্যক্ত করেছেন।

ভাব ও বস্তুর মধ্যে কোনটি অগ্রবর্তী সেইসূত্রে তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিতে বলেন—

> ভাব জীবনের অবস্থা হইতে উদয় হয়। মানবের প্রয়োজন হইলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মনে ভাবেরও উদয় হয়…সেইভাবকে কার্যে পরিণত করিয়া মানব নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে।[১৩]

তাঁর মতে ভাব সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়। ভাব থেকে উদ্ভব হয় জ্ঞানের। কিন্তু জ্ঞান নির্দিষ্ট কোনো কাজে না লাগলে সে-জ্ঞান বৃথা যায়। সব কাজের পিছনে চিন্তার দ্বারা পরিচালিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। বুদ্ধির দ্বারা চালিত কাজ উন্নতি সাধন করে সাময়িক সমস্যার মীমাংসার সুযোগ করে দেয়। পক্ষান্তরে বুদ্ধি-বিহীন কাজে পঙ্কিলতার উদ্ভব ঘটে। বুদ্ধিবৃত্তির যৌক্তিক বা অযৌক্তিক পরিচালনার ফলে ইতিহাসের গতি অগ্রগামী অথবা পশ্চাৎগামী হয়। এক্ষেত্রেও ভূপেন্দ্রনাথ 'আইডিয়া'-কে অনেকটা প্রাধান্য দিয়েছেন, বস্তু ও ভাবের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। শুধুমাত্র ছককাটা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে আবদ্ধ থাকেন নি।

ভূপেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন যে বাস্তববিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে ইতিহাস লেখা হচ্ছে। "ইতিহাস একটি বিজ্ঞান" বলে তিনি মন্তব্য করেন। প্রাচীন ভারতীয়রা ইতিহাস লেখেন নি বলে যে মন্তব্য শোনা যায় তার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, সংস্কৃত ভাষায় পুরাণ আর ইতিহাসের অর্থ ছিল জনশ্রুতি বা ঐতিহ্য। কিন্তু তখনকার রাজকাহিনীতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না। কিছু পুরাণে প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়— কিন্তু সেগুলি সব রাজা ও ঋষিদের বংশতালিকায় গণ্ডীবদ্ধ। অনেক রাজার নাম থেকে জনপদের নামকরণ হয়; প্রাচীন ভারতের অনেক অঞ্চল বা রাজ্যের নাম কৌমের (tribe) রাজার নাম থেকে অভিহিত। তাঁর মতে সেটা "জাতিতত্ত্বসম্মত"। প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে যেসব সংবাদ পাওয়া যায় সেগুলির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হলে জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, অর্থনীতি ইত্যাদির তথ্য উদ্ধার করা যায়।[১৪]

মার্কসীয় মতাদর্শ প্রতিধ্বনি করে তিনি বলেন যে, "মানবের ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামেরই ইতিহাস"। সকল মানবসমাজে সেটা অহরহ ঘটছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেণী সংগ্রাম ধর্ম-সংঘর্ষের রূপ নেয়। ভারতের ইতিহাস সেই দৃষ্টিতে শ্রেণী সংঘর্ষের ইতিহাস। অসংখ্য ধর্মবিপ্লব, সমাজবিদ্রোহ ও ধর্মান্তরকরণ তার প্রমাণ। তিনি বলেন যে, সমাজের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক এবং একটি নরগোষ্ঠীর বিবর্তনের ধারায় অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটে। সেই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ হল ইতিহাসের কাজ। ইতিহাসে ব্যক্তিমানুষের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু সার্বিক দৃষ্টিতে নায়কেরা যে ইতিহাসের একক রূপকার বলে কথিত, সেটা ঠিক নয়। তার সঙ্গে সামাজিক শক্তি যুগপৎ ক্রিয়াশীল থাকে।[১৫]

ভূপেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, কোনো জাতির "ওয়ার্লড ভিউ" অর্থাৎ "জগতের প্রতি ধারণা" পরিবর্তিত হলে তার ইতিহাসের গতিও পরিবর্তিত হয়। কোনো জাতির মধ্যে একটা সনাতন ধারা বলে কিছু থাকে না, জাতীয় জীবন কখনও এক খাতে বয় না। তাঁর মতে—

> যে জাতির জীবন স্থানুবৎ—একস্থানে দণ্ডায়মান থাকে, সেই জাতিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

তাঁর দৃষ্টিতে চিরকাল এক জায়গায় আবদ্ধ থাকা নির্জীবতার লক্ষণ। জীবতত্ত্বের সাহায্যে তিনি বলেন যে "প্রচলিত বংশপদ্ধতি হইতে mutation রূপ খাপছাড়া উপায়ে সৃষ্টিতে 'নূতনত্ব' প্রদর্শিত হয়।" আবার সমাজতত্ত্বের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, সমাজ যখন "পঙ্কিলাবস্থায় পতিত হইয়া মৃত্যুমুখে উপনীত হয় সেই সময়" উক্ত জীবনের প্রতি ধারণা "mutation আনয়ন করিয়া

নূতন উদ্দীপনার দ্বারা সেই মুমূর্ষু জাতিকে পুনর্জীবিত করা সম্ভব"। ভূপেন্দ্রনাথের এই চিন্তায় তাঁর অধ্যাপক লেস্টার ওয়ার্ড-এর প্রভাবের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন।[১৬]

দ্বিতীয়ত, সমাজের ভিতর বিভিন্ন স্তরের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। এবং অহরহ সেই বিরোধের ফলে সমাজের বিভিন্ন গতিশীল শক্তি, তথা পরস্পর-বিরোধী স্বার্থসমূহ, সংগ্রামের মাধ্যমে শক্তিহীনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। সেটিকে তিনি "শ্রেণী সংগ্রাম" বলে অভিহিত করেছেন। বিভিন্ন স্তরের স্বার্থ-সমূহ শ্রেণীস্বার্থরূপে প্রকট হয়।[১৭]

ইতিহাসের অর্থনৈতিক বনাম ভাবগত ব্যাখ্যাবিতর্কে ভূপেন্দ্রনাথ বস্তুত একটি মাঝামাঝি ভারসাম্য হিসেবে মানুষের স্বার্থকেই সবকিছু ক্রিয়াকলাপের মূল বলে মনে করতেন। তবে মার্কসীয় দৃষ্টিতে ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি শেষাবধি স্পষ্টই বলেন যে, "মানবসমষ্টি আর্থনীতিক কারণ দ্বারা প্ররোচিত হইয়া জগতের নানাকার্য্যে নিযুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রয়োজন দ্বারা পরিচালিত হইয়া জগতের বিভিন্ন কার্য্যের অবতারণা করিয়া সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে।"[১৮]

অবশ্য তিনি একথাও লিখেছেন যে "উভয় ব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী নহে, উভয়েই একস্থলে মিলিত হয়।" তাঁর মতে সব কাজের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্বার্থই হচ্ছে যাবতীয় কর্মপ্রবৃত্তির মূল। "স্বার্থ" বিষয়টি অর্থনীতি চর্চার বস্তু এবং অর্থনীতিই হল সমাজনীতির ভিত্তি। মানুষের সর্ববিধ কাজ ও উদ্দীপনার পিছনে ক্রিয়াশীল থাকে অর্থনৈতিক স্বার্থ।[১৯] উক্ত ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ভূপেন্দ্রনাথ কিন্তু বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত হিসেবে ভাবরাজ্যে একটি প্রবল বিপ্লব সাধিত হয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। নতুন ও মৌলিক চিন্তায় দার্শনিকেরা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি নতুন আদর্শ তুলে ধরেন।[২০]

তিনি লিখেছেন যে, ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে, সমান অবস্থায় সমান ভাবের জিনিস সমান দশা প্রাপ্ত হয়। অন্যদেশেও বিভিন্ন অবস্থায় যে ফল প্রসূত হয়েছে, ভারতেও তার অন্যথা হচ্ছে না। কারণ সবেরই পিছনে থাকে অর্থনৈতিক কার্যকারণ।[২১] কিন্তু ডায়ালেকটিকস প্রত্যয়ের আলোচনা সূত্রে তিনি বলেছেন যে "জগৎ-সমাজ, মনুষ্য প্রভৃতি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল, পূর্ব্বরূপে আর প্রত্যাবর্তন করে না।"[২২]

ভূপেন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তায় অনুরূপ সামান্য স্altবিরোধ দেখা যায়। 'যুগসমস্যা' বইতে তিনি লিখেছেন যে "ইতিহাস সর্ব্বত্র একভাবেই স্ফূর্তি লাভ করে না"। ইউরোপে যেসব সামাজিক সমস্যার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে, ভারতে হয়তো তার প্রয়োজন ঘটবে না। তাঁর কথায়, "ভারত চিরকাল নিজের বিশেষত্ব রাখিয়াছে, সেইজন্য ভারত-সমস্যা মীমাংসা করিবার জন্য নূতন

পন্থার উদ্ভাবন করিতে হইবে'' (পৃ ৪০)। 'জাতি সংগঠন' বইতে তিনি এই মর্মে লিখেছেন যে ভারতীয় ইতিহাসের বিবর্তনের নিয়ম পৃথিবীর অন্যান্য স্থান থেকে পৃথক নয়, অর্থাৎ—

> ভারতীয় সমাজতত্ত্বের বিবর্তন কোন স্বতন্ত্র নিয়মানুসারে হয় না। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সব কার্য্য কারণানুসারে সমাজের বিবর্তন হয়, ভারতেও তদ্রূপ। (পৃ ৮২)

বস্তুত তিনি দ্বিতীয় মনোভাবকে প্রাধান্য দিতেন।

রাষ্ট্র দর্শন

ভূপেন্দ্রনাথ রাজনীতিকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে দেখতেন। তাঁর মতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তনের আগে তার একটা দার্শনিক ভিত্তি থাকা প্রয়োজন যার উপাদান হল যুক্তি, বুদ্ধি ও বিজ্ঞান। এবং তার প্রয়োগ হওয়া চাই সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায়।[২৩]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে এদেশের রাজনীতির পিছনে স্বাধীন চিন্তাভাবনার পরিবর্তে লোক খেপানো ও হুজুগ সৃষ্টির প্রবণতাই থেকেছে বেশি। কতকগুলি উত্তেজনাকর মানসিকতা লোকের হিস্টিরিয়াতে পরিণত হয়। তাতে একটা স্নায়বিক দৌর্বল্য প্রকাশ পায় এবং সেটা জনচিত্তে সংক্রমিত হয়। ফলে লোকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি লোপ পায়। আত্মনির্ভরতার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তিনি তাই চেয়েছিলেন—

> তীক্ষ্নবুদ্ধি ভাবুকের দল যাঁরা ভারতীয় রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে একটি দর্শনে পরিণত করবেন এবং তাঁদের সেই গবেষণার ফল লোকসমাজে চালিত করবেন।[২৪]

স্পষ্টতই তিনি কোনো রেডিমেড মতাদর্শ চাপিয়ে দেবার কথা বলেন নি।

ভূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমাজ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে রাজনীতি সমাজের গতি প্রদর্শনকারী যন্ত্রবিশেষ। বাস্তব অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে রাজনীতি অচল। রাজনীতিকে তাই তিনি অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।[২৫] কারণ তাঁর দৃষ্টিতে যাবতীয় কর্মপ্রবৃত্তির মূল হল মানুষের স্বার্থবোধ, যেটি অর্থনৈতিক চর্চার মূলকথা। তাঁর ভাষায় "অর্থনীতির সার হইতেছে রাজনীতি''।[২৬] দেশবাসীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট উন্নতির জন্যে রাজনীতির কথা ওঠে। তিনি বলেন যে পরাধীনতার ফলেই ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতি—সমাজও মুমূর্ষু। দেশবাসীর উন্নতির অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে "ভারতীয়

মানবকে বিমুক্ত করিতে হইবে যাহাতে সে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তি অনুযায়ী মানবীয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।"[২৭]

'স্বরাজ' শব্দটির তিনি মার্কসীয় দৃষ্টিতে একটি ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেন। তাঁর মতে সমাজকে এমন অবস্থায় আনতে হবে যাতে সমাজ নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নিতে পারে। অর্থাৎ—

যে অবস্থাতে সমাজ স্বীয় শাসনাধীন হইতে পারে সেই অবস্থাকে স্বরাজ বলে।[২৮]

সমাজের সে-অবস্থা প্রাচীনকালে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে স্টেট-এর উদ্ভব হয় সেদিন থেকে সমাজ আর স্বায়ত্তাধীন নয়। তাই মার্কসীয় দৃষ্টিতে তিনি বলেন যে, আজকালকার রাষ্ট্র হল একটি বিশিষ্ট শ্রেণী বা লোকসমষ্টি যারা সমাজের বেশির ভাগ লোকের উপর বলপূর্বক শাসন করে—একটি বিশিষ্ট শ্রেণী অন্যসব শ্রেণীর উপর রাজত্ব করে। রাষ্ট্রের অধিকার ও সুখস্বাচ্ছন্দের ফল ভোগ করে একটি বিশিষ্ট শ্রেণী। তারা বংশানুক্রমে ও টাকার জোরে অন্যদের পরাধীন করে শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয়। মুষ্টিমেয়র এই শাসনকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখার জন্যে সরকারের যাবতীয় আইনকানুন, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলি পদানত শাসিতদের উপর প্রয়োগ করা হয়।

এখানেও ভূপেন্দ্রনাথ মার্কসীয় প্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি করে বলেন--

সমাজ মুক্ত হইলে বা তাহার স্বরাজের অবস্থায় 'স্টেট' লোপ পাইবে। সমাজ নিজহস্তে শাসনযন্ত্রগুলিকে এনে নিপীড়ক যন্ত্রগুলি বর্জন করবে। বরাজ সেইদিন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে যেদিন সমাজ একটা বিশিষ্ট শ্রেণীর শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে 'freeman's citizenship'।[২৯]

প্রসঙ্গত একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে শ্রেণীহীন সমাজ যদি চূড়ান্ত আদর্শ হয় তাহলে মার্কসীয় নির্দেশানুসারে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর অন্তর্বর্তীকালীন একনায়কত্বের কি প্রয়োজন? একটি শ্রেণীর পরিবর্তে অন্য একটি শ্রেণী যাবতীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। পুঁজিবাদ যদি উচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে শোষক ও শোষিত বলে কিছু থাকবে না। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের পরিবর্তে সরাসরি শ্রেণীহীন গণতান্ত্রিক সমাজ, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা হবে অবাধ, সে রকম সমাজ প্রতিষ্ঠা করলেইতো হয়। দ্বিতীয়ত, পীড়নের যন্ত্র রাষ্ট্রের অবসান কার্যত কোনোদিন সম্ভব নয়। ভূপেন্দ্রনাথ এইসব বিতর্কে যান নি।

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের মূলমন্ত্র অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ হল "ব্যবসায়জীবী অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বশ্রেণীর প্রেমিকতা"। এদেশে উক্ত শ্রেণী নির্ধন গণসমূহকে মাথায় তুলতে চায় না, যদিও নিজস্বার্থে তাদের খেপাতে সদাই উদ্যত। সেদিক থেকে পাশ্চাত্ত্যের ও এদেশের অভিজাত শ্রেণীর মনোভাব একই।[৩০]

তাঁর মতে পুরাকালে 'ন্যাশান্যালিটি'-র ভিত্তি ছিল ধর্ম। সেজন্যে তিনি বলেন—

> প্রাচীন ও মধ্যযুগে state ও religion একাঙ্গীভূত ছিল। তৎকালে ধর্ম্মের বন্ধন দ্বারা একটা people সৃষ্ট হইত। এই সময়ে 'nation' ও 'nationality' …প্রভৃতি ভাব ছিল না, এ ভাব হালের।

মধ্যযুগে ইউরোপের সভ্যতা যখন উত্তরাগত বর্বরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন ধর্মই জাতিবন্ধনের কাজ করে। ফরাসি বিপ্লবের পরে পশ্চিম ইউরোপে অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক স্বার্থের উপাদানে 'ন্যাশান্যালিটি' গঠিত হয়। ভারতীয় নেশন সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল যে "ভাষা ও ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকারের, কিন্তু জাতিতত্ত্ব ও চর্চার হিসাবে ভারত একত্বপ্রাপ্ত দেশ"। তাছাড়া সমগ্র ভারত একই শাসনাধীনে আসায় সকল সম্প্রদায় ও প্রদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ অভিন্ন হয়ে ওঠে। এবং একই শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় ভারত একটি নেশন হিসেবে পরিণত। স্বরাজ প্রাপ্তির পর ভারতীয় নেশন আরও সুসংবদ্ধ একটি ন্যাশনাল স্টেট হবে বলে তার ছিল দৃঢ় বিশ্বাস।[৩১]

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমবর্ধিষ্ণু সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক নেশনচিন্তার লক্ষণ ভূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি আশঙ্কা করেন—

> তাহা হইলে ভারত একটি Federation of Nationality-তে পরিণত হইবে এবং একজাতীয়তাপ্রাপ্ত ভারতীয় জাতি গঠন সম্ভব হইবে না।

তাই তিনি বলেন যে, ভারতীয় একজাতীয়ত্ব সম্ভব যদি পরস্পরস্বীকৃত একটি 'lingua franca' প্রবর্তিত হয়। হিন্দীভাষাকে সে ব্যাপারে গ্রহণের চেষ্টা যে ফলপ্রসূ হয় নি সেকথা তিনি উল্লেখ করেন। কিন্তু বিকল্প ভাষা সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট কিছু না বললেও ইংরেজি ভাষাকে সেকাজে ব্যবহার করার প্রস্তাবে তাঁর প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছিল।[৩২]

হিন্দু-মুসলমান সমস্যার পিছনে তিনি শ্রেণীস্বার্থ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকেই মূল কারণ বলে মনে করতেন। তবে সবকিছুর পিছনে তিনি গণশ্রেণীর উত্থানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ-সমস্যার স্থায়ী সুরাহা হিসেবে তিনি বলেন—

> ভবিষ্যতের ভারতবাসী হিন্দুও হইবেন না বা মুসলমানও হইবেন না। তিনি ভারতীয় নাগরিক হইবেন…সমস্ত সভ্য দেশে ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু নাগরিক জীবনে সকলে একীভূত। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে সভ্যতার সে ক্রমবিকাশ হইতে পারিতেছে না। বিশেষতঃ যখন অতীতকে আদর্শ বলিয়া প্রচার করা হইতেছে।[৩৩]

একজাতীয়তা আনয়নের প্রস্তাবসূত্রে ভূপেন্দ্রনাথ শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী-সমন্বয়ের সুপারিশ করেছেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থনীতিক অবনতির ফলে তারা শ্রমিকদের

সমান অর্থাৎ "proletarianised" হয়ে পড়ছে। শ্রমিকেরা দৈনিক বা সাপ্তাহিক বেতনজীবী, আর গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী মাসিক বেতনজীবীতে পরিণত। উভয় শ্রেণী সমগোত্রে পর্যবসিত। ভারতের গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণী শ্রমিকতুল্য হচ্ছে না। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, তাদের কপালে স্বরাজ নেই। তাই তিনি এই অভিমতে পৌঁছন যে স্বরাজ লাভের জন্যে মধ্যবিত্তের শিক্ষা ও শ্রমিকদের শ্রম—উভয়ের সমবায় হওয়া একান্তই আবশ্যক। এই উভয় শ্রেণী সমচেষ্টিত হয়ে সমাজ মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাদবিসংবাদ, শ্রেণীগত স্বার্থবিভেদ, অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রভৃতি দূর করে একজাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করুক।[৩৪]

তিনি উপলব্ধি করেন যে ধর্ম ও রাজনীতি মিশিয়ে ধর্মান্ধতার সাহায্যে কার্যোদ্ধারের দিন যেমন চলে গেছে, তেমনি চিরাচরিত বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি অর্থাৎ "Street barricade, individual terrorism দ্বারা দেশ স্বাধীন করার যুগও চলিয়া গিয়াছে"। মাৎসিনি ও বাকুনিনের যুগও আর নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি অনুভব করেন—

> পূর্বের ন্যায় গুপ্ত সমিতি দ্বারা স্বাধীনতাবাদ প্রচার ও রাজনীতিক ডাকাইতির দ্বারা বৈপ্লবিক কর্ম্মের জন্য অর্থসঞ্চয় করার সময় চলিয়া গিয়াছে।[৩৫]

তবে বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে লক্ষ্যে (end) পৌঁছনর জন্যে ভূপেন্দ্রনাথ সম্ভাব্য যে-কোনো প্রণালী (means) অবলম্বনে বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ প্রণালী নির্ধারণে আধ্যাত্মিক নৈতিকতার প্রশ্নকে মানতেন না। তাঁর মতে, প্রণালীর শুভাশুভ প্রশ্নটি ভাবপ্রবণতার ফলে উদ্ভূত।[৩৬] এবিষয়ে গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভূপেন্দ্রনাথ যে স্বরাজের কল্পনা করেছিলেন তার রূপায়ণের জন্যে সংঘবদ্ধ প্রয়াস হিসেবে কোনো রাজনৈতিক দল গঠনের পরিবর্তে তরুণ ও যুবকদের সংঘবদ্ধ করার উপযোগিতা অনুভব করেন। তাঁর মতে সেইসব তরুণ ও যুবকদের অবশ্যই মার্কসীয় আদর্শ অনুসারে "declassed" হতে হবে, অর্থাৎ সবাইকে সর্বহারার স্বার্থে মনেপ্রাণে নিজ শ্রেণীস্বার্থ ত্যাগ করতে হবে। শ্রেণীস্বার্থ বিলীন করার বিষয়টিকে তিনি প্রাচীন ভারতীয় নজিরে বলেন যে, বুদ্ধ, মহাবীর প্রমুখ অভিজাত পুরুষেরা রাজবংশে জন্মেও গণশ্রেণীর স্বার্থে জীবনপাত করেন। "গণশ্রেণী" বলতে তিনি শ্রমিক কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বোঝাতেন। মার্কসের সর্বহারা প্রত্যয় কেবল শিল্পশ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভূপেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, "ত্যাগী শিক্ষিত যুবকের দল" যারা অজ্ঞ মূর্খ গণশ্রেণীকে শিক্ষিত করে স্বরাজ আনয়নের বাহনস্বরূপ প্রস্তুত করবে।[৩৭]

সেই উদ্দেশ্যে দেশে একটা সংঘশক্তি সৃষ্টির তাগিদে ভূপেন্দ্রনাথ এক ধরনের সমষ্টিবাদের (collectivism) সুপারিশ করেন। তিনি চেয়েছিলেন "শৃঙ্খলাবদ্ধ ও কেন্দ্রীভূত" একটি সংগঠন তৈরি করতে। তিনি লক্ষ করেন যে, প্রবীন ও বৃদ্ধরা সমাজ সংরক্ষণ ও বিভিন্ন মত ও পথের সংগঠন নিয়ে

ব্যস্ত। তাঁদের মনকে গড়েপিটে একই ধাঁচে তৈরি করে তোলা শক্ত। অন্যদিকে তরুণদের "কাঁচ মন নিষ্মর্ল ও নরম থাকে" বলে তাদের "নূতন ছাঁচে ঢালিয়া নূতন ভাবে গঠিত করা সম্ভব।"[৩৮] বক্তব্যটি তিনি হয়তো নির্দোষ সরল বিশ্বাসেই রেখেছিলেন। কিন্তু পরিণামে সেটি স্বৈরতন্ত্র তথা ফ্যাসিবাদী সমাজের পক্ষে অনুকূল।

প্রাচীনকালে ধর্মের মাধ্যমে সমাজকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করার নজির দেখিয়ে তিনি বলেন যে, যেসব ধর্ম সমষ্টিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সেগুলি সহজে সংঘবদ্ধ হয়েছে এবং সেই সব ধর্মের উপাসকেরা অপরের উপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছে। যে সমাজ যত বেশি সমষ্টিবাদের প্রভাব দেখাতে পেরেছে, সেই সমাজের সভ্যরা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মে সংঘবদ্ধতা থাকার ফলে অন্যান্য দেশে প্রভাব বিস্তার করে। পক্ষান্তরে ছুঁৎমাগ, জাতিবিচার, খাদ্যাদির বিচার ও নানা সংস্কারে শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দু ধর্ম সমষ্টিবাদের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে তিনি আক্ষেপ করেন। অবশ্য তাঁর সমসাময়িক ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে সংঘবদ্ধ করলে ফল যে শুভ হবে না সেকথা তিনি অনুভব করেন। তিনি বলেন, দেহ ও মনের ক্রমবিকাশের জটিল ধারায় মানুষ শৃঙ্খলিত হয়ে ও বিশিষ্টত্বগুণে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে।[৩৯]

বক্তব্যটিকে আরও প্রসারিত করে তিনি বলেন যে, মনের ক্রমবিকাশে উচ্চাঙ্গের সংঘশক্তি দেখা দেয় এবং একতার পরিপূর্তি ঘটে। তাতে কাজের সুবিধা হয়। মনের ক্রমবিকাশের ফলে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরে উত্তরণ ঘটে। বুদ্ধিবৃত্তি ও সামাজিক জীবনের উন্নতি ঐক্যবদ্ধতার উপর নির্ভর করে। তাঁর বিচারে একটি জাতির সংঘবদ্ধ জীবন তিন ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা নির্ধারিত হয়:

১. কাঠামো ও ক্রিয়ার মধ্যে অনুবন্ধতা; ২ ব্যক্তির বিভিন্ন কাজ ও জীবনের মধ্যে সাযুজ্য এবং ৩. বিভিন্ন ব্যক্তির কর্ম ও সমাজজীবনের মধ্যে পারম্পর্য।[৪০]

দ্বিতীয়ত, শরীরের বিভিন্ন অংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর যেমন জীবনের উন্নতি নির্ভর করে, তেমনি জীবনের উচ্চাঙ্গের সুষমতার উপযোগী এমন এক অবস্থার উদ্ভব ঘটে, যার সাফল্য কেবল বুদ্ধি দ্বারা চালিত, কাজেই সম্ভব। "ক্রমবিকাশের ধারা process in organisation-এ পর্যবসিত হয়" বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

উল্লিখিত তত্ত্ব ভারতের বিশৃঙ্খল সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তিনি "Evolution of the Indian mind" কে পরিপূর্ণ করে তোলার প্রয়োজন দর্শিয়েছেন। জীবতত্ত্ব অনুসারে একট "natural selection"-এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত জাতীয় মানস গঠনের পন্থায় তিনি আপত্তি করেন। কারণ তাতে

বেশির ভাগ বিনষ্ট হয়ে কেবল একটি "type" অস্তিত্ব বজায় রাখে, কিন্তু সংঘবদ্ধ জীবন "পরস্পরের মধ্যে সংগ্রাম দ্বারা পরিবর্ধিত হয় না, বরং পরস্পরের সহানুভূতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রীবৃদ্ধি পায়।" তাই তিনি বলেন—

> Struggle for existence বন্ধ হইলে জীবের নানা দিক দিয়া উন্নতির সুবিধা হয়।[১]

এখানে তিনি অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ ও শ্রেণী সংগ্রামের মার্কসীয় প্রত্যয় থেকে সরে গেছেন। কিংবা হয়তো তিনি শ্রেণীহীন সমাজের অবস্থায় তত্ত্বটি প্রয়োগ করার কথা ভেবেছিলেন। মোটের উপর বক্তব্যটি তাঁর অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট।

উন্নত জাতীয় জীবন ও সেইসঙ্গে একটা জাতীয় মন বিকশিত করে তোলার প্রশ্নে ভূপেন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট অভিমত ছিল যে, তার জন্যে সাম্প্রদায়িকতা ও বর্ণভেদমূলক সংগ্রামের পথ ছেড়ে বুদ্ধির সাহায্যে সামাজিক সমবায় পন্থা গ্রহণ করা। একটি জাতীয়তাপ্রাপ্ত ভারতীয় জাতি গঠনের এইটেই তাঁর মতে একমাত্র পথ। ভারতীয় সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের প্রতিকার হিসেবে তিনি মনে করতেন—

> ভারতীয় মানব-জীবনে যত সংঘবদ্ধতা আনয়ন করিবে, তাহার জীবনের কর্ম্ম যত complex ও highly specialised হইবে, তাহার সমাজ যত centralised হইবে তাহার evolution তত উন্নত ও অগ্রগমনশীল হইবে।[২]

ভূপেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সমাজদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে একটি "complete organic whole" হিসেবে গড়ে তুলতে। এজন্যে "অনুবন্ধ পরস্পরনির্ভরতা ও পারস্পরিক অধীনতা" ঘটবে।

সংঘশক্তি গড়ার উপযোগী উদ্যোগ ও উদ্যমের জন্যে তিনি একমাত্র তরুণদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাদের মধ্যে 'ডিসিপ্লিন' অর্থাৎ শৃঙ্খলাবোধ সঞ্চারের তাগিদে তিনি প্রত্যেককে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধীন কুচকাওয়াজ করানোর প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। কারণ "sergent's drill whip" মানব-জীবনে "শৃঙ্খল আনিবার একটি উপায়"। সোভিয়েত রাশিয়া ও রিপাবলিক্যান জার্মানির আদর্শে প্রস্তাবিত যুব আন্দোলন ও সেচ্ছাসেবক বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য হবে "সমাজের যে কোন কার্যের জন্য আদেশমত একত্রিত হতে পারা।"[৩]

সমাজতত্ত্ব

ভূপেন্দ্রনাথের মননশীল সৃজনকর্মের প্রধান বিষয় ছিল সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব। তাঁর বৃহৎ তিনটি গ্রন্থে সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে প্রাচীনকাল থেকে

আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজবিবর্তনের অনুপুঙ্খ বিবরণ ও বিশ্লেষণের তুলনামূলক আলোচনা দেখা যায়। তিন খণ্ডে 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি', দুখণ্ডে 'ডায়ালেকটিকস অফ হিন্দু রিচুয়ালিজম' এবং এক খণ্ডে প্রকাশিত 'স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়ান সোসাল পলিটি' নামে গ্রন্থ তিনটিতে তিনি ভারতীয় সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের আলোচনা করেছেন। সর্ববিধ দর্শন ও ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন লেখকের টীকা ও ভাষ্যের সাহায্য নিলেও তাঁর এবিষয়ে মৌলিক চিন্তারও পরিচয় আছে যথেষ্ট। বলা বাহুল্য তিনি মার্কসীয় বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করেন।

'ডায়ালেকটিকস অফ হিন্দু রিচুয়ালিজম' বইতে তিনি বৈদিক কাল থেকে হিন্দু ধর্মের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা তুলে ধরেছেন প্রাসঙ্গিক আলোচনায়। তাতে তাঁর মূল সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেয়ে হিন্দু ধর্মের ইতিহাসই যেন প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর মতে প্রসারিত দৃষ্টিতে রাজনীতি ধর্মের একটি অঙ্গ। নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বিচারে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানে বিশেষ কোনো নরগোষ্ঠীর সামাজিক বিধিব্যবস্থার উদ্ভব ও বিবর্তনের পরিচয় মেলে। তাঁর কথায় "বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতে সকল প্রকারের লোককে একটা নিখিল ভারতীয় শাসনের অন্তর্গত করিয়া ও একছাঁচে ঢালিয়া একত্বপূর্ণ একজাতি করা দুঃসাধ্য ছিল।" রাজনৈতিক একত্ববোধ সৃষ্ট হতে পারে নি বলে হিন্দুরা "কৃষ্টিগত একজাতীয়তা (cultural nationality) ভাব" তৈরি করেছিল; তার, মূলে ছিল হিন্দুধর্ম।"[১] এক্ষেত্রে ম্যাকস ওয়েবার-এর ধর্মীয় দৃষ্টিতে সমাজতত্ত্বের বিচারভঙ্গির সঙ্গে তাঁর চিন্তার মিল দেখা যায়।

প্রাচীন ভারতের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বেদই হল ভারতীয় ইতিহাসের আদিগ্রন্থ। বেদের পুরুষসূক্ত ব্যতিরেকে আর কোথাও শূদ্রের উল্লেখ নেই। কোনো কোনো ভারততত্ত্ববিদের মতে পুরুষসূক্ত উত্তরকালে সংযোজিত হয়। যজুর্বেদ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে চতুর্বর্ণের ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথের মতে ঋগ্বেদ থেকে ব্রাহ্মণ রচনাকাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের বিবর্তনের কথা জানা যায়। ষষ্ঠ ও সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ অবধি অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন ছিল। আহারাদিতে কোনো বর্ণবৈষম্য থাকত না। বৈদিক যুগে বর্ণবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতা ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রমুখ নৃপতিদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, শূদ্ররা প্রভূত ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হত।[৪৫]

তাঁর মতে প্রাচীন ভারতের বর্ণবৈষম্য আসলে ছিল শ্রেণী সংগ্রামের একটি প্রাথমিক পর্ব, যখন ধর্মীয় সংঘাতেই শ্রেণী সংগ্রামের লক্ষণ দেখা যেত। বৌদ্ধ ভাববিপ্লবের পশ্চাতে তিনি মার্কসীয় মতানুসারী অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ

প্রত্যক্ষ করেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ রামায়ণে ব্রাহ্মণদের ভাষ্যেই দেখা যায়। জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ ক্ষত্রিয়দের অনুকূল। ব্রাহ্মণদের পুরোহিতের কাজ কুক্ষিগত করার পিছনে ছিল যথার্থ শ্রেণী সংগ্রাম, বৌদ্ধযুগে ক্ষত্রিয়রা নিজেদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে দাবি করে। পুরোহিত শ্রেণীর রক্ষণশীল সমাজশাসনের বিপক্ষে গড়ে ওঠে ক্ষত্রিয়দের বৈপ্লবিক সমাজচিন্তা। শূদ্র চন্দ্রগুপ্তর প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ কৌটিল্য। সমাজতাত্ত্বিকদের সাধারণ অভিমত অনুসারে ভূপেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে পেঁছিন যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধর্মীয় দ্বন্দ্বসংঘাতের পিছনে কাজ করত অর্থনৈতিক শ্রেণীসংগ্রাম।[৪৬]

শাস্ত্রগ্রন্থে ইন্দো-আরিয়ান সমাজের বর্ণবৈষম্যের কথা থাকলেও ভূপেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সেটা ছিল একটা "মিথ"। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নানা বিভাজন ছিল। কিন্তু সেগুলি ছককাটা বর্ণবিন্যাসে রূপ নেয় নি। বিভিন্ন বর্ণের অন্তর্গত লোকেরা তাদের পেশা যথেচ্ছ পরিবর্তন করত, তাতে তাদের সামাজিক মানমর্যাদা বজায় থাকত। এই নিরিখে তিনি তাই বলেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী গ্রন্থে প্রাচীন সমাজের মিথ্যা বিবরণ দেওয়া হয়েছে।[৪৭] ভূপেন্দ্রনাথের এই অভিমত অতি সরলীকৃত ও স্ববিরোধী। কারণ প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদির সাহায্যেই তিনি বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। বেদ, উপনিষদ ও পুরাণ সমূহ দীর্ঘ কাল ধরে বিভিন্ন পর্যায়ে রচিত হয়। বিভিন্ন কালপর্বে সামাজিক পরিবর্তন অনুযায়ী অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের রদবদল ঘটে থাকতে পারে। সেজন্যে শাস্ত্রগ্রন্থে পারম্পর্যের অভাব থাকা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, সামাজিক সাম্য যদি যথার্থই থাকত, তাহলে বর্ণবৈষম্যের মধ্যে তিনি শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষণ কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ?

তিনি বলেন যে, আদি পর্বে এক একটি কৌমের প্রবর্তনের নাম অনুসারে গোত্রের প্রবর্তন হয়। কর্মসূত্রে বর্ণবিভাগের সময় গোত্র অপরিবর্তিত থাকত। উত্তরকালে শূদ্ররা তাদের পুরোহিতের নাম গোত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। পরবর্তীকালে গোষ্ঠীর (guild) পরিবর্তে পেশা অনুসারে অসংখ্য জাতপাতের (caste) উদ্ভব ঘটে। তাই দেখা যায় চতুর্বর্ণের স্থান নিয়েছে পরস্পরবিচ্ছিন্ন পেশাগত জাত বা সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও পেশাগত যজমান সম্প্রদায়ের পুরোহিত হিসেবে কাজের দরুন উচ্চনিচ ব্রাহ্মণ্যবর্গের সূত্রপাত হয়। তাই ভূপেন্দ্রনাথের মতে চতুর্বর্ণের কাহিনী ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের অধিকারের দাবি নিছক কিছু "মিথ" ছাড়া আর কিছু নয়।[৪৮]

বর্ণ ও জাতপাত এক নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। কর্মানুসারে জাতপাতের বিভেদ ও বৈষম্যের ভিত্তি হল অর্থনৈতিক। পেশাগত দিক থেকেই হিন্দুদের জাতপাতের উদ্ভব এবং সামাজিক স্থান ও মান নিরূপিত হয়ে এসেছে। তাঁর মতে অর্থনৈতিক এই জাতপাতের বৈষম্যের মধ্যেই শ্রেণীর বীজ

নিহিত ছিল।

উপনিষদের কাল থেকেই অস্পৃশ্যতা প্রচলিত হয় বলে তিনি মনে করতেন। নানা রকমের আচার ও বিশ্বাস এবং শুচিতার প্রশ্ন থেকেই শ্রেণীচরিত্র দানা বাঁধে। ভারতীয় সমাজ যখন ক্রমেই সামন্ততান্ত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে, আচার-বিশ্বাস ও শুচিতার প্রশ্নে এই শ্রেণীবিভেদের নতুন চেহারা ফুটে ওঠে। শাস্ত্রগ্রন্থে জাতপাতের স্থান ও মান, পেশার ধরন, জন্ম ও বংশানুক্রমিক উচ্চনিচতার আলোচনা শুরু হয়। হিন্দু সমাজে জলচল ও অস্পৃশ্যতার প্রথা অবিচ্ছেদ্য আকার নেয়। শ্রেণীচরিত্র থেকে শ্রেণীসংঘর্ষ শুরু হয়। বিভিন্নভাবে সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তারসূত্রে যে-সংঘাত পরিণামে শ্রেণী সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয় সেটা আর্থ-সামাজিক সম্প্রদায় হিসেবে ভারতে জাতপাতের উৎপত্তি ও উৎসের সন্ধান দেয়। পুরুষসূক্ত হিসেবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের অনুশাসন যথার্থ উৎস ছিল না বলেই ভূপেন্দ্রনাথ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪৯]

ভূপেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, রাজশক্তি জাত বা সম্প্রদায় বিশেষের সামাজিক মানমর্যাদা চিহ্নিত করত। তাই ভারতে সামন্ততন্ত্রী যুগে রাজশক্তিকে ধর্ম ও জাতপাতের নিয়ন্তা বলে মনে করা হত। সামন্ততন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিটি আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থ সংরক্ষণের উপযোগী জাতপাতের বৈষম্য প্রাচীর হিসেবে ব্যবহৃত হত। তাঁর মতে "সামন্ততন্ত্রী পুঁজিবাদী" ব্যবস্থাসূত্রে গঠিত অর্থনৈতিক কর্মবিভাজন ধর্মীয় জাতপাতের সৃষ্টি করে। পেশাগত এক একটি জাতের নিজস্ব আচরণবিধি ও গরিমাবোধ সঞ্চারিত হয়। অবশ্য সেই সঙ্গে "সামন্ততন্ত্রী হিন্দু দর্শনের কর্মফলের নির্দেশ" কাজ করে।

পরিশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, স্মৃতিশাস্ত্র ও বিভিন্ন জাত ও উপজাতের ধর্মীয় অনুশাসনের পরিবর্তে ভবিষ্যৎ ভারতের সমাজব্যবস্থা যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাভাবনার উপর স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। সেভাবে দেশের পরিবর্তন হলে ভারতের "নেশানহুড" সবল হবে।

নেশানহুড প্রত্যয়টিকে বিস্তারিত করে তিনি বলেন যে, অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও কৌমগত (tribal) সামাজিক সংঘবদ্ধতা থেকে জনপদগত (territorial) সংঘবদ্ধতা বিবর্তিত হয়। ক্রমে রক্তের সূত্রে আত্মীয়তার পরিবর্তে স্থানীয় ভূমির দ্বারা সামাজিক সংঘবদ্ধতা দানা বাঁধে। কিন্তু হিন্দুজাতির সমাজ বিভিন্ন সমাজের সমষ্টি। অন্যান্য দেশে জনপদগুলি একত্র একজাতিতে (nationhood) বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু শতধা বিভক্ত বিভিন্ন হিন্দুসমাজ একজাতিত্বে সংযুক্ত হয় নি। ভারতে মুসলমান যুগে জনপদ, ভাষা ও সংস্কৃতির একত্বের মাধ্যমে ভারত একজাতিত্বের দিকে বিবর্তিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলে রাজনৈতিক কারণে প্রাদেশিক স্বজাতিকতাতে বিবর্তিত হয়েছে। ক্রমে বিভিন্ন

প্রদেশবাসীরা কুলগত, ধর্মগত একত্ব ভুলে ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্নতা বাড়িয়ে তুলেছে।[৫০]

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতে প্রাচীনকালে চতুর্বর্ণের সবাই এক গোত্রীয় ছিল। সামাজিক স্তর ও শ্রেণীবিভাগে তারা পৃথকীকৃত হয়। প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংগঠন ও প্রচার না থাকলেও আদিম অধিবাসীদের হিন্দুত্বে ধর্মান্তরিত করার প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর মতে রাজনৈতিক কারণে আদিম কৌমপ্রথা ভেঙে অনেক কৌম আর হিন্দুধর্মের অন্তর্গত হতে পারছে না, অর্থাৎ ধর্মান্তরকরণ প্রায় নিষিদ্ধ। তার কারণ সম্পর্কে তিনি কোনো ব্যাখ্যা করেন নি। অবশ্য তিনি একথা জানিয়েছেন যে, ধর্মান্তরিত নতুনেরা প্রাচীন আর্যদের পুরাণকথিত জনশ্রুতি ও ইতিহাস নিজেদের বলে জাহির করার ফলে "হিন্দুর অচলায়তন সমাজ-পদ্ধতি" তাদের স্থানুবৎ নিশ্চেষ্ট করে।

তাই তিনি আক্ষেপ করেছেন যে, "এই অবস্থার বিরুদ্ধে তাহার মনে কোন দ্বন্দ্বভাব (anti-thesis) উদয় হয় না।" অধিকন্তু ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে নিজেদের প্রাক্তন কর্মফল, পুনর্জন্ম ও দেবদ্বিজে ভক্তির মাহাত্ম্য দুর্বোধ্য ভাষায় তাদের শুনতে হয়।[৫১] এমতাবস্থায় তাঁর ব্যবহারবহুল ডায়ালেকটিকসের তত্ত্ব যে অচল সেটা ভূপেন্দ্রনাথের উক্তিতেই ব্যক্ত। ইংরেজি শিক্ষার ফলে তিনি যে ধূমায়মান বিদ্রোহ লক্ষ করেন সেটাও আজ আশানুরূপ কার্যকর হয় নি।

হিন্দু-রাষ্ট্রে বিভিন্ন শ্রেণীর স্থানসূত্রে তিনি বলেন যে, "হিন্দু-রাষ্ট্র যোদ্ধৃ ও ধর্ম্মভাব সমন্বিত রাষ্ট্র (Military-Sacerdotal State)।" তবে "দেব-রাষ্ট্রে (Theocratic State)" পরিণত হয় নি। দুটির মধ্যে পার্থক্য কি তা তিনি বলেন নি। বলেছেন যে, সেসময়ে রাষ্ট্র "সেকিউলার" ছিল না। ধর্ম রক্ষাই ছিল রাষ্ট্রের কর্তব্য। সেটা কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ—উভয় অবস্থায় দেখা যেত। তাঁর মতে "হিন্দু রাষ্ট্র কোন কালেই শ্রেণীবিহীন ছিল না।" বর্ণাশ্রমেই সেটা নিহিত। শ্রেণীবিভাগে অধিকারভেদ ছিল স্পষ্ট। রাষ্ট্রীয় অধিকার-ভেদের সঙ্গে আহার, বিবাহ, উপাসনা ইত্যাদি অধিকারভেদ জড়িত ছিল।[৫২]

জাতিতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের ধারায় পণপ্রথার উদ্ভবসূত্রে তিনি মনে করতেন যে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় "অন্য কৌম বা কুলের কন্যা কাড়িয়া নিয়া বিবাহ" প্রথায় রক্তপাত হত। কন্যার পিতা কন্যার বিনিময়ে পণ নিত। সেটাই ছিল 'পণ' বা শুল্ক। পরবর্তী পরিবর্তিত অবস্থায় বর কিংবা কনে—উভয় দিক থেকেই পণ আদায়ের প্রথা দেখা দেয়। বর্তমানে বিভিন্ন বিরুদ্ধ আন্দোলন সত্ত্বেও পণপ্রথার অবসানের পরিবর্তে পণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রেও ডায়ালেকটিকসের সূত্র সক্রিয় হয় নি।

হিন্দু আইনের উৎস প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, 'ধর্ম্মশাস্ত্র' ও 'অর্থশাস্ত্র' নামে দুধরনের আইনপুস্তক ছিল। যথার্থ সিভিল ও ক্রিমিন্যাল আইন ছিল অর্থশাস্ত্রেই নিহিত। উভয়ের মধ্যে বিরোধ লাগলে ধর্মশাস্ত্রের

বিধান বলবৎ হত। তিনি শাস্তি সম্পর্কে রাজকীয় আইন ছাড়াও 'প্রায়শ্চিত্ত' নামে আর একটি সামাজিক আইনের উল্লেখ করেছেন। তার সাহায্যে বিচার ও দণ্ডদান রাজা মনোনীত একটি পরিষদ পরিচালনা করত। রাজার অনুজ্ঞাই চূড়ান্ত আইন ছিল বলে তিনি লিখেছেন।[৫৩]

হিন্দুর ধর্মীয় আইন সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, "সেসব পুরোহিত-তন্ত্রের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণকল্পে খেয়ালপ্রসূত যুক্তিবিহীন আদর্শমাত্র, তাহার প্রকৃষ্ট নজীর মধ্যযুগের স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন।" তাঁর বিধান বাংলার সমগ্র হিন্দুদের উপর কার্যকর হয় নি। সেসব হিন্দু বিধবাদের উপর দুর্বিষহ ও পীড়াদায়ক হয়ে আছে। সতীদাহ তার অন্যতম। মোটের উপর হিন্দু আইন তাঁর মতে "মূলতঃ রীতি ও আচারের (custom and usage) উপর প্রতিষ্ঠিত।" এককালে যেসব কৌমগত রীতি ও আচার ছিল সেগুলি ঈশ্বরের আপ্তবাক্য (revelation) বলে ধর্মের অনুশাসনে স্থান পায় এবং লোকপীড়নের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করে। তিনি তাই আক্ষেপ করেছেন যে, "আজকালকার হিন্দু তাহা হইতে বিবর্তিত হইয়া বাহির হইতে পারিতেছে না।" সম্ভাব্য সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখা তিনি করেন নি।

উল্লিখিত অনভিপ্রেত প্রবণতার পরিণতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক "রীতি এবং আচার ও ব্যবহারের 'একত্ব' দ্বারা সকল প্রকারের লোক একজাতিগত মনোবৃত্তি (national mind) প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা হিন্দু সভ্যতায় পাওয়া যায় না···প্রাচীন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানগুলি আজ হিন্দুর একত্ববোধের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে।" ধর্মপদ্ধতি প্রসূত সমাজনীতি হিন্দু সমাজকে শাসন করছে বলে ভারত এতদিনেও সভ্যতার নতুনস্তরে উঠতে পারে নি বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।[৫৪]

ভূপেন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, ভারতে মুসলিম শাসনের প্রথম দিকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্পর্শদোষ ছিল না। উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আহার ও বিবাহেরও প্রচলন ছিল। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হিন্দুরা তাদের প্রাচীন কৌমগত আচারবিচারও অনুসরণ করত। কিন্তু যখন "মুসলমান শাসকেরা গোঁড়ামীকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মরাষ্ট্রীয় শাসন আরম্ভ করিলেন তখনই হিন্দুর উপর নির্যাতন শুরু হইল।" কোনো কোনো ধর্মান্তরিত মুসলমান আবার হিন্দুধর্মে ফিরে যেতে শুরু করলে, তাদের ইসলামের অনুশাসনে মৃত্যুদণ্ড বিধিত হতে থাকে এবং পুরোনো সামাজিক রীতিনীতি ছিন্ন করার জন্যে ফতোয়া জারি হয় এবং ধর্মান্তরিত মুসলমানদের অভারতবাসী করে তোলার চেষ্টা হতে থাকে। ক্রমে পৈতৃক বাসভূমিকে বিদেশাগত হিসেবে উপনিবেশ বলে গণ্য করার মানসিকতা সৃষ্ট হয়। প্রায় এক হাজার বছর একই দেশে বসবাস সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো পরিমিশ্রণ না ঘটুক, তাদের বিভেদ-বিদ্বেষের সম্ভাব্য একটা প্রধান কারণ

ভূপেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন।

'সংস্কৃতি' ও 'সভ্যতা' শব্দ দুটিকে তিনি সমার্থক বলে মনে করতেন না। ইঙ্গ-মার্কিন সমাজতাত্ত্বিকদের পরিবর্তে জার্মান পণ্ডিতদের অভিমত অনুযায়ী তিনি বলেন—

> সংস্কৃতি (culture) মানবের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে...মানব তাহার উদ্ভাবনী ও চিন্তাশক্তি দ্বারা cultural goods সৃষ্টি করে এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের উন্নতি বিধানকে civilising process বলা হয়।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ উন্নতি বিধান প্রক্রিয়া যে-জাতির মধ্যে যত প্রয়োগ হয় সেই জাতিকে তত সুসভ্য বলা হয়। সভ্যতা অপরের থেকে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু সংস্কৃতি মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির (spiritual force) উপর নির্ভর করে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী হিন্দু সংস্কৃতিবান ব্যক্তি একজন "culture man"। কিন্তু হিন্দুর সাংস্কৃতিক উপাদানে সৃষ্ট অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সর্বজনে প্রযুক্ত হয় নি বলে তারা তাঁর দৃষ্টিতে সর্বাংশে সভ্য নয়। তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন—

> আজ সুসভ্য দেশ সমূহের মাপকাঠিতে ভারতের আপামর সুসভ্য না হইতে পারে—প্রত্যেক ভারতবাসী civilisation-man না হইতে পারে, কিন্তু ভারত যে culture-man বিশিষ্ট...তাহা পক্ষপাতশূন্য পণ্ডিতগণ অস্বীকার করিতে পারেন না।[৫৫]

এখানে লক্ষণীয় যে ভূপেন্দ্রনাথ মার্কসীয় super-structure তত্ত্বের অবতারণা করেন নি। তিনি নিজস্ব অভিমত প্রয়োগ করেছেন।

ভারতীয় সভ্যতার উন্নতিকল্পে তিনি চেয়েছিলেন অন্যান্য সুসভ্য দেশের উদ্ভাবন শক্তি, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি থেকে শিক্ষা নেওয়া। মানবমন যদিও সর্বত্র সমান অবস্থাতে একই ভাবে বিবর্তিত হয়, কিন্তু তাবলে বর্ণগত পার্থক্যের জন্যে মনোগত পার্থক্য কিছু নেই। জাতিগত পার্থক্যও নয়। অর্থাৎ যে পার্থক্য দেখা যায় সেটা সভ্যতার "স্তরগত পার্থক্য"। তিনি তাই "Asiatic barbarism" থেকে বেরিয়ে এসে "ভারতকে সুসভ্য" করে তুলতে আহ্বান জানান।[৫৬]

তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে স্বাধীনতার পর ভারত দ্বিতীয় শিল্প-বিপ্লবের যুগে প্রবেশ করছে। নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নতুন সামাজিক সম্পর্ক ও মূল্যবোধের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বলে তিনি অনুভব করেন। কিন্তু ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের চিন্তায় নতুন দিকের কোনো নিশানা নেই বলে তিনি খেদ প্রকাশ করে বলেন—

> Their minds are fixed in the thoughts of dim antiquity.[৫৭]

প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে কি ডায়ালেকটিকসের প্রক্রিয়া কার্যকর নয়? দ্বিতীয়ত, প্রাচীন ভারতের চিন্তাভাবনায় ইহমুখী, যুক্তিসম্মত ও বস্তুবাদী যেসব

মূল্যবোধ ছিল সেগুলির পুনরুজ্জীবন কি আপত্তিকর? বস্তুত তিনি প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদী ধারার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দ্বান্দ্বিক সমন্বয়ে উপস্থাপিত করেন নি।

আর্থনীতিক চিন্তা

অর্থনীতির বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথ তাত্ত্বিক এবং পূর্ণাঙ্গ কোনো আলোচনায় বিশেষ প্রবেশ করেন নি। কৃষক আন্দোলনসূত্রে দেশের ভূমিব্যবস্থা, কৃষির উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদিতে তিনি সবিস্তারে তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা ও অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন। 'ডায়ালেকটিকস অফ ল্যান্ড ইকনমিকস অফ ইন্ডিয়া' নামে তাঁর সুবিপুল বইতে ভূপেন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক চিন্তা-ভাবনার কথা বিশেষ জানা যায়। বইটিতে বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে মৌর্য, গুপ্ত, মোগল ইত্যাদি শাসনপর্বে এবং ইংরেজ আমলের ভূমিব্যবস্থা, গ্রামীণ জীবন, কৃষিপদ্ধতি ইত্যাদির ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিবরণ পাওয়া যায়। বঙ্গের কৃষি ও গ্রামীণ জীবনের উপর তিনি একটি নমুনা সমীক্ষা করেছিলেন; একটি পরিচ্ছেদে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ আছে।

উল্লিখিত বইটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে, ১৯৪৬ সালে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের ঠিক আগে বিভিন্ন সরকারি ও রাজনৈতিক আলোচনায় কৃষিপ্রধান ভারতের কৃষকদের সমস্যা ও প্রসঙ্গ বিশেষ স্থান না পাওয়ায় ভূপেন্দ্রনাথ গ্রন্থটি রচনায় উদ্যোগী হন। তাছাড়া মস্কোয় তিনি যখন লেনিনের কাছে একটি থিসিস পাঠিয়েছিলেন, লেনিন সেটি অনাবশ্যক মনে করে ভূপেন্দ্রনাথকে দেশে ফিরে গিয়ে কৃষক সংগঠন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের পরামর্শ দিয়েছিলেন। বইটিতে কৃষক সংগঠন সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক কিছু উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সমসাময়িক সাম্যবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

ভূপেন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতায় কৃষক শ্রেণীর সামাজিক গঠনপ্রসঙ্গে লিখেছেন যে, প্রাচীন কাল থেকেই কৃষকেরা ছিল সমাজের মেরুদণ্ড। বহু ঋষি, ধর্মগুরু ও রাজার উত্থান ঘটে কৃষক সমাজ থেকে। ইংরেজ আমলে সেই ধারা রুদ্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে কৃষক শ্রেণী ভেঙে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছে। উচ্চবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ভিন্ন জীবিকা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করছে। কিন্তু অন্য শ্রেণী থেকে কেউ কৃষিজীবিকা গ্রহণ করছে না। অন্যদিকে নিম্নবিত্ত কৃষিজীবী পরিবারের লোকেরা গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদে নানা ধরনের সাধারণ জীবিকা কিংবা কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ নিতে বাধ্য হচ্ছে। তাঁর মতে—

The Indian proletariat is growing at the expense of the cultivating class [৫৮]

তাতেও ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা কমছে না। ভূমির উপর চাপ রয়েই যাচ্ছে। শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুত না হওয়ায় কৃষি থেকে বেশি সংখ্যক মানুষের শিল্পে কর্মসংস্থান হচ্ছে না। চাষীঘরের ছেলে লেখাপড়া করেও কাজ পাচ্ছে না বলে তারা আবার কৃষিকর্মে ফিরে যাচ্ছে।

কিন্তু তিনি চাষের জমির নিরন্তর খণ্ডবিখণ্ডের বিরোধী ছিলেন। 'লাঙল যার জমি তার'—প্রচলিত এই স্লোগানের পিছনে তাঁর সমর্থন ছিল না।[৫৯] বলা বাহুল্য কৃষিতে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে জমির সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশের ভূমিব্যবস্থা ও কৃষিকর্মের তিনি একটি তুলনামূলক আলোচনার শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ভারতে কৃষকেরা হল "assortment of classes"। বিত্তগত বৈষম্য এবং ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুর থাকায় সমবায় পদ্ধতি কার্যকর হবে না। তাতে সম্পন্ন চাষীদেরই সুবিধা হবে। কৃষিতে সমবায় প্রথার অশুভ পরিণাম উপলব্ধি করে তিনি বলেন যে, "the time-old jealousy and bickering at the time of division of the products are sure to arise."[৬০]

তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমবায় প্রথা প্রকারান্তরে যৌথ পুঁজিবাদের নামান্তর। অবশ্য তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে, সমবায় ব্যবস্থা ও যৌথ (কালেকটিভ) ক্ষেতখামার সমাজতন্ত্রী দেশে কার্যত একই গোত্রের। সেই বিশ্বাসে তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ছিল যে, ভারতে সমবায় প্রথায় জমির মালিকানাসম্পন্ন কৃষকদের পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে সংঘবদ্ধ করলে কৃষিজীবী মানুষের দারিদ্র্য ঘুচবে না। তাই তিনি বলেন যে, ভূমিব্যবস্থার সঙ্গে সর্বস্তরের কৃষিজীবীর আর্থিক উন্নতিকল্পে ভারতে কৃষিভূমি জাতীয়করণ হলেই ভাল। এবং সরকারের মালিকানায় যৌথ ক্ষেতখামার ব্যবস্থার প্রবর্তনই একমাত্র কার্যকর সমাধান।[৬১]

তিনি কৃষিকর্মে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ তথা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুপারিশ করেন। সেদিক থেকেও তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রায়ত্ত যৌথ কৃষির উপযোগিতা আছে। রাষ্ট্রায়ত্ত কৃষি ব্যবস্থায় স্তরনির্বিশেষে কৃষিজীবী মাত্রেই সকলের কর্মসংস্থান হবে। পারিশ্রমিক নির্ধারিত হবে কাজ অনুযায়ী। যৌথ কৃষিভূমিতে সবাইকার জমি মিশে যাবে। অবশ্য তিনি কৃষিতে ব্যক্তিগত মালিকানার পুরোপুরি উচ্ছেদ চান নি। কারণ কৃষিজীবীদের মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক তাগিদে কিছুটা তাদের স্বাধীন চাষ-আবাদের সুযোগ তিনি রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে সম্পন্ন যেসব কৃষকের গৃহ-সংলগ্ন বিস্তর জমি অনাবাদী পড়ে থাকে সেখানে তারা ফলমূল ও সব্জি উৎপাদন, পশুপালন

ইত্যাদি করে সেইসব জমিকে সদ্ব্যবহার করতে পারে। রাসায়নিক সার ব্যবহারে তাঁর ছিল জোরালো সমর্থন। সেচ, জৈবসার ও কৃষিঋণের বিস্তারিত প্রসঙ্গে তিনি যান নি। তবে রাসায়নিক সার আমদানিতে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার সংস্থান সম্পর্কে তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে তিনি দারিদ্র্যের কারণ বলে মনে করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব ছিল একটি বুর্জোয়া বিলাসচিন্তা বিশেষ—দেশের অপশাসন ও শোষণকে ঢাকবার জন্যে সেটা একটা সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রয়াস মাত্র। সোভিয়েত দেশ সমেত ফ্যাসিবাদী জার্মানির নজির দেখিয়ে তিনি বলেন যে, ঐসব দেশে জন্মনিয়ন্ত্রণের মেকি প্রয়াস আইনবিরুদ্ধ। স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রীয় নেতাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের উপর গুরুত্ব আরোপের জন্যে তিনি তাঁদের প্রতি দোষারোপ করেন।[৬২]

রমেশচন্দ্র দত্তর মতো ভূপেন্দ্রনাথ বঙ্গের গ্রামীণ তথা কৃষকজীবন সম্পর্কে তথ্যাদির সাহায্যে একটি করুণ চিত্র তুলে ধরেন। রমেশচন্দ্রর ছিল অর্থনীতিবিদের মনোভঙ্গি। আর ভূপেন্দ্রনাথ পর্যালোচনা করেছেন একজন সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে, এবং সেটা অনেকাংশে তুলনামূলক বিচারপদ্ধতিতে, সমসাময়িক সমস্যার কথা উঠেছে প্রসঙ্গক্রমে।

তিনি বঙ্গের গ্রামীণ অধিবাসী ও কৃষকদের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে একটি নমুনা সমীক্ষা করেন। তাতে বিত্তহীন গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার অতীব এক নিম্নমান ফুটে ওঠে। কৃষিতে দিনমজুরের জীবন সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হল—

> He is a personification of misery···a semi-naked barbarous folk knowing no amenities of civilised life.[৬৩]

অপুষ্টি, অসুখবিসুখ, অশিক্ষা ও ঋণের দায়ে তাদের জীবন বিপর্যস্ত। সবকিছুর মূলে তিনি নিঃসীম দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করেন।

তাঁর ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় জানা যায় যে প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের কৃষকেরা শোষণ ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে এসেছে। উৎপীড়ন থেকে পরিত্রাণের জন্যে কৃষকেরা মৌর্য আমলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। মুসলমান শাসনকালে ধর্মান্তরের মাধ্যমে তাদের বিদ্রোহ ফুটে ওঠে। ইংরেজ আমলে নানাস্থানে তারা সরাসরি বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়। অসন্তোষের জ্বালায় কৃষকেরা শেষাবধি জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে যোগ দেয়। সেই সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ পরিণামে দেশবিভাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর এই বিশ্লেষণ অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদের নিষ্ফলতা ও কৃষকের শ্রেণীচেতনার অভাব দর্শায়।

ভূপেন্দ্রনাথ অনুভব করেন যে যতদিন অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততদিন যথার্থ সামাজিক সাম্য অলীকচিন্তা মাত্র। তিনি যে আদর্শ সমাজের

কল্পনা করেছিলেন সেখানে ভবিষ্যতের মুক্ত মানবসমাজ ব্যুরোক্রেসির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। বরং সমাজই উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ের দায়িত্ব নেবে। অর্থাৎ তাঁর প্রস্তাবিত স্বরাজে মানুষকে শাসনের প্রয়োজন হবে না। উৎপাদন ব্যবস্থাকে লোকের স্বার্থে রূপায়িত করা প্রয়োজন। সেই অবস্থায় লোকে নিজের বৃত্তি অনুসারে জীবিকার কর্মক্ষেত্র বেছে নিয়ে সংঘবদ্ধ হবে। সংঘ সমূহের প্রতিনিধির মাধ্যমে উৎপন্ন দ্রব্যাদিকে মানুষের ভোগে লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে। সমাজের শাসনশক্তি আর্থনীতিক সংঘ সমূহের সমষ্টিরূপে বিরাজ করবে। তাঁর দৃষ্টিতে সেটাই হবে "বিংশ শতাব্দীতে স্বরাজের আদর্শ।"[৬৮]

শিক্ষাচিন্তা

জীববিদ্যা ও সমাজতত্ত্বের সাহায্যে ভূপেন্দ্রনাথ এই অভিমত পোষণ করতেন যে মানব প্রকৃতি (human nature) শিক্ষা ও লালন, এই উভয়ের সমন্বয়ে পুষ্ট হয়। কিন্তু যেটা মানুষের প্রকৃতিগত, অর্থাৎ উত্তরাধিকারসূত্রে যেসব গুণাগুণ চরিত্রের মধ্যে ফুটে ওঠে সেগুলি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু শিক্ষা ও লালনের মাধ্যমে সেগুলিকে অনুকূল করে নেওয়া সম্ভব। প্রকৃতিগত লক্ষণসমূহ জাতীয় উন্নতির পক্ষে অন্তরায় বলে মনে হলে শিক্ষা ও লালনের সাহায্যে সেইসব প্রতিকূলতাকে মন্দীভূত ও কার্যোপযোগী করে নেওয়া সম্ভব। সেজন্যে তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতিহাসের নজির দেখিয়ে তিনি বলেন—

> একটি জাতির সংস্কার, বিশ্বাস, রীতিনীতি প্রভৃতি আমূল পরিবর্তিত করা যাইতে পারে, অর্থাৎ শিক্ষার দ্বারা একটি জাতির মনের বাহ্যিক সংস্কার সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।[৬৯]

তিনি মনে করতেন যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত (hereditarily) লক্ষণসমূহ পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হতে পারে না বটে, কিন্তু শিক্ষা একটা রকমফের (variability) সৃষ্টি করে। শিক্ষা বা চর্চার গুণসমূহ উত্তরাধিকারীদের প্রদান করা সম্ভব না হলেও তার সাহায্যে উদ্দীপনা (stimuli) ঘটিয়ে নতুনত্ব সৃষ্টি করা যায়। জীবজগতে উল্লিখিত নতুনত্ব বিধানকে ধারা-বহির্ভূত অনুষ্ঠান (mutation) বলে। তাই তাঁর কথায়, "এই পুরুষপরম্পরার ধারা হইতে বহির্ভূত বিভিন্নতা বা পার্থক্য দ্বারা অগ্রগমনশীল গতির নূতন রাস্তা প্রস্তুত হয়।" সেটা জৈব ক্রমবিকাশের গতিকে বাড়িয়ে তোলে, পরিণামে জীবসমষ্টি লাভবান হয়। উদ্দীপনার প্রভাববিস্তার জীবের উপকারসাধন করে এবং শিক্ষা ও লালনপালনের উন্নতির মাধ্যমে পুরুষানুক্রমিক অপরিবর্তনীয়তার

ধারার উন্নতিসাধন সম্ভব নয়। ব্যক্তিগতভাবে যেটা সম্ভব সেটা সমষ্টিগত-ভাবে সমাজে প্রযুক্ত হলে জাতীয় জীবনেও নতুনত্ব সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তিনি মনে করতেন।[৬৬]

উল্লিখিত জীববিদ্যা অনুসারে তিনি প্রচলিত ধারণাকে অস্বীকার করে বলেন যে সমাজের ধারা অপরিবর্তনীয় নয়। তাঁর মতে মানবসমাজ পরিবর্তনশীল, সমাজ কখনও স্থানুবৎ বসে থাকে না! সেজন্যে "social heredity"-র ধারা কখনও একই খাতে বয় না। জীবকে যেমন বাঁচার জন্যে বাইরের নতুন উদ্দীপনার (stimuli) সাহায্য নিতে হয়, তেমনি সমাজকেও প্রতিদ্বন্দ্বী জগতে বেঁচে থাকার জন্যে জড়জগতের ও ভাবজগতের নতুন উদ্দীপনার সাহায্যে নিজেকে নতুনের সঙ্গে-খাপ খাইয়ে উন্নত স্তরে পেঁছিতে হয়। তাই তিনি বলেন যে, একটি জাতির পুরুষানুক্রমিক ধারা যাই থাক না কেন সে-জাতি জগতের নতুন ভাবসমূহের প্রতি নির্বিকার থাকতে পারে না। জাতীয় কার্যকর শক্তির অভাব ঘটলে বাইরে থেকে নতুন শিক্ষার সাহায্যে সেই অভাবকে পূরণ করতে হয়। নতুন শিক্ষায় সেই জাতির সদস্যদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানসিকতায় যে "world view"-এর উদয় হয়, সেই অনুযায়ী নতুন কর্ম-প্রণালী অবলম্বনের পথ খুলে যায়।

তাঁর দৃষ্টিতে কোনো জাতির কার্যকর শক্তি তার শিক্ষা-পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। নতুন শিক্ষায় তার মন পরিবর্তিত করে নিলে সেই জাতির ইতিহাসের ধারাও পরিবর্তিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক লেস্টার ওয়ার্ডের একটি উক্তি উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, একটি জাতির "world view" পরিবর্তন করলে সেই জাতির মানসিকতাও পরিবর্তিত হবে। জীববিদ্যার ভিত্তিতে তিনি যে সমাজতাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তার মর্ম হল যে পুরুষপরম্পরায় জৈব লক্ষণ অবিনশ্বর হলেও শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিকূল লক্ষণ বা চরিত্রকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। এবং নতুন মানসিকতা গঠন করে জাতি বিশেষকে মুমূর্ষু অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়। যদি একটি জাতি জগতকে নতুনভাবে গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তার ইতিহাসও পরিবর্তিত হবে। প্রাচীন সনাতন ধারা আঁকড়ে থেকে ভারতীয় সভ্যতা ক্রমবিকাশের ধারায় নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং সেজন্যে এবং বর্তমানে উদ্ভূত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার দিক থেকে ভারত অনুপযোগী বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।[৬৭]

সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের অভিমত অনুসারে তিনি বলেন যে, আলোড়ন করলে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি হয় এবং তাতে মস্তিষ্ক সতেজ হয়। মস্তিষ্কবিশিষ্ট ব্যক্তি নিশ্চল ও জড়বৎ হয় না; নিশ্চল ও জড়বৎ মস্তিষ্ক গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আধ্যাত্মিক ভাবের উচ্চাবস্থা হতে পারে; কিন্তু তাতে জগতে এগুনো যায় না। তাঁর কথায়, "জগতে কেবল মস্তিষ্কের তেজের লীলাখেলা হইতেছে। যে জাতি যত মস্তিষ্কশালী সেই জাতি তত চেষ্টাশীল এবং সেই জাতি…জগতের

পুরোভাগে স্থান অধিকার করে।” ভারতীয়দের মস্তিষ্কের সুষুপ্তাবস্থাই তাদের অধঃপতনের মূল কারণ বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি অনুভব করেন যে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মস্তিষ্কের সতেজ করার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারায় পরীক্ষানিরীক্ষা ও তুলনামূলক আলোচনা প্রসারিত হলে স্বরাজের রাস্তায় দেশের পক্ষে অনেকটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব। অজ্ঞতার ফলেই নানা বাদবিসংবাদ, মূর্খতা, ধর্মান্ধতা ও উদ্ভট বিধিব্যবস্থার অবতারণা ঘটে। যথার্থ “মানুষ” তৈরির জন্যে ডিগ্রিদানের প্রচলিত শিক্ষার কোনো সার্থকতা নেই বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী—উভয়ের উদ্দেশে নির্দেশ করেন—

এক, পরকে যারা মুক্তির উপায় বলে দেবে তাদের মনকে মুক্ত করতে হবে, এবং দুই, জগতের প্রতি যথার্থ ধারণার জন্যে উপযোগী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

ভূপেন্দ্রনাথ যে “world view” আত্তীকরণের প্রস্তাব করেছিলেন তার উপযোগী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে নেই বলে তিনি উপলব্ধি করেন। উপরন্তু এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সব ধরনের “উচ্চাঙ্গের চর্চার বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় না বলিয়াই আমাদের ছাত্রদের মনও পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হয় না” বলে তিনি আক্ষেপ করেন। যথার্থ উচ্চশিক্ষার অভাবে ভারতীয় ছাত্রদের মন অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক থেকে যায়। ফলে বিজ্ঞানচর্চা অপেক্ষা অলৌকিক গল্প ও লঘুসাহিত্য লোকের কাছে বেশি মনোগ্রাহী। তিনি আরও প্রত্যক্ষ করেন যে, এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তি যুক্তিপূর্ণভাবে কথা বলতে পারে না। তারা পরস্পরবিরোধী, অসংলগ্ন ও অর্থহীন আলাপে অভ্যস্ত। প্রচলিত স্কুলকলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মননশীলতা ও বুদ্ধির চর্চা অনুপস্থিত। তিনি চেয়েছিলেন “materialistic culture” ও “উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক চর্চা”।

উচ্চাঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা এদেশে কেন যে গড়ে ওঠে নি তার কারণ তাঁর কাছে “অজ্ঞাত” বলে তিনি লিখেছেন। তিনি লক্ষ করেন যে, শিক্ষা ব্যাপারটা অর্থকরী বিদ্যা তথা সরকারি চাকুরিপ্রাপ্তির ছাড়পত্র হিসেবে পরিগণিত। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিনিময়ে অর্থোপার্জনের অবকাশ থাকে না বলে ছাত্ররা সেদিকে যায় না। তিনি পরিতাপ করেন যে অন্যদেশের বিজ্ঞানীরা যখন গ্রহতারকার অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও গবেষণায় ব্যস্ত তখন ভারতীয়রা ঘন্টা বাজিয়ে গ্রহশান্তির চিন্তায় মগ্ন। মড়কনিবারণে অন্যদেশের বিজ্ঞানীরা যখন ঔষধ আবিষ্কারে উদ্যমশীল, তখন মড়ক থেকে নিষ্কৃতির জন্যে ভারতীয়রা ওলাবিবি ও শীতলাপূজায় মত্ত হয়ে ওঠে। কুসংস্কার থেকে মুক্তির তাগিদে তিনি শিক্ষাব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গি সঞ্চারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন।[৬৮]

উপসংহার

ভূপেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের তিনটি অধ্যায়—এক, 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশনা, দুই, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির প্রবাসজীবন এবং তিন, ভারতে ফেরার পর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ও মনোভঙ্গির আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ তিন অধ্যায়ের সমসাময়িক তিনজন জননেতা যথাক্রমে শ্রীঅরবিন্দ, মানবেন্দ্রনাথ ও মজফফর আহমেদের ভূপেন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য দেখা যায়। তাঁর সম্পর্কে উক্ত তিনজনের ইম্প্রেশন যতই ম্লান হোক না কেন ভূপেন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে একজন বিদ্যাবত্তাসম্পন্ন সংগঠক ও শিক্ষকের যে ভূমিকা নেন সেকথা অনস্বীকার্য। আন্দোলনের প্রথম ও প্রস্তুতি পর্বে মার্কসীয় মতাদর্শে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তিনি অনেকাংশে মিটিয়েছিলেন।

কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ মার্কসীয় মতাদর্শকে আক্ষরিকভাবে নেন। অপরিণত অবস্থায় এবং প্রস্তুতিপর্বে সেটাও হয়তো তখন স্বাভাবিক ছিল। যত্রতত্র 'ডায়ালেকটিকস' তত্ত্বের প্রয়োগ এবং সবকিছুকেই তিনি নির্দিষ্ট ছকে ফেলে বিচার করতেন; অবশ্য একটা মোটা দাগেই তাঁর প্রয়োগ পদ্ধতি প্রকাশ পেত। চিন্তায় স্বচ্ছতা ও পারম্পর্য তাঁর বজায় থাকত না। কখনও বলেছেন ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে, কখনও বলেছেন নদীর একই জলে দুবার অবগাহন করা যায় না। স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও যুক্তিবোধ সঞ্চারের কথা বললেও তিনি যুক্তিকে সব সময় প্রাধান্য দিতে পারেন নি।

রাজনীতি ও কিছুটা অর্থনীতির চর্চা করলেও ভূপেন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা ও রচনার বেশিটা ছিল সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বে নিবন্ধ। ভারতের বিভিন্ন কালপর্বের মূলেত হিন্দু ধর্মগ্রন্থের এবং বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থের সাহায্যে তিনি প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কালের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ের আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করেছেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে সারা দেশের ধারাবাহিক কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ তিনি দেন নি, দিয়েছেন যেটা সেটা কেবল বঙ্গদেশের। তবে নিজের সব বইতেই তিনি প্রাচীন হিন্দু সমাজের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আচার, বিশ্বাস, উপাসনা, জাতিপ্রথা, খানাপিনা, বিবাহ ইত্যাদির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্ম ও সমাজের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র কখনই সেকিউলার ছিল না বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। বিনয়কুমার সরকারের অভিমত ছিল অবশ্য তার বিপরীত।

রাজনীতি প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা, দণ্ডনীতি, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির আলোচনা করলেও মুখ্যত তিনি জাতি, গোষ্ঠী পরিবার সামাজিক ক্রিয়াকর্ম ও বিধিনিষেধ ইত্যাদিকে তাঁর লেখায় প্রাধান্য দিয়েছেন। নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-ভাষ্য ও মন্তব্য থাকলেও তাঁর স্বতন্ত্র এবং মৌলিক চিন্তার পরিমাণ

কম। তিনি বৈদিক যুগ থেকে হিন্দু মননধারায় সমাজতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। একজন বস্তুবাদী চিন্তায় বিশ্বাসী মানুষ হয়েও ভূপেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও সেদিকে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়া সবিস্তারে কিছু লেখেন নি। অথচ তার প্রয়োজন এখনকার কালে অনেক জরুরী। বস্তুত দর্শনচিন্তার গভীরে প্রবেশ না করলেও তিনি ভাবকে ক্ষেত্রবিশেষে বস্তুর অগ্রবর্তী বলে বিবেচনা করেন।

রাজনীতি তথা রাষ্ট্রদর্শনে তিনি সুসংবদ্ধ ও সুদূরপ্রসারী কোনো তত্ত্বের আলোচনায় যান নি। রাজনীতির ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর কিছু কিছু উপলব্ধি গুরুত্বপূর্ণ। আজকের দিনে সশস্ত্র বিদ্রোহ যে অচল, সেটা তিনি অনুভব করেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে সাফল্য অর্জন করতে হলে কেবল সংগ্রামের কথা আওড়ালেই চলে না; প্রয়োজন যে একটা ভাববিপ্লবের সেটা তিনি বুঝেছিলেন। সেজন্যে অর্থনীতির মার্কসীয় পরিকাঠামোর যুক্তি দেখান নি। তবে শুভ লক্ষ্যে পেঁছিনর জন্যে মাধ্যমও যে শুভ হওয়া উচিত—এই নীতি তিনি মানতেন না।

ভূপেন্দ্রনাথ যৌবনে মাৎসিনীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ভারতীয় জননায়কেরা, যেমন সুরেন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ অনেকেই মাৎসিনীর অনুরাগী ছিলেন। ইতালির মুক্তি ও একত্রীকরণের জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের নেতা ও ধর্মপ্রাণ মার্ৎসিনীর আবেদন থাকাটা সেদিন হয়তো ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু মাৎসিনী ছিলেন একজন উগ্র জাতীয়তাবাদী ও নৈরাজ্যবাদী নেতা। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর দেশভক্তি ও বৈশ্বিক মানবপ্রেমের উৎস ছিল ধর্ম। তিনি সমাজতন্ত্রীদের সইতে পারতেন না। সেজন্যে মার্কস প্রতিষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক থেকে সরে আসেন এবং নিন্দা করেন পারি কমিউনের। মার্কসের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রচণ্ড বিরোধ। দেশপ্রতিমার জন্যে তিনি চাইতেন জীবনাহুতি। তাঁর কাছে মানুষের কর্তব্যই ছিল বড়, মানুষের অধিকারকে তিনি উপেক্ষা করেন। সেদিক থেকে তাঁর চিন্তা ছিল ফ্যাসিবাদের পক্ষে উর্বর। স্বভাবতই মার্ৎসিনীর প্রতি পরিণত জীবনেও ভূপেন্দ্রনাথের অনুরাগ বিস্ময়কর।

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথের সম্ভবত সুস্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। সেজন্যেই হয়তো মুসোলিনীর অনুগামী আবদুল ওয়াহেদের সঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথের সংযোগ ছিল প্রত্যক্ষ। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি প্রচলিত ভাবনা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি। তিনি যে "ওয়ার্লড ভিউ"-এর কথা বলেন তার সঙ্গে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অনেক। একজাতীয়তার জন্যে তিনি ধর্মকে রাজনীতির অন্তঃসার বলে মনে করতেন।

তবে অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ও মৌলিক চিন্তা তাঁর বিশেষ না থাকলেও দেশের গ্রামীণ জীবন ও কৃষিজীবীদের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম দরদ। কৃষক

আন্দোলনসূত্রে তিনি যে নমুনা সমীক্ষা করেছিলেন তার প্রয়োজন ও গুরুত্ব আজও অপরিমেয়, অবশ্য কৃষি তথা গ্রামীণ জীবনের উন্নয়নসূত্রে তাঁর অভিমত অবাস্তব। তিনি সুপারিশ করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধাঁচে এদেশেও রাষ্ট্রীয় মালিকানায় যৌথ কৃষির ব্যবস্থা হোক। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন সমাজতন্ত্রী দেশে খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারসমস্যা, মুদ্রাস্ফীতি ও দুর্ভিক্ষের জন্যে সেখানকার রাষ্ট্রায়ত্ত বিধিব্যবস্থাই মূলত দায়ী।

শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে কৃষিকর্মে উদ্বৃত্ত মানুষের কর্মসংস্থানের কথা তিনি বিশেষ বলেন নি। দ্বিতীয়ত এদেশে যেটা সবচেয়ে বড় সমস্যা, অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি—সেটাকে তিনি উপেক্ষা করেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় ভূপেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন কুসংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তাশক্তির সঞ্চার এবং শিক্ষার্থীদের মনে বিজ্ঞানচেতনা তথা আধুনিক মানসিকতা গড়ে তুলতে। কিন্তু সবাইকে এক ছাঁচে ফৌজি নিগড়ে গড়ে তোলার যে প্রস্তাব তিনি করেন, সেটা স্বৈরতন্ত্র সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক।

কোনো রাজনৈতিক দলে না ভিড়ে-স্বকীয় পদ্ধতিতে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথের নিদর্শনে গঠনমূলক কাজের সার্থকতা আজও আছে যথেষ্ট।

উৎস নির্দেশ

১. সরোজ মুখোপাধ্যায়। 'ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা'। ১৯৮৫। খণ্ড ১। পৃ ২৫।

২. M. A. Persits. *Revolutionaries of India in Soviet Russia.* Moscow. 1983. p 258.

৩ *Ibid.* p. 254. ৪. *Ibid.* p 259.

৫ M. N. Roy. *Memoirs.* Bombay: 1964, p. 484.

৬ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস'। ১৩৯০। পৃ ৩৮। (মস্কো যাত্রা অধ্যায়) ও পৃ ৯৬ (সপ্তদশ অধ্যায়)।

৭ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। "কিং কর্তব্যম"। 'দেশ'। বর্ষ ১০, সংখ্যা ৪৮। ১৬ অক্টোবর ১৯৪৩।

৮ তদেব।

৯ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'বাঙ্গলার ইতিহাস।' ১৩৭০। পৃ ২৩৮।

১০ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস।' পৃ ৬৮। (মস্কো যাত্রা অধ্যায়)

১১ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি'। ১৯৫৭। খণ্ড ১। পৃ ll৹।

১২. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'তরুণের অভিযান'। পৃ ৮৫। ১৩ তদেব। পৃ ৮৬।

১৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি'। খণ্ড ১। পৃ ৸৹।

১৫ Bhupendra Nath Datta. *Dialectics of Hindu Ritualism.* 1950. Part 1 p. *i*.

১৬. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'তরুণের অভিযান'। পৃ ২।

১৭. তদেব। পৃ ৩। ১৮. তদেব। পৃ ৮১।
১৯. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'জাতি সংগঠন'। ১৩৩৫। পৃ ৮।
২০. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'যুগসমস্যা'। ১৩৩৩। পৃ ১৩-১৪।
২১ তদেব। পৃ ২০।
২২ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি'। খণ্ড ১। পৃ ॥০।
২৩ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'যুগসমস্যা'। পৃ ২৪। ২৪. তদেব। পৃ ২৫
২৫ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'তরুণের অভিযান'। পৃ ১৩।
২৬ তদেব। পৃ ৮১। ২৭ তদেব। পৃ ৮২।
২৮ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'জাত সংগঠন'। পৃ ৬৩। ২৯. তদেব। পৃ ৬৩-৬৪।
৩০. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তরুণের অভিযান'। পৃ ১৪-১৬।
৩১ তদেব। পৃ ২০-২৩। ৩২. তদেব। পৃ ২৪। ৩৩. তদেব। পৃ ৩৮-৩৯
৩৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'জাতি সংগঠন'। পৃ ৬৭।
৩৫, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'যুগসমস্যা'। পৃ ৪৩। ৩৬. তদেব। পৃ ৩০-৩৪।
৩৭ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'জাতি সংগঠন'। পৃ ৬৬।
৩৮ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'তরুণের অভিযান'। পৃ ৯৯ ৩৯ তদেব। পৃ ১০০-৩।
৪০ তদেব। পৃ ১০৪। ৪১. তদেব। পৃ ১০৫-৬
৪২ তদেব। পৃ ১০৭। ৪৩ তদেব। পৃ ১০৮-৯।
৪৪. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি' ১৯৮৪। খণ্ড ৩। পৃ ৪।
৪৫. Bhupendranath Datta. *Studies in Indian Social Polit* 1983. pp. 14-16.
৪৬ *Ibid.* p. 13. ৪৭. *Ibid.* p 382.
৪৮ *Ibid.* p. 384. ৪৯. *Ibid.* p. 389.
৫০. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'তরুণের অভিযান'। পৃ ২৬।
৫১. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি'। খণ্ড ৩। পৃ ৫২।
৫২. তদেব। পৃ ৫৩-৫৫। ৫৩. তদেব। পৃ ৭৫।
৫৪. তদেব। পৃ ৮৬-৮৮। ৫৫. তদেব। পৃ ৯০।
৫৬. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'তরুণের অভিযান'। পৃ ৮৪।
৫৭. Bhupendranath Datta, *Dialectics af Hindu Ritnalisn.* Part 1. p. iv.
৫৮. Bhupendranath Datta. *Dialectics of Land-economics of India.* 1952. pp. 244-5.
৫৯. *Ibid.* p. 247. ৬০. *Ibid.* p. 274.
৬১. *Ibid.* p. 275, ৬২. *Ibid.* p. 241-2. ৬৩. *Ibid.* p. 236.
৬৪ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 'জাতি সংগঠন। পৃ ৬৪। ৬৫. তদেব। পৃ ৭৫।
৬৬ তদেব। ৬৭ তদেব। পৃ ৭১। ৬৮. তদেব। পৃ ৮৮-৯০।

বিনয়কুমার সরকার ॥ ১৮৮৭-১৯৪৯

বাঙালী তথা ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় কৃতবিদ্য মনীষীরা প্রায় সবাই সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মসূত্রে জাতীয় আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভাবভূমি রচনায় প্রবৃত্ত হন। সেদিক থেকে বিনয়কুমার সরকার ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। পশ্চিমী রাষ্ট্রদার্শনিকদের মতো শিক্ষকতা ও শিক্ষা আন্দোলন থেকে তিনি তাত্ত্বিক রাষ্ট্রচিন্তায় প্রবেশ করেন

বিনয়কুমার ছিলেন যুক্তিবাদী এবং আধুনিকতার উদ্‌গাতা। পশ্চাৎপদ ভারতের সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্যে তিনি চাইতেন দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উদ্যম, শিক্ষাব্যবস্থার নবরূপায়ণের মধ্যে দিয়ে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার এবং সেইসঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ বিচারভঙ্গি ও ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশ, যাতে ভারত বিভিন্ন উন্নত দেশের সমকক্ষ হতে পারে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে বিনয়কুমার স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। দেশে সেই সময়ে রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে যুগপৎ যে অর্থনৈতিক চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তার পশ্চাৎপট ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংক্ষেপে সেবিষয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

ইংরেজ শাসনের গোড়া থেকে ভারতের অর্থনৈতিক দুরবস্থা একদিকে যেমন চরম আকার ধারণ করেছিল, অন্যদিকে তারই সমান্তরাল ধারায় দেশের এক শ্রেণীর লোকের হাতে নানাসূত্রে অর্জিত বিপুল সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়। মুৎসুদ্দি, বেনিয়ান, মহাজন, ব্যবসায়ী, জমিদার, সরকারি আমলা, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি বিচিত্র সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে গঠিত উক্ত শ্রেণীর সঞ্চিত অর্থ উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বস্ত্রশিল্প, ইস্পাত ও যন্ত্রপাতির কারখানা, রেল ও জাহাজী পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স, কাঁচামালের কাজকারবার ও রপ্তানি ইত্যাদি নানাবিধ শিল্পবাণিজ্যে ধীরে ধীরে লগ্নীকৃত হতে থাকে। ক্রমবর্ধিষ্ণু এই শ্রেণী কালক্রমে ভারতীয় পুঁজিবাদী তথা বুর্জোয়া শ্রেণী হিসাবে শক্তি ও স্ফীতি লাভ করে। বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের যে অর্থনৈতিক রূপ দেখা যায় তার পিছনে ছিল নবোদ্ভূত এই পুঁজিবাদী শ্রেণীর সঙ্গে ইংরেজ পুঁজিবাদের প্রথম স্বাভাবিক বিরোধ।[১]

বয়কট আন্দোলনের মাধ্যমে ছোটবড় দেশীয় শিল্প ও ব্যবসায়বাণিজ্যের পত্তন অথবা প্রসারের সঙ্গে সেদিন দেশবাসীর কর্মসংস্থান, উৎপাদনের সঙ্গে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি, লোকের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, বিদেশী মুদ্রার সাশ্রয় তথা দেশের তাবৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা ছিল উজ্জ্বল। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই ঐতিহাসিক ভূমিকা ভারতে উত্তরোত্তর প্রসারিত হয়, বুর্জোয়া মানসিকতার

আনুষঙ্গিক সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রকৃতি হল ইহমুখী জীবনবোধ, উদারনৈতিক গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক সমন্বয় এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাধান্য ও রাষ্ট্রের কল্যাণকর বিধিব্যবস্থা।

উল্লিখিত সমুদয় মানসিকতার সমন্বয়ে পশ্চাৎপদ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন বিনয়কুমার সরকার। মালদায় তাঁর জন্ম; ছাত্রজীবনে তিনি অসাধারণ মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সরকারি স্কলারসিপ প্রত্যাখ্যান ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদানের আহ্বান উপেক্ষা করে তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহযোগী হন। সতীশচন্দ্রের 'ডন' পত্রিকা ও ডন সোসাইটিকে কেন্দ্র করে সেদিনের বাঙালী বিদগ্ধ সমাজ তখন জনচিত্তে স্বদেশিকতার বুদ্ধিবিভাসিত উদ্দীপনা সঞ্চার ও গঠনমূলক নানা কাজে তৎপর ছিল। বিনয়কুমার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে পরিচালিত বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। কলেজের অধ্যক্ষ তখন অরবিন্দ ঘোষ।

সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সংগঠক হিসাবে বিনয়কুমার ঢাকা ও মালদা জেলায় কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেন। জাতীয় ভাবাদর্শ সঞ্চারের উপযোগী প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনার সঙ্গে 'গৃহস্থ' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা (১৯১১-১৪) তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষাতত্ত্ব ও ভাষাশিক্ষায় পরীক্ষা নিরীক্ষার সাহায্যে তিনি এক অভিনব কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। অনতিকাল পরে এলাহাবাদ পাণিনি কার্যালয়ে তাঁকে হিন্দু রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্মবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণায় লিপ্ত থাকতে দেখা যায়। সেই গবেষণার ফসল হল পানিনি কার্যালয় থেকে প্রকাশিত তাঁর *The Positive Background of Hindu Sociology* গ্রন্থের দুটি খণ্ড (১৯১৪, ১৯২১)। এই সময়ে বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতিপর্বে বিনয়কুমার সারা উত্তর ভারতে অর্থ সংগ্রহ ও প্রচার অভিযানে মদনমোহন মালব্যের সহযোগী হয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে বিনয়কুমার অনুভব করতেন যে দেশ গঠনের কাজে বিদেশের রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি সম্পর্কে ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা একান্তই প্রয়োজন। সেই তাগিদে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সতেরজন কৃতি ছাত্রকে বিনয়কুমার বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। পরিশেষে নিজেও দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন এবং দীর্ঘকাল আমেরিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন (১৯১৪-২৫)। ভারতীয় মনন ও সাধনার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বিশ্ববাসীর গোচরে আনাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি চাইতেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের পারস্পরিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপন। জার্মান, ফরাসি ও ইতালিয় ভাষায় বিনয়কুমার ছিলেন পারদর্শী। নানা দেশের সংস্কৃতি ও সমাজবিদ্যার তুলনামূলক চর্চা ও আলোচনার স্বকীয়

পরিবর্ধন বিনয়কুমারের মননশৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। তারই অনুষঙ্গী হিসাবে গাণিতিক-সমীকরণের (equations) সাহায্যে যাবতীয় বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ ছিল তাঁর অপর একটি অভিনব বিচার পদ্ধতি। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে *Futurism of Young Asia* (1912), *Economic Development* (1926) প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর এই বিচার পদ্ধতির নিদর্শন বহন করে।

বিনয়কুমারের মানসিক বিচরণক্ষেত্র ছিল বহুমুখী এবং নানা বিষয়ে পরিব্যাপ্ত। দেশ ও কাল নির্বিশেষে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রদর্শন, সমাজ-তত্ত্ব, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি মানব সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত। নতুন শীলনপদ্ধতির সাহায্যে স্বকীয় ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রয়াস এবং স্বীয় ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিমায় তিনি এক অভিনব বাতাবরণ সৃষ্টি করেন। তথ্যগত ও বাস্তবানুগ বিচারে তিনি কোনো আপস রক্ষা করে চলতেন না।

বহুবিধ মৌল চিন্তাভাবনার অন্তর্গত *The Political Institutions and Theories of the Hindus* (1922) গ্রন্থে তিনি প্রাচীন ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রচলিত ধর্মীয় ব্যাখ্যার পরিবর্তে বস্তুবাদী বিশ্লেষণের সাহায্যে ভারতের বৈচিত্র্যময় ও ইহমুখী ভাবাদর্শকে তুলে ধরেন। বারো বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচার পরিক্রমার পরে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। তখন থেকে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-নীতি বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত থাকেন (১৯২৬-৪৯)। মাঝে বছর দুয়েকের জন্যে তিনি ইউরোপের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা সফরে যান (১৯২৯-৩১)। সেইসময়ে তিনি রোমে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ পপুলেশনস-এর অর্থনীতি শাখায় সভাপতিত্ব করেন (১৯৩১)।'

ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নটি বিদ্বৎ সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্রমে তাঁকে ঘিরে নানা বিষয়ের বুদ্ধিজীবীদের এক বিরাট বিদ্বৎমণ্ডলী গড়ে ওঠে। বহুত্ববাদ (Pluralism) তত্ত্বের তিনি এক মস্ত সমর্থক ছিলেন। ঐ তত্ত্বে সমাজের বিকাশ ও উন্নয়নে, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মানুষের মাঝে স্বাধীন ও সমান্তরাল ধারায়, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে মতামত প্রকাশ ও প্রভাব বিস্তারের অধিকার ও স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।

নানা বিষয়ের গভীরে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রসারিত হলেও অর্থনীতির বিষয়টিকে তিনি অধ্যাপনা তথা জীবিকার ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। অর্থনীতি সংক্রান্ত দেশবিদেশের বহু পত্রপত্রিকায় তাঁর রচনাদি নিয়মিত প্রকাশিত হত। এই বিষয়ে চর্চা, গবেষণা ও প্রবন্ধাদি লেখানোর কাজে তাঁর অনুগামীদের উৎসাহিত করার জন্যে বিনয়কুমার ১৯২৬ সাল থেকে 'আর্থিক উন্নতি' নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। একই উদ্দেশ্যে সেই বছরে

তাঁর উদ্যোগে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ স্থাপিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন সেটির সভাপতি।

অনুগামীদের বইপত্র লেখায় উৎসাহিত করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিরন্তর প্রবন্ধ লেখা ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজিতে শতাধিক ছোটবড় গ্রন্থ রচনা করেন। তের খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর 'বর্তমান জগৎ' গ্রন্থমালা বাঙালীর মননজীবনে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করে। ফরাসি, জার্মান ও সংস্কৃত ভাষা থেকে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। বাংলায় মৌল চিন্তার উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে তাঁর দুখণ্ডে প্রকাশিত 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন' (১৯৩২), 'বাড়তির পথে বাঙালী' (১৯৩৪), দুখণ্ডে 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান' (১৯৩৭-৩৯) এবং 'সমাজবিজ্ঞান' (১৯৩৮) নামে গ্রন্থ সমূহ সেদিন বিশেষ সমাদর লাভ করে। বিনয়কুমারের চিন্তাভাবনা অচিরে Sarkarism নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

বিনয়কুমার ১৯৪৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্বৎ সংস্থার আমন্ত্রণে বক্তৃতা সফরে যান। সফরকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর সেই সময়ের বিভিন্ন বিষয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা *The Dominion of India in World Perspective* (1949) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতি, রাজনীতি ও ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করেন। ভারতীয় স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে বৈদেশিক সমর্থন অর্জন ও সংযোগ রক্ষার ব্যাপারে গান্ধীর বিশেষ অনীহা ছিল। তবুও তিনি কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক নেতার চাপে জার্মানি, ইতালি ও জাপানের ফ্যাসিবাদী শিবিরের পরিবর্তে সাম্যবাদী রুশ শিবিরের দিকে ঝুঁকেছিলেন। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র জার্মানি, ইতালি ও জাপানের সহযোগী ছিলেন বলে গান্ধীর বিরাগভাজন হন। কিন্তু বিয়াল্লিস সালে ইংরেজের সামরিক বিপর্যয়ের সুযোগে গান্ধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনে গান্ধীর অহিংসা নীতি এবং শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ রক্ষিত হয় নি। ইংরেজ সরকারকে বিতাড়নের আন্দোলন পরোক্ষে জাপানকে স্বাগত জানায়। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মধ্যে গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের মিলন ঘটে।

বিনয়কুমার মনে করতেন যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে উদ্ভূত অনুশীলন--যুগান্তর আন্দোলন যে-সংগ্রামী পথে অগ্রসর হয়েছিল তারই সফল পরিণতি হল সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযান। কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে তিনি সুভাষ-বিরোধ তথা বাঙালী-বিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অনুপম ও নির্ভুল। বাঙালী সুভাষের নেতৃত্ব তথা অনুশীলন-যুগান্তর আন্দোলনের প্রসার ঘটায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।[৩] আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে

বিনয়কুমার হিটলারের গুণগ্রাহী ছিলেন। এদিক থেকেও তাঁর সুভাষচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

ই তি হা স চি ন্তা

ইতিহাসকে বিনয়কুমার প্রকৃতিবিজ্ঞানের সমগোত্রে বিচার করতেন। সেই বিচারে সামাজিক জগৎকে প্রাকৃতিক জগতের মতো গাণিতিকসূত্রে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। মানুষের যাবতীয় আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতা এবং নানাবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত জ্ঞান ছাড়া মানুষকে পুরোপুরি জানা যায় না। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাসও ঠিক তেমনি অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি মানুষের ভাবীকাল সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত করতে অথবা পথের নিশানা জানাতে ইতিহাস অক্ষম হয়, কিংবা মানুষের সহস্রমুখী সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতিহাস নিশ্চেষ্ট থাকে। বিনয়কুমারের মতে ঐতিহাসিকের তাই উচিত প্রতি পদক্ষেপে জীব ও জীবনের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করা।[৪]

বিনয়কুমার দেখাতে চেয়েছিলেন যে, পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কে জীব ও জড়প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। মানুষও তেমনি বিশ্বশক্তি ও বৈশ্বিক নিয়মে প্রভাবিত। জগতের যাবতীয় অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির টানাপড়েনে তৈরি হয় মানুষের বাহ্য রূপ এবং মানসিক ও নৈতিক গঠনশৈলী। তাই যে-সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষ অবস্থান করে তার দ্বারাই প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয় মানুষের যাবতীয় সত্তা। এখানে বিনয়কুমারের চিন্তায় অদৃষ্টবাদী মনোভাব সুপরিস্ফুট, তাতে মানুষের সহজাত সত্তার স্বাধীন বিকাশ ও প্রকাশের অবকাশ অনুপস্থিত।[৫]

তিনি অবশ্য একথাও বলেন যে, সৃষ্টির ধারায় অসমতার যেমন কোনো শেষ নেই, বিপ্লবের দ্বান্দ্বিক (dialectical) প্রক্রিয়াও তেমনি কখনও চূড়ান্ত সমন্বয় (synthesis) স্তরে পৌঁছয় না। তাই তিনি বিশ্বপ্রগতি তথা মানবমনের বিবর্তনে মার্কস ও তাঁর 'গুরু' হেগেলের দ্বান্দ্বিক ব্যাখাকে অসম্পূর্ণ একদেশদর্শী এবং সেই কারণে যুক্তিহীন বলে অভিহিত করেন। বৈচিত্র্যময় সামাজিক ধারার বিশ্লেষণে মার্কস-এঙ্গেলসের ভবিষ্যদ্বাণী কালের নিরিখে সুদূরপ্রসারী হতে না পারায় স্বভাবতই মার্কসীয় চিন্তায় গলদ আছে বলে তিনি মনে করতেন। তিনি দেখাতে চান যে, হেগেলের ধর্মদর্শনে খ্রীষ্টধর্মকেই বিবর্তনের শেষ ধাপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, মার্কসের ইতিহাসচিন্তায় তেমনি সর্বহারার একনায়কত্ব ও রাষ্ট্রের অবলুপ্তি সমাজের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁর কাছে এই ব্যাখ্যা সঙ্গতিবিহীন। কারণ রাষ্ট্রের অবলুপ্তির পরে সৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মানবমন ও সামাজিক বিবর্তনের অবস্থা কি

দাঁড়াবে সে-বিষয়ে মার্কস ও লেনিন নিশ্চুপ। সর্বহারা বিপ্লবই মার্কসীয় দৃষ্টিতে মানবইতিহাসের সঞ্চালনকারী শ্রেণী সংগ্রামের চূড়ান্ত ও সর্বশেষ পরিণতি। তাই বিনয়কুমারের মতে, হেগেল যেমন যুক্তিগ্রাহ্য নয়, মার্কস ও লেনিনও তেমনি যুক্তির আলোকে বর্জনীয়। তিনি তাই মন্তব্য করেন যে, মানবসভ্যতার মার্কসীয় বিচার অনুযায়ী মানুষের মননক্রিয়া ও সামাজিক গতিশীলতার এই পরম ও চরম পরিণতি বিজ্ঞাননির্ভর নয়।[৬]

মার্কসকে বিনয়কুমার ঋষি, যুগাবতার ইত্যাদি ভূষণে প্রশস্তি করেন। মার্কস-এঙ্গেলসের দুটি গ্রন্থ তিনি বাংলায় অনুবাদও করেছিলেন। কারণ তিনি দেখেছিলেন যে, মার্কস মানুষের মনে বস্তুবাদী মনোভাব সঞ্চারের প্রয়াসী হন এবং সমাজে অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু তিনি মার্কসের দর্শনকে নির্ভুল বলে মেনে নিতে পারেন নি। তার প্রধান কারণ যে, তিনি অদ্বৈত (monist) বিচারপদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। সেই নিরিখে মার্কসের ইতিহাসচিন্তায় অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। উক্ত বিচারভঙ্গিকে সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম নিয়ন্ত্রক বললে তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিতে একমাত্র অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর "সংসারের সুশ্রী-বিশ্রী, সু-কু, ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্য, উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে ; এক কথায় উৎকর্ষের, সংস্কৃতির আর সবকিছু চিরকাল নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে আর্থিক শক্তির দ্বারা"—এই মনোভঙ্গি বহুত্ববাদে বিশ্বাসী বিনয়কুমারের কাছে গ্রহণযোগ্য না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অর্থনৈতিক কার্যকারণ ছাড়াও সামাজিক বিবর্তনে "হাজার শক্তি একসঙ্গে বা কতকাংশে পরে পরে কাজ করেছে"।[৭]

বিনয়কুমার প্রত্যক্ষ করেন যে জনকল্যাণ সদাই জটিল। শান্তি চাইলে প্রগতি থাকে না, আবার প্রগতির পরিবেশে শান্তি পাওয়া দুষ্কর। শান্তি ও প্রগতিকে তাই তিনি পরস্পরবিরোধী বলে মনে করতেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা গণতন্ত্র তেমনি সদাই সমস্যার সম্মুখীন হয়। নিরন্তর বাধাবিপত্তি ও সংকট অতিক্রম করে গণতন্ত্রকে অগ্রসর হতে হয়। ইতিহাসের স্বরূপ হল যে স্থিতাবস্থা কিংবা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সমন্বয় (synthesis) নিয়তই সংকট, অসামঞ্জস্য, সংঘর্ষ ও বাদবিসংবাদের ফলে জটিল হয়ে পড়ে।[৮]

ব্যক্তিমানস ও সমাজমনের মধ্যে যে নিরন্তর দ্বন্দ্ব দেখা যায় সেটিকে তিনি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। সামাজিক দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে হলাহল উঠে এলেও পরিণামে মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায়। কারণ মানবমনে এক বহুত্ববাদী (pluralistic) প্রবণতা প্রচ্ছন্ন থাকে। অণু ও পরমাণু থেকে শুরু করে মানব-মনের সর্ববিধ ক্ষেত্রে যে বহুত্ব স্বাধীনভাবে বিরাজ করে সেটাই হল সত্যের মূলকথা। তাঁর মতে মানুষ বহুত্বমুখী জীব—তার রক্তের ধারায় বহুত্বের সত্তা সদাই প্রবহমান। তাই অদ্বৈত (monist) বিচারপদ্ধতি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য

হয় নি। ইতিহাসের গতিপথে তিনি যুগপৎ অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, যৌন বিষয়াদি প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় রূপের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করেন াসের ক্রমবিকাশে কেবল অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা বা জাতিতত্ত্বকে তিনি বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বলে মেনে নেন নি। অন্যান্য শক্তির ক্রিয়া ও প্রভাবকে তিনি সমধিক গুরুত্ব দানের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ বহু ও বিচিত্র শক্তি মানবসভ্যতার বিকাশে ক্রিয়াশীল থাকে।[৯]

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম পরিচায়ক 'শুক্রনীতি' গ্রন্থটি বিনয়কুমার ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। সেইসূত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এক অভিনব উপলব্ধি ঘটে। তাতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রাচীনকালে ভারতীয় ও ইউরোপীয় মানসিকতার মধ্যে কোনো প্রভেদ ছিল না। ম্যাক্সমুলার থেকে ভগিনী নিবেদিতা পর্যন্ত মনীষীদের মতামত উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, প্রাচীনকালে হিন্দুরা কেবল আধ্যাত্মিক মননকর্মে আবদ্ধ থাকত বলে পণ্ডিত মহলে যে-ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাঁর মতে ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ, যুদ্ধপ্রিয়, শক্তিযোগী ও সাম্রাজ্যবাদী ছিল যতটা তখন ইউরোপে দেখা যেত। আবার ইউরোপও ততটাই নীতিনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক ছিল, যতটা ছিল তখন ভারতবর্ষ। চার খণ্ডে প্রকাশিত 'পজিটিভ ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ সোসিওলজি' গ্রন্থে তিনি এই অভিমত সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন।[১০] 'পজিটিভ' শব্দটি তিনি দার্শনিক কোঁৎ-এর মতানুসারে বস্তুবাদী বা জাগতিক অর্থে ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য যে বিনয়কুমার কোঁৎ-এর দৃষ্টবাদের সমর্থক ছিলেন না। কারণ কোঁৎ-এর দর্শনে আত্মা, দেবদেবী, ধর্ম ইত্যাদির স্থান নেই। বিনয়কুমার ইন্দ্রিয়নিষ্ঠা ও ইহনিষ্ঠার প্রতি জোর দিতেন বটে, কিন্তু অতীন্দ্রিয় নিষ্ঠা ও অধ্যাত্মনিষ্ঠায় সমধিক বিশ্বাসী ছিলেন।[১১]

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পরে সম্ভবত বিনয়কুমার প্রাচীন ভারত তথা প্রাচ্যের বস্তুবাদী দিকটি বিশ্বসমক্ষে প্রথম তুলে ধরেন। সারা প্রাচ্যের ক্ষেত্রে এই মতবাদকে প্রসারিত করে তিনি বলেন যে, প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য বেশি নীতিনিষ্ঠ ধর্মপ্রবণ ও আধ্যাত্মিক—এই ধারণা নির্ভুল নয়। আবার প্রতীচ্য প্রাচ্য অপেক্ষা বেশি সংসারনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ ও ভোগনিষ্ঠ—এই ধারণাও ভুল। তাঁর মতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রভেদ অনেক পরে দেখা দেয় এবং সেটা মূলত আঠার ও উনিশ শতকে ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পরিণতি। তাই আপাতদৃষ্টিতে সেই প্রভেদকে তিনি কৃত্রিম বলে মনে করতেন, ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব ক্রমবিস্তারিত হওয়ায় উক্ত প্রভেদ যে কমে আসছে সে-বিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন।

রা ষ্ট্র দ র্শ ন

বিনয়কুমার মনে করতেন যে মানুষ সর্বাংশে একটি রাজনৈতিক জীব নয় এবং সেই কারণে রাষ্ট্রকে মানুষের সুখ ও দুঃখের একমাত্র পরিমাপক বলে মনে করা ভুল। তাঁর দৃষ্টিতে সমাজ হল মানবজীবনের প্রকৃত আধার। মানুষ সবার আগে একটি সামাজিক জীব আর রাষ্ট্র হল সমাজের একটি অঙ্গ। অ-রাষ্ট্রিক দিক সমূহ সমাজ জীবনে অনেকখানি জুড়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, মানুষের জীবন থেকে শুরু করে সমাজ, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির বিবর্তন কিংবা উত্থান ও পতনের পিছনে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ক্রিয়াকলাপ ছাড়াও আরো একটি শক্তি প্রভাব বিস্তার করে থাকে যাকে তিনি 'বিশ্বশক্তি' (world force) নামে অভিহিত করেন। সেটা অতিপ্রাকৃত দিব্যশক্তি গোছের কিছু নয়। মানুষের আপন সত্তা সমেত বিশ্বের যাবতীয় সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের সমন্বিত রূপকে তিনি 'বিশ্বশক্তি' হিসাবে কল্পনা করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোনো দেশের ভালমন্দ কেবল তাদের নিজ দোষগুণেই ঘটে না, অন্যান্য দেশ ও জাতির প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাবও কাজ করে। কোনো দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি ও প্রেরণার উৎস হিসাবে সেই দেশের উদ্যম ও প্রয়াস ছাড়াও থাকে অন্যান্য দেশের চিন্তাভাবনা ও আন্দোলনের প্রভাব।[১২]

মানুষে-মানুষে সম্পর্কের প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের "কর্মধারা যে পদ্ধতিতেই চলিতে থাকুক তাহা একটা আধ্যাত্মিকভাবেই প্রণোদিত হইয়া থাকে। মানুষের সৃষ্ট কোন বিষয় আধ্যাত্মিকভাব প্রণোদিত নয় এমন কথা চিন্তা করা যায় না। মানুষ একটা স্বভাবগত প্রবণতার বশে অপরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন বা সহানুভূতিসম্পন্ন হয় বলিয়াই তাহাকে সামাজিক জীব বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই; অপরের সাহচর্য, সম্পর্ক এবং অপরের কাজের প্রতিক্রিয়া হইতেই মানুষের সামাজিকতাভাব আসে।...সম্পর্কটা প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর যাহাই হউক না কেন, মানুষ সামাজিক জীব...মানুষের প্রবৃত্তি ও সমাজশক্তির বহুত্বের কথাটা অবশ্যই বিবেচনা" করে দেখার গুরুত্ব তিনি অনুভব করতেন।[১]

রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্পর্কেও বিনয়কুমারের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। রাষ্ট্রকে প্রকৃতির সমতুল অথবা জীবসদৃশ প্রত্যয়ে বিচারভঙ্গি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিছু লোক যেমন স্বেচ্ছায় একটা সওদাগরি কোম্পানি গড়ে তোলে, রাষ্ট্রের উৎপত্তিও তাঁর কাছে ছিল অনেকটা সেই গোছের। মানুষের বহুমুখী বুদ্ধি ও সৃষ্টিশীল মস্তিষ্কের অন্যতম ফসল হল রাষ্ট্র। তাঁর কথায়—

> ...its genesis, expansion, contraction and dissolution may represent indeed the different reactions of the mystical *elan*

vital of a social group to the stimuli of its *milieu*.

ইচ্ছা অনুযায়ী সেটাকে যেমন গড়া যায় আবার ভাঙাও যায়। নানাকিছু জুড়ে যেমন একটা যন্ত্র তৈরি করা হয়, রাষ্ট্র তেমনি যেন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়া একটা বাণিজ্যিক কারবার বিশেষ।[১৪]

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি একথাও মনে করতেন যে, কোনো অন্তর্নিহিত জাতিগত আবেগ, ভাষা, ধর্ম কিংবা সংস্কৃতির তাগিদ মানুষকে প্রচলিত আকৃতিতে রাষ্ট্রবন্ধনে সংযুক্ত হতে উৎসাহিত করে না। তাই রাষ্ট্রের অবলুপ্তি মানুষের অবলুপ্তি নয়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে জবরদস্তির জন্যে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বিনয়কুমার রাষ্ট্রকে পীড়নকারীর ভূমিকায় আবদ্ধ রাখেন নি। রাষ্ট্র যায়, রাষ্ট্র আসে, কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী। প্রয়োজন বুঝে লোকে যেমন 'পার্টনারশিপ' কারবার ফাঁদে, মানুষও তেমনি রাষ্ট্র গঠন করে। রাষ্ট্রে একই সাংস্কৃতিক ধারা চোখে পড়ে বটে, কিন্তু একই রাষ্ট্রের ভিতরে নানান সংস্কৃতি দেখা যায়।[১৫]

উল্লিখিত অভিমত মেনে নিলে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রয়োজন স্বভাবতই মানুষের ইচ্ছাধীন। সকলের ঐকমত্য ব্যক্ত হতে পারে, আবার অব্যক্ত থেকে যেতেও পারে। বিনয়কুমারের মতে রাষ্ট্রের উদ্ভব স্বাধীন-দেশের অধিবাসীদের ইচ্ছাধীন এবং পরাধীন দেশে বিজেতাদের দ্বারা আরোপিত। রাষ্ট্র হয় একজনের হুকুমতে আবদ্ধ থাকে, নয়তো সার্বজনীন নামাবলীতে চলে স্বৈরতন্ত্র।[১৬]

বিনয়কুমার উপলব্ধি করেন যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তরোয়ালের উপর নির্ভর-শীল। সংস্কৃতি ধার করে চালানো যায়, কিন্তু তরোয়াল নিজের থাকা চাই। রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে মূলত আত্মরক্ষার প্রয়োজনে। ইতিহাসের দৃষ্টিতে, যুদ্ধের তাগিদে 'নেশন' বা জাতি গড়ে ওঠে। জাতি বিষয়টির মূলে থাকে সামরিক নিরাপত্তার চাহিদা। আর জাতীয়তাবাদের পিছনে ভাবাগত যদি কোনো আবেগ থাকে তাহলে সেটা হল প্রতিরক্ষা বা ক্ষাত্রধর্ম। পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘর্ষ এবং পারস্পরিক অবদমনের প্রবণতা হল জাতি প্রত্যয়ের পূর্বশর্ত। তাই তিনি মন্তব্য করেন যে, মানুষের চাহিদা অনুযায়ী রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব যখন পার্টনারসিপের মতো লোকের ইচ্ছাধীন, তখন জাতি ধর্ম ভাষা ইত্যাদির ভূমিকা নগণ্য। জাতি ধর্ম বর্ণ যাই হোক না কেন, আসলে সবাইকার ইচ্ছা ও সম্মতি হল যে কোনো সংগঠনের গোড়ার উপাদান। বিনয়-কুমার তাই দাবি করেন যে, অলৌকিক ব্যঞ্জনা মুক্ত এই বাস্তবানুগ তত্ত্ব অনুসারে রাষ্ট্র যথার্থই সার্বজনীন, বৈচিত্র্যময় ও উদারনৈতিক। মৌল চুক্তি থাকায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সমানভাবে সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎস জনসংখ্যা নয়, আক্রমণকারী প্রতিপক্ষের সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা ও প্রস্তুতি হল রাষ্ট্রশক্তির যথার্থ উৎস।[১৭]

বিনয়কুমারের দৃষ্টিতে জাতি (nationality) প্রত্যয়টির সারবত্তা হল সংস্কৃতি, গোষ্ঠী (race), ভাষা কিংবা ধর্ম নয়। সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সাহায্যে নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ডে বিশেষ একটি জাতি স্বাধীন রাজনৈতিক আকৃতি অর্জন করে। সেই ভূখণ্ডকে ঘিরে একটি সার্বভৌমত্বের আবেগ বা ইচ্ছার মাধ্যমে জাতি মূর্ত হয়ে ওঠে। শুধু ঐক্য নয়, স্বাধীনতাও চাই। একটি জাতির মধ্যে এক বা অনেক গোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতি থাকতে পারে। সেই বৈচিত্র্য যে দুর্বলতার কারণ হবে সে আশঙ্কা অমূলক। জাতিরাষ্ট্রের (nation-state) ক্ষেত্রে তাই ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐক্য খোঁজা তিনি অর্থহীন বলে মনে করতেন। ঐসব ঐক্যবিশিষ্ট সমষ্টির ভিত্তিতে শুধু ইউরোপে কেন, তাঁর ভাষায় "পৃথিবীর কোন মুল্লুকে রাষ্ট্র কায়েম করা অসম্ভব"।[১৮]

বহুত্ববাদে বিশ্বাসী বিনয়কুমারের দৃষ্টিতে কোনো দেশ তা যতই ছোট হোক না কেন সেখানে একটিমাত্র মত, পথ বা 'ইজম' কখনও সেখানকার বিচিত্র ভাবনাচিন্তা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনকে একই ধাঁচে ব্যাখ্যান দিতে পারে না। সারা দুনিয়ায় বহুবিধ রাষ্ট্রতত্ত্ব ও ক্রিয়াকলাপের ভিতর একটি কোনো মতবাদ বা আদর্শের সন্ধান করা অর্থহীন।[১৯]

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিনয়কুমার দার্শনিক হবস-এর কঠোর চিন্তাভাবনাকে দেশকাল নির্বিশেষে বাস্তব সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। সার্বভৌমত্ব ও আইনের শাসন থাকা সত্ত্বেও মানবচরিত্রের খতিয়ানে জবরদস্তি, চাপসৃষ্টি বা পীড়নের ধারা রাষ্ট্রের মূলে অন্তঃসলিলার মত প্রবহমান। মোট কথা, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, আইন ও অন্যবিধ নিয়মনিষ্ঠার অন্তরালে বিরাজ করে জবরদস্তি শাসন তথা স্বৈরতন্ত্র। তাঁর দৃষ্টিতে গণতন্ত্র স্বৈরতন্ত্রের পরিপন্থী নয়, কিংবা স্বৈরতন্ত্র সর্বাংশে স্বাধীনতার অন্তরায় নয়। তাঁর মতে, উভয় ধরনের সমাজব্যবস্থা পরস্পরের পরিপূরক। জবরদস্তি সব ধরনের রাজনীতির গোড়ার কথা, গণতন্ত্র তা থেকে বাদ যায় না। কারণ গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্র বিষয় দুটি আপেক্ষিক। তাঁর কথায়—

> Like all other moral and societal phenomena these are conditional, conditioned, limited and relative.[২০]

উল্লিখিত অদ্ব্যর্থ মনোভাব সত্ত্বেও বিনয়কুমার মানসিক দোটানা থেকে রেহাই পান নি। নৈরাশ্যকর ও নিষ্করুণ অবস্থার মাঝে তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন এই মর্মে যে, তাহলে ব্যষ্টি ও গোষ্ঠীজীবনে মুক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সৃজনসত্তা, স্বাধীন চিন্তা ও গণতন্ত্রের অবকাশ কোথায়? উত্তরে নিজেই বলেছেন যে, সামাজিক চুক্তির (social contract) মাধ্যমে ঐসব মূল্যবোধ স্থাপন সম্ভব। সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে মানুষ পারস্পরিক চাহিদার শর্তপূরণ ও সম্মতির সাহায্যে সমাজবদ্ধ হয়। তিনি বলেন—

…once we are in a position to discern the existence of contract in a societal system, the presence of individuality, free will, liberty and democracy is to be admitted automatically.[২১]

তাই তিনি শেষাবধি মন্তব্য করেন যে, রাজনীতিতে মানবচরিত নিরূপণে হবস-এর *Leviathan* অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী, ভ্রমাত্মক ও বিভ্রান্তিকর।

বস্তুত গণতন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল, কিন্তু নিজস্ব দৃষ্টিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানবিক মূল্যবোধের মাপকাঠিতে গণতন্ত্র হল ব্যক্তিস্বাধীনতার আধার এবং সেই নিরিখে তারতম্য সাপেক্ষ গণতন্ত্র তথা ব্যক্তিস্বাধীনতা যে-কোনো দেশের চেয়ে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত দেশগুলিতে বেশি দেখা যায়। অন্যদিকে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের দ্বিধারায় সোভিয়েত ইউনিয়ন. ফ্যাসিবাদী ইতালি ও নাজি জার্মানিকে তিনি স্বৈরতন্ত্রী ধারায় বিচার করেন। প্রথমটি সর্বহারার একনায়কত্ব এবং অপর দুটি ধনতন্ত্রী একনায়কত্বের গোত্রে পড়ে। স্টালিন, মুসোলিনী ও হিটলারকে তিনি সমপর্যায়ে দেখতেন। তাঁর দৃষ্টিতে কেউ শ্রেণী সংগ্রাম, কেউ জাতীয় ঐতিহ্য এবং কেউবা পিতৃভূমির হৃতগৌরব ফেরানোর ধ্বনিতে মুখর। রাশিয়া, ইতালি ও জার্মানিতে তিনি একই ধাঁচের একদলীয় রাজত্ব প্রত্যক্ষ করেন।[২২]

ফ্যাসিবাদের স্বরূপ সম্পর্কে বিনয়কুমারের উপলব্ধি ছিল অস্পষ্ট। কেননা একদা অনুন্নত ইতালির পরবর্তী ফ্যাসিবাদী অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহ্য রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। সুভাষচন্দ্রের মতো তিনিও মনে করতেন যে ইতালির নজির ভারতের কাছে মূল্যবান। নবীন ভারতের ধনতান্ত্রিক বিকাশে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি উন্নত দেশের চেয়ে উন্নয়নশীল ইতালির সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ভারতের কাছে অনুকরণীয়। তিনি তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন এই বলে—

…thanks partly to the Fascists, to catch up to the highest, Indian patriots have much to learn by observing the steps which Italy has been taking.[২৩]

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশ ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতি অতিক্রম করে ইতালি শিল্পোন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের তাগিদে যে স্বৈরতন্ত্রী পথে অগ্রসর হয়, এবং যাবতীয় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে বিসর্জন দেয়, সেটা সম্ভবত তিনি ভারতের পরাধীনতাজনিত জাতীয় গ্লানি ও আবেগে উপেক্ষা করেন। স্বভাবতই হিটলারকে তিনি "maker of a new epoch" বলে অভিহিত করেন। প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানিকে জগৎসভায় আবার শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানোর জন্যে তিনি মন্তব্য করেন যে, হিটলার ছিলেন: "…greatest of Germany's teachers and inspirers since Fichte."[২৪]

জার্মানির অভ্যুন্নতি ও হিটলারের প্রশংসায় বিনয়কুমার উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেন—

What young Germany needed badly was the moral idealism of a Vivekananda multiplied by the iron strenuousness of a Bismark. And that has been furnished by Hitler.[২৫]

এশিয়াবাসীদের কাছে হিটলারের রীতিনীতি প্রেরণার উৎস হওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

স্পষ্টতই বিনয়কুমারের চিন্তায় উগ্র ও আগ্রাসী জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুরাগ নজরে পড়ে। তাই তিনি এই বিশ্বাসও পোষণ করতেন যে, দুনিয়ার দেশপ্রেমিকেরা কার্ল মার্কসের পরিবর্তে হিটলারের আদর্শে অধিক অনুপ্রাণিত হবে। তাঁর দৃষ্টিতে হিটলারের সাফল্যের কারণ হল, নাৎসী মতাদর্শে শ্রেণী সংগ্রামী দর্শনের পরিবর্তে শ্রেণী সমন্বয় ও জাতীয় ঐক্যবোধের প্রাধান্য। হিটলারকে তিনি "Messiah of economic and social emancipation for the workers, clerks and peasants" বলে প্রশস্তি করেন। তাতে তাঁর পূর্বকথিত গণতন্ত্রী মূল্যবোধের আদর্শ ও চেতনার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী প্রবণতার বিরোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[২৬]

বিনয়কুমারের রচনাদিতে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়টির বিশেষ সমাদর দেখা যায়। সেক্ষেত্রেও তাঁর মনে নাৎসী মতাদর্শের অন্তর্গত ভূরাজনীতির (Geopolitik) প্রভাব লক্ষনীয়। ভূরাজনীতি তত্ত্বের উদ্ভাবনা করেন (১৯১৬) সুইডেনের রুডলফ কেলেন। পরে জার্মানিতে বিষয়টির প্রসার ঘটে কার্ল হসোফারের চিন্তায়। সেই মতাদর্শে ভৌগোলিক ও সামরিক সুবিধাদির নিরিখে ক্রমবর্ধমান কোনো জাতির বসবাসের তাগিদে ভূখণ্ড বিস্তারের জিগির তোলা হয়। তাতে আগ্রাসী মনোভাব ফুটে ওঠে। তাই তত্ত্বটি নাৎসী মতাদর্শে যুক্ত হয়েছিল। বিনয়কুমার অবশ্য তত্ত্বটিকে কেবল জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক পরিধিতে আবদ্ধ রাখতে চান নি। বাঙালী ও বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে তত্ত্বটি তাঁর প্রয়োগের প্রস্তাব কার্যত প্রাদেশিকতার নামান্তর।

সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের নানা বিষয়ে বিনয়কুমারের বিপুল চিন্তাভাবনা তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়িয়ে আছে। কয়েকটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা এখানে করা যেতে পারে।

দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে তিনি অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতেন। জন্মগত দিক থেকে তিনি কোনো জাতি বা শ্রেণীকে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বলে

মানতেন না, তাঁর কথায়—

Race-absolutism or race-monism is an historic unreality in the domain of intelligence quotients and culture.[২৭]

নারীত্বের ক্ষেত্রেও তিনি দেশ ও জাতিগত কোনো পার্থক্যে বিশ্বাস করতেন না। নারী মাত্রেই কতকগুলি সহজাত আবেগ ও জৈবসকার অধিকারী। তাতে দেশ ও সমাজগত কোনো প্রভেদ নেই। সর্ববিষয়েই তাই তিনি চাইতেন নারীর সমান অধিকার। কর্মবিভাজনে নারী ও পুরুষের শক্তি ও সামর্থের তারতম্য তাঁর কাছে ছিল খুবই সীমিত। সেই দৃষ্টিতে নারী জাতির পশ্চাৎপদতা সম্পূর্ণ কৃত্রিম এবং দেশগত বিচারে আপেক্ষিক। মনন ও সৃজনকর্ম ছাড়াও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনে ভারতের নারী সমাজ যথেষ্ট সক্রিয় বলে তিনি মনে করতেন। ভারকে পর্দা প্রথার বিরোধিতা করে তিনি বলেন যে, ঐ প্রথার ফলে নারী জাতির স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ন হয়।[২৮]

জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির বিষয়ে বিনয়কুমারের মনোভঙ্গি ছিল অভিনব। জনসংখ্যার চাপকে তিনি আদৌ সংখ্যার নিরিখে বিচার করতেন না। তাঁর বিচারের ভিত্তি ছিল অর্থনীতি, যেটা সদাই পরিবর্তনশীল এবং আপেক্ষিক। তাঁর কাছে জনসংখ্যার প্রশ্নটি অর্থনৈতিক উন্নতি কিংবা অবনতির প্রতিধ্বনি মাত্র। তাঁর কথায়—

Wherever there is poverty, i. e., low purchasing power and low standard of living, there is over-population. This is a danger to which every country including the richest is liable.

স্বভাবতই ভারতের জনসংখ্যার প্রশ্নটিকে তিনি অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রতিফলন বলে মনে করতেন। তাঁর যুক্তিতে জনসংখ্যা কম হলেও অনগ্রসর অর্থনৈতিক অবস্থায় সেটাও একটা গুরুভার বিশেষ। ভারতের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হলে জনসংখ্যার গুরুভার অনুভূত হবে না। এবিষয়ে সমস্যা ও সমাধানের প্রশ্নে উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে কোনো প্রভেদ আছে বলে তিনি মনে করতেন না।[২৯]

বিনয়কুমার তাঁর পরিণত জীবনে লেখা *Villages and Towns as Social Pattern* (1941) গ্রন্থে সমকালীন সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন। ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির ব্যাপকতা দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে, দেশে পল্লী ও শহর নির্বিশেষে সর্বত্র বিত্তবান লোকেরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে, ব্যক্তি, পরিবার ও দলের বিবেক ও মর্যাদা তারা কিনে নিতে পারে। সাহিত্য, শিল্প থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে পয়সার দাপট বেশি। বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক মর্যাদা অর্থের উপর নির্ভর করে। কৌশলবাজ লোকে জ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে সম্মান আদায় করে নেয়।

পল্লী অঞ্চলে মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার আগে যেটুকু পারস্পরিক সম্প্রীতি ও

সমতাবোধ ছিল তা নষ্ট হয়ে গেছে—ধনী-নির্ধন, নেতা-কর্মী, প্রার্থী ও ভোটারের মধ্যে ক্রমবর্ধিষ্ণু অর্থবৈষম্য, অসাম্য ও সম্প্রদায়গত ভেদাভেদের ফলে। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে ঘুষ, স্বজনপোষণ, চুরি, অপব্যয় ও অকর্মণ্য কর্মীর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে, এবং অন্যদিকে ভোটের কারচুপি, ভণ্ডামি, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের প্রভাব ও দরিদ্র মানুষকে নানাভাবে শোষণ ও প্রতারণাও বাড়ছে। উল্লেখ্য, প্রতিকার হিসাবে বিকল্প কোনো পথের সন্ধান তাঁর চিন্তায় তেমন বিশেষ পাওয়া যায় না।

শান্তি ও সংগ্রাম প্রসঙ্গে বিনয়কুমার বলেন যে, "শান্তির ন্যায় সংগ্রাম এক শাশ্বত ব্যাপার"। যুদ্ধ এবং অঙ্গ হিসাবে "সংগঠিত রক্তপাত ব্যতীত ব্যক্তিগত জীবন বা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন ধাঁচই কল্পনা করা যাইতে পারে না।" মানবিক ও নৈতিক বিচারে তিনি যুদ্ধকে বিশেষ প্রয়োজন বলে অভিমত প্রকাশ করেন। বিশ্বশান্তি মানবজাতির পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ তাতে এক বা একাধিক জাতি দুই গোলার্ধকে দাবিয়ে রাখতে পারে।

বিনয়কুমারের দৃষ্টিতে যুদ্ধ হল নৈতিক দক্ষতা ও আধ্যাত্মিক মনুষ্যত্ব পরীক্ষার গবেষণাগার। "জীবন্ত ও বীর্যবান জাতির পক্ষে যুদ্ধ আশীর্বাদ-বিশেষ" কারণ সংশ্লিষ্ট জাতি নিজেদের বিপদ ও বৈরী প্রতিপক্ষের মতিগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তাঁর মতে—

> স্থিরনিশ্চয় নিরাপত্তার জীবন ও ঝুঁকিহীন জীবন সুস্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর নয়…আধুনিক কালের যুদ্ধে সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব, বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিসঙ্গত সংগঠন এবং উন্নত ধরনের আর্থিক কাঠামো প্রয়োজন।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের শুভফল সম্পর্কে তিনি বলেন যে, তার "মন্দ দিকগুলিই একমাত্র দিক নয়।" সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির অন্তর্গত বিরাট সংখ্যক লোককে "একই ধাঁচযুক্ত ও সংঘবদ্ধ জীবন-ধারার মধ্যে আনিতে পারে।" এবং মানবিক ও উদারতন্ত্রী মান অনুযায়ী "বিশ্বের নীতি, রীতি ও ভাবাবেগের যুক্তিসিদ্ধতা সম্পাদন করা সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা সম্ভব।"[৩০]

আ র্থ নৈ তি ক চি ন্তা

অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বিনয়কুমারের মনোভঙ্গি দেশের প্রচলিত দুটি জনপ্রিয় ধারা থেকে পৃথক পথ অনুসরণ করে। অর্থাৎ গান্ধীর বিকেন্দ্রিত গ্রামীণ বিধিব্যবস্থার প্রস্তাবে তিনি সম্পূর্ণ সায় দিতে পারেন নি, অন্যদিকে তেমনি সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পশ্চিমী দেশগুলিতে

যে বিপুল উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, সেটা ভারত তথা এশিয়ার পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে অনুসৃত হওয়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বাঞ্ছনীয়। সেইসঙ্গে তিনি একথাও অনুভব করেন যে পশ্চিম ইউরোপ কিংবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রয়াস পশ্চাৎপদ দেশগুলির যুগপৎ উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল।[৩১]

অসম বন্টন কিংবা শোষণকেই তিনি ভারতে দারিদ্র্যের প্রধান কারণ বলে স্বীকার করতেন না। তাঁর চোখে জীবনধারণের উপযোগী কর্মসংস্থানের অভাবই হল আসল সমস্যা। বেকার সমস্যা তথা অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার প্রতিকার হিসাবে তিনি ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের সুপারিশ করেন। প্রস্তাবিত উন্নয়নের ফলে পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে আনুষঙ্গিক অর্থনৈতিক কর্মপরিসর সম্প্রসারিত হবে। অনুষঙ্গী শত সহস্র কাজকারবার ও কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে। কৃষির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার চাপ কমে যাবে এবং আদিম কর্মপদ্ধতি থেকে মুক্ত হয়ে কুটির শিল্প নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সহায়ক হবে। অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য ও সংস্কৃতির ধারা বিকাশের পথ খুঁজে পাবে। ব্যক্তিসত্তা, মনুষ্যত্ব, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক চেতনা ও অর্থনৈতিক নবোদ্যমের স্বাদ দেশের আপামর মানুষ পাবে বলে বিনয়কুমার স্থিরনিশ্চয় ছিলেন।[৩২]

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী একটি পরিকল্পনার খসড়া তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। তাতে কৃষিকর্মের উন্নতির জন্যে তিনি ক্ষেতের জমি বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। কিন্তু ভূমিব্যবস্থা বা জমিদারি প্রথার বিলোপ সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য উপস্থাপিত করেন নি। উদ্বৃত্ত কৃষক জনসংখ্যাকে তিনি কুটির শিল্পে নিয়োগের প্রস্তাবনা করেন। প্রসঙ্গত তাঁর বক্তব্য ছিল—

> the charka and khaddar have still a place in the social economy ...as soon as peasants are diverted from agriculture.[৩৩]

পরিকল্পনার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকর্ম এবং মালিকানায় সমবায় প্রথার প্রবর্তন। কৃষি ছাড়াও ছোট ব্যবসায়ী, কুটির শিল্পী শ্রমিক প্রভৃতি শ্রেণীর জন্যেও তিনি সমবায় প্রথার প্রবর্তন সুপারিশ করেন।

শিল্পোন্নয়নের জন্যে যে বিপুল পমাণ মূলধনের প্রয়োজন সেবিষয়ে বিনয়কুমারের অভিমত আজও প্রণিধানযোগ্য। তিলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ভারতে প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহের সম্ভাবনা কম, এবং সেজন্যে চাই বিদেশী মূলধনের সন্ধান। বিদেশী মূলধন ও লগ্নী ব্যতিরেকে ভারতবাসীর বৈষয়িক উন্নয়ন ও মননের উৎকর্ষসাধন অসম্ভব। বিদেশী মূলধন সবসময়ে অভিশাপমাত্র নয়, আশীর্বাদও বটে।

তবে বিদেশী মূলধনের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক কোনো বাধ্যবাধকতা

যাতে না থাকে সেবিষয়ে তিনি হুঁশিয়ার করে দেন। তবে লগ্নীকৃত বিদেশী মূলধনের মুনাফা অনেকাংশে যে দেশের বাইরে চলে যাবে সেবিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। তা মেনে নিয়েই তিনি বলেন, "half a loaf is better than no bread"।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায় যে, বিনয়কুমার ছিলেন মিশ্র অর্থনীতির সমর্থক। ব্যক্তিগত মালিকানা, জাতীয়করণ ও সমবায় প্রথার কোনোটাকেই তিনি বর্জন করেন নি। শ্রমিক কল্যাণ, সামাজিক বীমা ইত্যাদির প্রবক্তা হিসাবে তাঁকে কল্যাণরাষ্ট্রের অনুরাগী বলা যায়। বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবীমা এবং শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্যে মালিকপক্ষের নিখরচায় চিকিৎসা ব্যবস্থার দাবিতে তিনি আমরণকাল প্রচার চালিয়েছিলেন।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার বিষয়ে বিনয়কুমার কোনো বদ্ধ ধারণার বশবর্তী ছিলেন না। কার্যকরিতার দিক থেকে তিনি অর্থনৈতিক কাঠামো নিরূপণের সুপারিশ করেন। জাতীয়করণ তাঁর কাছে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। তিনি বলেন যে, জাতীয়করণ সবদেশেই চিরকাল দেখা গেছে এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের রুখতে গেলে জাতীয়করণের পথ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে পশ্চাৎপদ ভারতের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দিক থেকে জাতীয়করণ সময়োচিত নয় বলে তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল। যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন যে, ব্রিটেন অথবা ফ্রান্স দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে ব্যাপক হারে জাতীয়করণের পথ অনুসরণ করে, সেখানে এক বা অর্ধ শতক কাল আগেও তার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। সেই নিরিখে ভারত দুতিন পুরুষ পেছিয়ে রয়েছে। ভারতের সমকালীন জনচেতনা ও অর্থনৈতিক অবস্থায় জাতীয়করণের প্রয়াস ব্যর্থ হবে বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে এদেশে সরকারি কর্মীদের সততা ও দক্ষতা এবং কর্মস্থলে যথাসময়ে হাজিরা ও নিয়মানুবর্তিতার বোধ ও বিবেক থাকা সবচেয়ে আগে দরকার। সরকারি কর্মীদের বিনা আয়াসে বর্ষশেষে বেতন বৃদ্ধি ঘটে এবং পদোন্নতিও আটকায় না। পক্ষান্তরে ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত ব্যবসাবাণিজ্যে যথেষ্ট শ্রম ও শক্তি নিয়োগ এবং সেই সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতা, পুরো সময় কাজ ও দায়িত্বশীলতা দেখাতে পারলে তবেই আর্থিক উন্নতির পথ সুগম হয়।

শিক্ষাচিন্তা

মননের বহুবিধ ও বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে বিনয়কুমার বিচরণ করতেন; কিন্তু আবেগের দিক থেকে আজীবনকাল তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাব্রতী। শুধু নেশায় নয়, পেশাতেও তিনি ছিলেন যথার্থ একজন শিক্ষক। তাঁর শিক্ষাদর্শনের

পদ্ধতি ছিল আরোহী (inductive) ; পরীক্ষানিরীক্ষা ও হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি সূত্র নির্ণয় করতেন।

তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষার মূল আদর্শ হল মননশক্তির বিকাশ, সত্যের সন্ধান ও জ্ঞানান্বেষণে মানুষের পুরোবর্তী হওয়া। শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা সঞ্চারের জন্যে ধর্ম বা অন্য কোনো নীতিগ্রন্থের প্রয়োজন নেই, ত্যাগ, কর্মনিষ্ঠা, পরার্থবোধ, জনকল্যাণ ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ থেকে নৈতিকবোধ গড়ে উঠবে। চরিত্র গঠন ও জীবনের ব্রত নির্ধারণে শিক্ষার্থীর সংযম ছাড়াও চাই একজন বন্ধু বা পথপ্রদর্শকের। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-আন্দোলনকে কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা ধর্মীয় টানাপড়েনের ক্রীড়নক হিসেবে প্রচারকর্মে ব্যবহার করার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি চাইতেন যুক্তিনির্ভর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে এবং বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাদর্শের দ্বারা শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা।[৩৫]

বিনয়কুমার শিক্ষাক্রমের বিষয়বিন্যাস ও প্রয়োগ-পদ্ধতির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর *Steps to a University* (1912) পুস্তিকায়। তাতে তিনি শৈশবকাল থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবিষয় ও প্রণালীর যে সুপারিশ করেছেন তার সঙ্গে বলা বাহুল্য বর্তমানে প্রচলিত পাঠক্রমের কোনো মিল নেই।

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে সর্ববিষয়ের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পড়াশোনার প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন। পরবর্তী আরও কয়েকটি স্তরের পড়াশোনায় তিনি চাইতেন সকল বিষয়ে মোটামুটি দখল। প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ে লেখা-পড়ার মাধ্যম হিসাবে তিনি মাতৃভাষাকে প্রাধান্য দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রয়োজনে সংরক্ষণ আইনের সাহায্যে প্রাদেশিক ভাষা সমূহের উৎকর্ষ সাধনের সুপারিশ করেন। ইংরেজি ছাড়াও দুটি প্রাদেশিক ভাষা শেখাকে তিনি বাধ্যতা-মূলক করার প্রস্তাব তোলেন।[৩৬]

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত ছিল যে, দিনের পাঠ দিনেই সাঙ্গ করা এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যহই থাকা সমীচীন। ফলাফল ঘোষণার রীতি মাস অথবা বছরের পরিবর্তে অধীত বিষয়ের ভিত্তিতে নিয়মিত হওয়াই সঙ্গত। মনন ও নৈতিকতার বিকাশের সঙ্গে চাই নিয়মশৃঙ্খলার প্রতি সানুরাগ মনোভাব ও নিষ্ঠা।

সারা বিশ্বচরাচর ও মানব সম্প্রদায়কে তিনি শিক্ষার্থীদের ল্যাবর্যাটরি হিসেবে দেখার উপদেশ দেন। দৈনন্দিন কর্মতালিকায় মননশীল কাজের সঙ্গে সমাজোন্নয়নে আত্মনিয়োগ, স্বেচ্ছাসেবা, খেলাধুলা, বিনোদন ও মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক পর্যটন থাকা চাই। শিক্ষার প্রয়োজন ছাড়া দীর্ঘ ছুটি ও কর্মবিরতির তিনি বিরোধী ছিলেন।

নিরক্ষরতা যে দেশের সর্ববিধ উন্নয়নের প্রতিবন্ধক সে বিষয়ে তিনি কোনো

দ্বিমত পোষণ করতেন না। তবে অক্ষরজ্ঞান না থাকলে যে মানুষ অশিক্ষিত থাকে সেকথা তিনি মানতেন না। অক্ষরজ্ঞানের উপর কৃষক কিংবা কারিগরের দক্ষতা যে নির্ভর করে না সে বিষয়ে তিনি দৃঢ় মনোভাব ব্যক্ত করেন। তবে উৎপাদনের বৈচিত্র্য ও মানোন্নয়নের জন্যে কৃষক ও কারিগরদের উপযোগী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন। সেই কারণে তাঁর খসড়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জেলায় জেলায় কৃষি ও কুটির শিল্প বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব রাখেন।[৩৭]

উপসংহার

বাঙালীর মানবজীবনে একদা বিনয়কুমার সরকার ছিলেন এক প্রতিষ্ঠানবিশেষ, যাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন বিষয়ের এক বিরাট বিদ্বৎমণ্ডলী। মূলত সমাজবিজ্ঞানের যাবতীয় বিষয়ে স্বাধীন চর্চা ও বিতর্ক এবং তারই সূত্র ধরে নানাবিধ গ্রন্থাদির প্রকাশনা ছিল তাঁদের প্রধান কাজ।

বিনয়কুমারের মানসিক বিচরণক্ষেত্র ছিল বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময়। সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ইতিহাস, রাষ্ট্রদর্শন, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের চতুবর্গে তাঁর চিন্তাভাবনা সবচেয়ে বেশি এবং বিপুল পরিমাণে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সর্ববিধ বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনার সঙ্গে সমাজতাত্ত্বিক এবং বিশেষ করে গাণিতিক-সমীকরণ বিচারপদ্ধতি ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাবতীয় বিষয়কে সুসংবদ্ধ দৃষ্টিতে তিনি বিচার করতেন, কোনো বিষয়কে বিচ্ছিন্নভাবে দেখতেন না। ধর্ম, অধিবিদ্যা ও দর্শন তাঁর মননপরিধিতে বিশেষ স্থান পায় নি। ফলে তাঁর ইতিহাসচিন্তা ও রাষ্ট্রদর্শনের কোনো দার্শনিক অথবা আধ্যাত্মিক বুনিয়াদ বিশেষ চোখে পড়ে না। সময় বিশেষে সমাজ ও রাষ্ট্রের পিছনে প্রসঙ্গত কিছু আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত করেছেন মাত্র।

আজীবনকাল বিনয়কুমার দেশভক্তির আবেগে চালিত হন। যুক্তিবাদী এবং আধুনিকতার অনুরাগী হলেও ভারতীয় সমাজ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সমালোচনাবিমুখ। ভারত মহিমা প্রচার ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছিল তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার বস্তু। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ও আন্দোলনের বিচার করতেন শুধু, প্রত্যক্ষভাবে সেসবের সঙ্গে বিশেষ যুক্ত থাকেন নি। বিভিন্ন মহাদেশের বহু দেশে পর্যটনের ফলে তাঁর বিপুল বিদ্যাবত্তার সঙ্গে বিচিত্র অভিজ্ঞতার মিলন ঘটে।

বহুবিধ ইতিহাসগ্রন্থ রচনা এবং অভিনব বিচারবিশ্লেষণের জন্যেই হয়তো অনেকে তাঁকে ইতিহাসচিন্তার দিক থেকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। ইতিহাসকে তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিরিখে বিচার করতেন। মার্কসের সর্বব্যাপী

ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। কারণ তিনি ছিলেন বহুত্ববাদে বিশ্বাসী। সামাজিক বিষয়াদির বিবর্তন ও পরিবর্তনের পিছনে বহুবিধ কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বকে অবশ্য না মানলেও তিনি ভিন্ন দৃষ্টিতে সমাজমানসে এক নিরন্তর দ্বন্দ্ব থাকে বলে মনে করতেন এবং সেই দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে শুভ পরিণাম দেখা দেয়। কিন্তু দ্বন্দ্ব ছাড়াও সামাজিক সামঞ্জস্য ও সম্প্রীতির মধ্যে দিয়েও মানুষ কল্যাণকর পথে অগ্রসর হতে পারে বলে আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন।

ভারত ও প্রাচ্যের প্রাচীন জীবনে ইহমুখী ও বস্তুবাদী মনোভঙ্গির বিশেষ অস্তিত্ব ছিল বলে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেন সে-বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বস্তুবাদী সেই ধারার অবলুপ্তির কারণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে, ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পরে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানসিকতায় বিরাট প্রভেদ দেখা দেয়। সেইসঙ্গে অবশ্য তিনি একথাও বলেছেন যে প্রাচ্যে শিল্পবিপ্লবের ক্রমবিস্তারের ফলে সেই প্রভেদ কমে আসছে। তাঁর এই যুক্তি অতিসরলীকৃত। কারণ শিল্পবিপ্লবের আগে ইউরোপে যে বুদ্ধিবিভাসিত আন্দোলন (enlightenment) ঘটে তা ভারত ও প্রাচ্যের অন্যান্য অনুন্নত দেশে আজও দেখা দেয় নি। দেশে ভোগসর্বস্ব স্থূল বস্তুবাদী পরিবেশ এবং যন্ত্রশিল্পের প্রসার হয়েছে মাত্র, কিন্তু লোকের যুক্তিবাদী মনোভাব আজও বহু দূরে। তাছাড়া বর্তমান জীবনে ভারতের বস্তুতন্ত্রী প্রাচীন ধারার উপযোগিতা ও কার্যকর পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রদর্শনের অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ও ভাষ্য পাওয়া যায় বিনয়কুমারের বিভিন্ন গ্রন্থে। কিন্তু সুস্পষ্ট বিকল্প সমাজব্যবস্থার কোনো চিত্র তাতে বিশেষ পাওয়া যায় না। তাঁর গ্রন্থাদিতে ব্যবহারবহুল বিশ্বশক্তি (world force) প্রত্যয়টির সঙ্গতি নিতান্তই ক্ষীণ এবং আংশিক। প্রতীচ্যের দীর্ঘকালের কর্মনিষ্ঠা, নৈতিকতা, নাগরিক চেতনা ও অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধ ভারতীয় জনমানসকে সাধারণভাবে আজও স্পর্শ করে নি। এমনকি মার্কসীয় রাজনীতির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও মার্কসীয় বস্তুবাদী জীবনবোধ ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতে অচল। একই দেশে হাজার বছরের বেশি পাশাপাশি বাস করেও হিন্দু ও মুসলমানদের সম্পর্কে আসমান-জমিন ফারাক রয়ে গেছে। বিশ্বশক্তি প্রত্যয়ের অনুপযোগিতা ছাড়াও বিনয়কুমারের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে যুক্তিগ্রাহ্য কোনো হদিশ মেলে না।

উদারনৈতিক ও গণতন্ত্রী মানসিকতা থাকা সত্ত্বেও বিনয়কুমার ফ্যাসিবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পরাধীন ভারতের সমতুল একদা অনুন্নত ইতালির অভ্যুন্নতি তাঁকে বিমোহিত করে। তেমনি নাৎসি জার্মানির হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রয়াস দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। গভীর

স্বাদেশিকতার তাড়নায় আনুপূর্বিক বিবেচনা না করে তিনি ফ্যাসিবাদের অনুকূলে তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের সংমিশ্রণে আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন অনিবার্য।

শান্তি ও প্রগতির যুগপৎ অবস্থান সম্ভব নয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। তথাকথিত প্রগতির তাগিদে শান্তি এবং গণতান্ত্রিক অধিকার বিসর্জনের ত্যাগস্বীকার করার প্রশ্ন উক্ত অভিমতে প্রচ্ছন্ন। অনুরূপ দৃষ্টিতে তিনি যুদ্ধের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের ব্যাখ্যান করেছেন। যুদ্ধের গুণগান সুস্থ চিন্তার পরিচায়ক নয়। দেশ ও জাতির বিমূর্ত আদর্শ ও যূথবাদী স্বার্থের বেদীমূলে ব্যক্তিমানুষের জীবন উৎসর্গের প্রস্তাবনা ফ্যাসিবাদের নামান্তর। বস্তুত শান্তি ও স্থিতাবস্থা না থাকলে কোনো গঠনমূলক প্রয়াস সম্ভব হয় না। যুদ্ধ ও অশান্তি সামাজিক নৈরাজ্যের পথ প্রশস্ত করে। গণতন্ত্র হয় অস্তমিত। সামাজিক বিধিব্যবস্থা অচল কিংবা পীড়নমূলক অনুভূত হলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বিপ্লবের প্রকৃত উৎস হল চেতনাসম্পন্ন আবেগ এবং তার পদ্ধতি শান্তিপূর্ণ হওয়াটা সঙ্গতিহীন নয়।

স্বদেশের পরাধীনতার গ্লানি ও মনস্তাপের ফলে তাঁর মনে উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রাধান্য লাভ করে। তাই তিনি সামরিক শক্তি, জাতীয় ঐক্য প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। অবশ্য জাতিবিদ্বেষকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি, আবার বিশ্বজনীনতাকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। তবে তাঁর লেখনীতে বাঙালী জাতি সম্পর্কে আতিশয্য প্রকাশ একটি পরিশীলিত, সংকীর্ণতামুক্ত উদার ব্যক্তিকে প্রাদেশিক পক্ষপাতিত্বে বিসদৃশ করে তুলেছে।

আর্থনীতিক চিন্তায় বিনয়কুমার ধনতন্ত্রের অনুকূলে যুক্তিবহ এবং জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। তাহলেও সমাজতন্ত্রী অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পব্যবসায় ও সমবায় প্রথাকে সর্বাংশে বর্জন করেন নি; এমনকি গান্ধীবাদী অর্থনীতির অন্তর্গত চরকা ও কুটিরশিল্পকেও তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় স্থান দিয়েছেন। বেসরকারি উদ্যম ব্যতিরেকে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে সম্ভব নয় সেকথা তিনি ঐতিহাসিক নজিরে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা যায় না। জনচেতনা ও সামাজিক দায়িত্ববোধের অভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্য ভারতে যে ফলপ্রসূ হবে না সেবিষয়ে তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। লোকের দুর্নীতিপরায়ণতা ও কর্মশৈথিল্যের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত কাজকারবার লোকসানের কারণ হবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাঁর দূরদর্শিতা আজকের দিনে আরও বোঝা যায় যখন তিনি বলেছিলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশী সাহায্য ও মূলধনের প্রয়োজন হবে অনিবার্য। সেকথা আজ বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের উপর ভারতের অনেকাংশে নির্ভরতা থেকে বোঝা যায়।

শিল্পোন্নয়নকে বিনয়কুমার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, যাতে

কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের প্রসার ঘটে। কিন্তু সমহারে কৃষির উন্নয়নে তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। অথচ ভারত মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিনির্ভর সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসীর ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রীর জন্যে বিদেশী বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামার প্রয়োজন হয়। দেশবাসীর কৃচ্ছ্রসাধন হয়ে দাঁড়ায় স্বাভাবিক পরিণতি। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে গ্রামীণ অর্থনীতির পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের প্রতিকূল ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি কার্যকর কোনো পন্থা সুপারিশ করেন নি। পরন্তু জমিদারি প্রথাকে সমর্থন করেন। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাধান করার অভিমত ব্যক্ত করেন। তর্কের খাতিরে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য-বস্ত্রের সুষম ব্যবস্থা সম্ভব ধরে নিয়েও বলা যায় যে বাসোপযোগী ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য, সেকথা তিনি উপলব্ধি করেন নি। এবিষয়ে তাঁর অভিমত বাস্তবানুগ নয়।

বিনয়কুমারের মনীষা মূলত বিশ্লেষণধর্মী, তারই মধ্যে কোনো কোনো প্রসঙ্গে তাঁর গঠনমূলক মনোভঙ্গি ও মৌলিকতা দেখা যায়। রাষ্ট্রীয়, সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ কোনো বিকল্প চিত্র তিনি তুলে ধরেন নি। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা বিতর্কমূলক হলেও বিবেচনার দাবি রাখে। নিজস্ব ভাষা, প্রকাশভঙ্গি ও বিচারপদ্ধতিতে তিনি ছিলেন অনুপম। কালের ব্যবধানে তাঁর চিন্তায় অনেক স্ববিরোধ দেখা দেয়। বর্তমানে তাঁর চিন্তাভাবনার সঙ্গতি বহুলাংশে সীমিত। তবে ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহী ব্যক্তিরা বিনয়কুমারের গ্রন্থাদিতে অনেক অভিনব উপকরণ ও বৈচিত্র্যের আস্বাদ পাবেন।

উৎস নির্দেশ

১. M. N. Roy. *India in Transition.* 1971. p. 28.
২. Haridas Mukherjee. *Benoy Kumar Sarkar : A Study.* 1953. p. 6.
৩. Benoy Kumar Sarkar. *Dominion India in World Perspectives, Economic and Political.* 1949. pp. 101-২, 109-12.
৪. ------*The Science of History and the Hope of Mankind.* 1912. p. vi.
৫. *Ibid.* pp. 11-12.
৬. ------*The Political Philosophies Since 1905.* V. 2. Part I. p. 36.
৭. হরিদাস মুখোপাধ্যায়। 'বিনয় সরকারের বৈঠকে'। ১৯৪২। পৃ ৪৪৯।
৮. Benoy Kumar Sarkar. *op. cit.* p. 37.
৯. *Ibid.* p. 28.

১০. হরিদাস মুখোপাধ্যায়। 'ইতিহাস চর্চায় বিনয় সরকার'। ১৯৫৮। পৃ ৩৬।
১১. হরিদাস মুখোপাধ্যায়। 'বিনয় সরকারের বৈঠকে'। পৃ ৭২।
১২. Benoy Kumar Sarkar. *The Futurism of Young Asia and other essays on the relations between the East and the West*. 1922. pp. 306-7.
১৩. ———*Villages and Towns as Social Pattern*. .941. p. 82.
১৪. ———*The Politics of Boundaries and Tendencies in Institutional Relations*. V. 1. p. 11.
১৫. *Ibid* p. 14 ১৬ *Ibid*. ১৭. *Ibid*. p. 21.
১৮. বিনয় কুমার সরকার। "বাঙালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা"। *Acharya P. C. Roy Commemoration Volume*. 1932. pp. 201-15.
১৯. ———*The Political Philosophies Since 1905*. V. 2. Preface.
২০. *Ibid*. p. 4. ২১. *Ibid*. p. 3. ২২. *Ibid*. p. 4.
২৩. ———*The Politics of Boundaries*. pp. 202-3.
২৪. ———*Political Philosophies Since 1905*. p. 120.
২৫. *Ibid*. p. 130.
২৬. *Ibid*. p. 145.
২৭. Quoted in : Subodh Krishna Ghosal. *Sarkarism*. p. 25.
২৮. *Ibid*.
২৯. প্রমথনাথ পাল। 'মহামনীষী বিনয়কুমার সরকার'। ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ। পৃ ১৩২, উদ্ধৃত।
৩০. তদেব। পৃ ১৩৩।
৩১. ———*Economic Development*. 1926. V. 1. p. 392.
৩২. *Ibid*.
৩৩. ———*A Scheme of Economic Development for Young India*. 1926. p. 17.
৩৪. ———*Dominion India in World Perspectives, Economics and Political*. *1949*. pp. 74-75
৩৫. ———*Introduction to the Science of Education*. 1913. p. xv.
৩৬. Ida Sarkar. "The Seven Creeds of Benoy Sarkar," in Baneswar Das (ed). *The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar*. 1939. pp. 184-198.
৩৭. বিনয়কুমার সরকার। 'নয়া বাঙ্গালার গোড়াপত্তন'। ১৯৩২। খণ্ড ২। পৃ ২৯০।

সুভাষচন্দ্র বসু ॥ ১৮৯৭-

সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, সতের বছর বয়সে তিনি এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল উপযুক্ত কোনো ধর্ম-গুরুর সন্ধান লাভ। সারা উত্তর ভারত ঘুরেও তেমন কোনো গুরুর সাক্ষাৎ পান নি। বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। সেই সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন।[১]

ছাত্রজীবনে ধর্ম ও দর্শনেই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশি আগ্রহ। সাহিত্য ও সমাজবিজ্ঞানে পড়াশোনার সুযোগ ঘটে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার সময়ে। ছাত্র হিসাবে বরাবরই তিনি ছিলেন কৃতী ও মেধাবী। ১৯২০ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। সিভিল সার্ভিসের শিক্ষানবিসি ছেড়ে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করেন। রাজনীতিকেই জীবনের ধ্যানধর্ম করে তোলেন; কষ্টসহিষ্ণুতার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসীম। বার দশেক দন্ডাদেশের মধ্যে বছর আটেক তাঁর কারাগারে কাটে। ভারতের মুক্তিই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন—সেকাজে না ছিল ক্লান্তি, না কোনো বিরতি।

একাধারে তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক। তিনি চাইতেন পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে আপসবিহীন সংগ্রাম। তাই আচরণেও দেখা যেত তাঁর অদম্য মনোভাব। লেনিন, মুসোলিনী, ডি ভ্যালেরা, কামাল পাশা প্রমুখ বিচিত্র মানুষ ছিলেন তাঁর আদর্শ।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা ও সমাজতন্ত্রে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত দেশের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন সম্ভব নয়। তাই লেনিনের আদর্শে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামকে ক্রমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অনুকূলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করাই ছিল তাঁর অভিমত। তিনি চেয়েছিলেন দক্ষিণপন্থী-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসকে একটি সর্বাত্মক গণদলে পরিণত করতে। সে চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়। তাই কংগ্রেসের মধ্যে কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে বামপন্থী দল গঠন এবং জাতীয় মুক্তির সঙ্গে যুগপৎ সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামে তৎপর হন।

কলকাতা ও কেমব্রিজের ছাত্রজীবনে তিনি প্রধানত দর্শন ও সেইসঙ্গে রাষ্ট্রতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দের চিন্তা তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করে। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠনে সহায়ক হন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র নিজে কোনো পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রদর্শন রচনা অথবা তত্ত্ব আলোচনার দিকে বিশেষ যান নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ

মাত্র দুটি: আত্মজীবনী *An Indian Pilgrim* (১৯৪৮) ও *The Indian Struggle : 1920-42* (১৯৬৪)। ঐ দুটিতেই তাঁর মৌল চিন্তাভাবনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়াও বাংলায় বিখ্যাত 'তরুণের স্বপ্ন' ও 'নূতনের সন্ধান' বই দুটিতে রাজনীতিসহ নানা বিষয়ের উপর পত্র, বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী সংকলিত হয়েছে। বহু পত্র, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পরবর্তীকালে 'পত্রাবলী', *Crossroads, Correspondence, Selected Speeches* প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র ছিলেন কাজের মানুষ; তত্ত্বকথার চেয়ে কাজকেই তিনি বড় মনে করতেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপেই তাঁর অসামান্য প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনের অধিকারী সুভাষচন্দ্রের রাজনীতিতে প্রবেশ করার (১৯২১) পর তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রথম পদক্ষেপ হল দেশবন্ধুর অনুগামী হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ। বছর দুয়েক ধরে জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা, 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা পরিচালনা ও কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের অধিকর্তা হিসেবে দেশবন্ধুর কাছে শিক্ষানবিস করেন। ক্রমে গান্ধীরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পরিচালনার দায়ে তাঁর সর্বপ্রথম মাস ছয়েকের মত কারাদণ্ড হয়। এতদিন তিনি যে গুরুর সন্ধান করছিলেন, কারাগারে তার সম্যক পরিচয় ও দীক্ষা লাভ করলেন। সেই গুরু হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

১৯২২ সালে গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে চিত্তরঞ্জন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার অনুযায়ী প্রাদেশিক কাউন্সিল বয়কট না করে বরং তাতে ঢুকে কাউন্সিলকে অচল করার নীতিই ছিল ভাল। তাঁর নেতৃত্বে দেশব্যাপী প্রচারকার্যের সুযোগে সুভাষচন্দ্র ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

গয়া কংগ্রেসের (১৯২২) পর চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য পার্টি গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র হন তাঁর প্রধান সহকারী। ১৯২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে সাফল্যলাভ ও শক্তিশালী দল হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে কম তৎপরতা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে লেবার স্বরাজ্য পার্টি গঠনও এই সময়ের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই বছরে চিত্তরঞ্জন কলকাতার প্রথম মেয়র হন এবং সুভাষচন্দ্র কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসারের পদ গ্রহণ করেন।

এই সময়ে বাংলা দেশে সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতা বেড়ে ওঠে। স্বরাজ্য-দলের মুখপাত্র হিসাবে সরকারিভাবে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করলেও সুভাষচন্দ্রের মন ঐসব বীরত্বব্যঞ্জক ক্রিয়াকলাপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাঁর কাছে সন্দেহ-ভাজন সন্ত্রাসবাদীদের আনাগোনায় তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে একজন বিপজ্জনক

ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হন। ফলে বছর দুয়েকের মতো তাঁকে বর্মায় নির্বাসিত (১৯২৫) করা হয়।

মুক্তির পর এক নতুন চেতনা ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দীক্ষাদাতা চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছে। জেলে থাকাকালে পুরানো অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে পত্রে ধর্মযোগী ও কর্মযোগীর চিন্তা ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁর একটা বিতর্ক হয়ে গিয়েছে। এখন মন তাঁর নিজস্ব মত ও পথে প্রস্তুত: কাজ ও সেবাই জীবনের ব্রত—জনকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলে কর্মের দিকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—দুরারোগ্য নিশ্চেষ্টতা থেকে দেশকে বাঁচাবার জন্যে দরকার উপযুক্ত কর্মিদলের; পরমার্থ নিয়ে চিন্তা করবেন একদল বাছা বাছা লোক—কর্মীদের পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব থাকবে তাঁদের।

এখন থেকে বিভিন্ন বক্তৃতায় তাঁর এই মনোভাব ফুটে ওঠে যে, কংগ্রেস সংগঠনকে বিকল্প সরকারের মতো গড়ে তুলে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে; শ্রমিকদের প্রস্তুতি ও জনশিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে; জাতীয় আন্দোলনকে সাধারণ ধর্মঘট ও আইন অমান্যের পথে চালিত করতে হবে; দেশের শাসন-ব্যবস্থা ক্রমে নিশ্চল হয়ে পড়লে সরকারের মনোবল নষ্ট হয়ে যাবে; সরকারি কর্মচারীদের উপর ভরসা রাখতে না পেরে আমলাতন্ত্র জনপ্রতিনিধিত্বের দাবি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোই ছিল তাঁর কামনা, ডোমিনিয়ন স্টেটাস নয়। জাতি, ধর্ম ও অর্থের বৈষম্য থাকবে না। নারী পাবে সমানাধিকার। হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য ভাঙতে হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে সমকালীন অন্যান্য নেতাদের মতো তিনিও বিদেশী শাসকদের কারসাজি বলে মনে করতেন; সমস্যাটিকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মধ্যেই তার সমাধান পাওয়া যায় বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

১৯২৬ সালের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র আইন সভায় প্রবেশ করেন এবং তার-পরই পুনরায় কারারুদ্ধ হন। জেলে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। ইউরোপে চিকিৎসা করাতে যাবেন বলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই সময়ে দেশের রাজনীতিতে একটা শূন্যতা চলেছিল। কারামুক্তির পর সুভাষচন্দ্র সেই শূন্যতার অবসান ঘটান। ১৯২৭ সালের শেষদিকে জওহরলালের সঙ্গে তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সচিব পদে নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সুপারিশে ডোমিনিয়ন স্টেটাস গ্রহণে সম্মতি থাকায় তিনি জওহরলালের সঙ্গে পূর্ণ স্বরাজের দাবিতে ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগ গঠন করেন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে মুক্তি মিছিল পরিচালনার জন্য বছর খানেকের মতো তাঁর কারাদণ্ড হয়। জেলে এইসময়ে তিনি গভীর অধ্যয়ন ও আধ্যাত্মিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। জেলে থাকাকালেই তিনি কলকাতার

মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুক্তির পর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। মাস তিনেক পর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্বাধীনতা দিবসের (১৯৩১) মিছিল পরিচালনার জন্য আবার কারারুদ্ধ হন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে মাস ছয়েকের মধ্যে মুক্তি পান। ১৯৩২ সালের ডিসেম্বরে গান্ধী বিলাতে গোল টেবল বৈঠক সেরে ফেরার পর দেশের রাজনীতিতে আবার এক নতুন সংকট ঘনিয়ে আসে। যথারীতি গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। সুভাষচন্দ্র সঙ্গীগণসহ গ্রেপ্তার হন (১৯৩২)। এবার তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। ভিয়েনায় চিকিৎসা করাতে যাবেন এই শর্তে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ভিয়েনায় চিকিৎসার সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তা অব্যাহত থাকে। সেই সময়ে সেখানে বিঠলদাস জাভেরি প্যাটেল (১৮৭৩-১৯৩৩)-ও চিকিৎসাধীনে ছিলেন। দুজনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখেন ও আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যান। ১৯৩২ সালে গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন মুলতবী রাখলে সুভাষচন্দ্র ও বিঠলদাস এক যুক্ত বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করে বলেন—

> ··আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রেখে মহাত্মা গান্ধী শেষ যে কান্ড করলেন তাতে মেনেই নেওয়া হোল যে, কংগ্রেসের বর্তমান পদ্ধতি অচল। আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মহাত্মা গান্ধী ব্যর্থ। সুতরাং সময় এসেছে এখন নতুন নীতির ওপর নতুন পদ্ধতিতে কংগ্রেসকে ঢেলে সাজবার। কংগ্রেসকে পুনর্গঠিত করতে হলে নেতৃত্বের বদল হওয়া দরকার···।[২]

১৯৩৩ সালের ১০ জুন লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র সাম্যবাদী সংঘ গঠনের ঘোষণা ও তার কর্মসূচি প্রচার করেন—

১. পার্টি দাঁড়াবে কিষাণ-মজদুরদের স্বার্থ নিয়ে, স্থিতস্বার্থ (vested interest) অর্থাৎ জমিদার, পুঁজিদার ও মহাজন শ্রেণীর স্বার্থ নিয়ে নয়।
২. ভারতীয় জনগণের পূর্ণ রাষ্ট্রিক ও আর্থিক মুক্তির জন্য এই পার্টি দাঁড়াবে।
৩. এর আদর্শ হবে সর্বভারতীয় একটা ফেডার‍্যাল গভর্ণমেন্ট, কিন্তু ভারতবর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য কিছুদিন অন্তত একনায়কী ক্ষমতাসম্পন্ন একটা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন করতে হবে।
৪. কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রবর্তিত পরিকল্পনা ও পুনর্গঠন।
৫. অতীতের গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিত্তিতে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা এবং জাতিভেদ প্রভৃতির উচ্ছেদ।
৬. আধুনিক প্রণালীর মুদ্রানীতি এবং মহাজনী ব্যবস্থা।

৭ জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ এবং সর্বভারতীয় নতুন ভূমিব্যবস্থা।
৮. অরাজকতা দমন করে স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য মধ্য-ভিক্টোরীয় গণতন্ত্র নয়, সামরিক নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা আবদ্ধ শক্তিশালী একদলীয় সরকার।
৯. আন্তর্জাতিক প্রচার এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্য গ্রহণ।
১০. একটি জাতীয় কর্মপরিষদের অধীনে সবগুলি অগ্রগামী দলের ঐক্যের চেষ্টা, যাতে কাজের সময় বহু ফ্রণ্টে একই কালে কাজ চলতে পারে।[৩]

'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থটিতে জাতীয় সংগ্রামের আনুপূর্বিক ইতিহাসের পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্র যুগপৎ নিয়মতান্ত্রিক সহযোগিতা ও গান্ধীর আপসপন্থী অচল নীতির সমালোচনা করে একটি অভিনব মধ্যপন্থা তুলে ধরেন। সে-পন্থা গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মাঝামাঝি কোনো পথ নয়। নির্ভেজাল একনায়কতন্ত্র—ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের সমন্বয়ে রচিত তৃতীয় একটি পথ প্রদর্শন করেন। তিনি চেয়েছিলেন: "বছর কয়েকের জন্যে ডিক্টেটরী ক্ষমতাযুক্ত একটি জবরদস্ত কেন্দ্রীয় সরকার···সামরিক শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি জবরদস্ত পার্টির দরকার"। তাহলেই স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র সুদৃঢ় হবে।

সেই বছরেই সুভাষচন্দ্র স্বল্পকালের জন্যে ভারতে এসে সরকারি নিষেধাজ্ঞার দরুন আবার ইউরোপে ফিরে যান। ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে তিনি সরকারি আদেশ অগ্রাহ্য করে ভারতে চলে আসেন। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৫ সালের নব প্রবর্তিত ভারত শাসন আইন অনুযায়ী কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সাধারণ নির্বাচনে (১৯৩৭) সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে সরকার গঠনে উদ্যোগী হলে সুভাষচন্দ্রের তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। আপত্তি ছিল জওহরলাল ও কংগ্রেস সোসালিষ্টদের। হরিপুরা কংগ্রেসে (১৯৩৮) সভাপতির পদ গ্রহণের পূর্বে তিনি কিছুকালের জন্য একবার ইংলণ্ড ঘুরে আসেন। লেবার পার্টির অ্যাটলি, বেভিন, ক্রীপস প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সে-সময়ে সহৃদয় আলাপ-আলোচনা হয়।[৪]

লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯)-এ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করা হয়ে থাকলেও তা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের অভিমত ছিল ভিন্ন। মানবেন্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি মনে করতেন যে, কংগ্রেসকে এক-পালটা সরকারে পরিণত করে জনসমর্থনের সাহায্যে প্রবল আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলে সরকারি শাসন অচল হয়ে পড়বে এবং ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে এসে যাবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেস আবেদননিবেদন ও নিয়মতান্ত্রিক পথ বেছে নেয় এবং তদনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার গঠনে প্রবৃত্ত হয়। সুভাষচন্দ্র তাতে তীব্র অসম্মতি প্রকাশ করেন। ১৯৩৭ সালে দীর্ঘ অন্তরীণ ও কারাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি রাজনীতিতে যখন ভালভাবে নামলেন তখন গান্ধীর সঙ্গে তাঁর এক গভীর আলোচনা হয়। বিষয়: দুজনের মত ও

পথের সামঞ্জস্য বিধান। গান্ধীর প্রস্তাবেই তিনি প্রথমবার কংগ্রেস সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। কিছু কিছু বিষয়ে দুজনের অমিল মিটল। কিন্তু সেটা ছাই চাপা আগুনের মতো। ক্রমে নানা বিষয়ে দুজনের মতবিরোধ বেড়ে চলল।

ইউরোপে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে; ইংরেজ পড়েছে বেকায়দায়। সুভাষচন্দ্র দেখলেন এ-সুযোগ গ্রহণ না করা ভারতীয় মুক্তিসংগ্রামীদের নির্বুদ্ধিতা; গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের ভরসাতেও থাকা যায় না; কংগ্রেসীরা তখন বিভিন্ন প্রদেশে সরকার গঠন করে ক্ষমতার আস্বাদ পেয়েছে; তারা তা ছাড়বে না; চাইবে ইংরেজের দরবারে দরদস্তুর করতে; কারণ ১৯৩৫ সালের শাসনবিধি অনেকেরই কাছে বিশেষ আপত্তিকর ঠেকে নি। কাজেই সরাসরি অবিলম্বে সংগ্রামে না নামলে ভবিষ্যতের কোনো আশা নেই বলে তিনি অনুভব করেন। ওদিকে গান্ধী উপলব্ধি করলেন যে, আইন অমান্য শুরু হলে আবার অরাজকতা ও হিংসাত্মক আবহাওয়া প্রবল হয়ে উঠবে। তাই গান্ধী ও সুভাষচন্দ্রের বিরোধ ছিল মূলেই।

সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের সমর্থনে ১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হন। দ্বিতীয়বারের তাৎপর্য ছিল যে, তিনি গান্ধী মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে নির্বাচনে পরাজিত করেন। ১৯৩৮ সালে জার্মান কনসালের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের গোপন যোগাযোগ ছিল বলে তাঁকে গান্ধী দ্বিতীয়বার সভাপতি পদে সমর্থন করেন নি। সমগ্র দক্ষিণপন্থীদেরই কাছে সেটি ছিল এক মস্ত পরাজয়। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল যে যদি নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে ভারতের জাতীয় মুক্তির দাবিকে স্বীকার করে না নেওয়া হয় তাহলে ইংরেজ সরকারকে একটি চরমপত্র দেওয়া উচিত। বাধা পড়ে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের একটি প্রস্তাবে। তাতে বলা হয়েছিল যে কংগ্রেস সভাপতিকে গান্ধীর পরামর্শ নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে হবে। ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করে কংগ্রেসেরই ভিতর ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করলেন।

একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বামপন্থী দলের প্রয়োজন তিনি অনেক আগেই অনুভব করেছিলেন। গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে একটি পাঁচমিশালী দল হিসাবে তিনি দেখতেন। কারণ কংগ্রেসের মধ্যে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তি ও মতবাদকে গোঁজামিল দিয়ে একত্র রাখা নিষ্ফল চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। পার্টির আদর্শ রূপ ও রীতি সম্পর্কে তিনি তাঁর সুস্পষ্ট চিন্তা ব্যক্ত করেন।

দেশের অন্যান্য বামপন্থী দলকে তিনি ঐক্যের আহ্বান জানালেন। কিন্তু তাঁর উপর তাদের আর আস্থা ছিল না। তারা সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ ও দক্ষিণপন্থীদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার বিরোধী ছিল।

প্রসঙ্গত ভারতে বামপন্থী আন্দোলনের সমসাময়িক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে

সংক্ষেপে একটু আলোচনা করা দরকার। ১৯৩১ সালে গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও লবন সত্যাগ্রহের পরে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রত্যাহার এবং গান্ধীর নিয়মতন্ত্রী পথে অগ্রসর হবার লক্ষণ দেখে কংগ্রেসের যুবশক্তি ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। প্রবাসে একদা মানবেন্দ্রনাথের লেখা পড়ে মার্কসবাদে উৎসাহিত জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর কয়েকজন সহগামীকে নিয়ে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি গঠন করেন (১৯৩৪)। মানবেন্দ্রনাথ তখন কারাগারে আবদ্ধ। তাঁর অনুগামীদের একাংশ উক্ত পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়। ভারতীয় কমিউনিস্টরা তখন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যালের ষষ্ঠ বিশ্বকংগ্রেস (১৯২৮)-এ গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উগ্র সংকীর্ণ কর্মপন্থা অনুসরণ এবং জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তী্র সমালোচনায় তৎপর। কমিন্টার্নের যুক্তফ্রন্ট কর্মপন্থা বর্জন এবং অতিবাম নীতি অনুসরণের সমালোচনা করায় ১৯২৯ সালে মানবেন্দ্রনাথ ইন্টারন্যাশন্যাল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যাবতীয় গণতান্ত্রিক দলকে ঐক্যবদ্ধ করতে বলেছিলেন তিনি। ১৯৩৫ সালে কমিন্টার্ন নিজের ভুল নীতি উপলব্ধি করে এবং ঐ বছরে সপ্তম বিশ্বকংগ্রেসে ফ্যাসিবিরোধী যুক্তফ্রন্ট কর্মপন্থার অনুকূলে পপুলার ফ্রন্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে। ভারতীয় কমিউনিস্টরাও তাঁদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়।

কারামুক্তির পরে মানবেন্দ্রনাথ ফৈজপুর কংগ্রেস (১৯৩৬)-এ যোগ দিয়েছিলেন। সেইসময় থেকে তাঁর সঙ্গে সোসালিস্ট ও কমিউনিস্টদের নানা বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রথমত, তিনি সোসালিস্ট নামধারী একটি উপদল অর্থাৎ কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির পরিবর্তে গণতান্ত্রিক কর্মসূচির ভিত্তিতে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার অভিমত ব্যক্ত করেন। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে শ্রেণীগত অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, নারী ইত্যাদির সংস্থাগত সদস্যপদ (collective affiliation) প্রবর্তনের প্রস্তাবকে মানতে পারেন নি। সেইকারণে কংগ্রেসের সমান পর্যায়ে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কিসান সভারও বিরোধী ছিলেন। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, সেই নিরিখে কংগ্রেস কৃষক স্বার্থেই পরিচালিত হওয়া উচিত বলে তিনি মনে করতেন। তৃতীয়ত, ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে (১৯৩৭) অবতীর্ণ হওয়া এবং কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠনের বিরুদ্ধে জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য বামপন্থীরা মুখর ছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ মন্ত্রিসভার মাধ্যমে ইংরেজ প্রশাসনকে পঙ্গু করে তোলার কৌশল প্রয়োগের সুপারিশ করেন।

উল্লিখিত ত্রিবিধ বিষয়ে দেখা যায় যে জওহরলাল কংগ্রেস সোসালিস্টদের তীব্র সমালোচক ছিলেন। সুভাষচন্দ্র উক্ত পার্টিতে যোগ দেন নি এবং কিছুকাল পরে কমিউনিস্টরা সোসালিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয়ত, কিসান সভার সঙ্গে কংগ্রেসের বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে সংস্থাগত সদস্যের

(collective affiliation) প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। আর তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে ঘটনাক্রমে বামপন্থীরা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সম্মতি জানায়। মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্যই প্রকারান্তরে গৃহীত হয়।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের নির্বাচনে মূলত রায়পন্থী, কমিউনিস্ট ও সোসালিষ্টদের সমর্থনে সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার সভাপতিপদে নির্বাচিত হন। কিন্তু ত্রিপুরীতে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে প্রবেশ করতে রায়পন্থীরা ছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দল ও গোষ্ঠী নারাজ ছিল। বামপন্থীদের দাবি ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে বিনাবিলম্বে সংগ্রাম এবং সেটা গান্ধীর নেতৃত্বে।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পরে সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে সুভাষচন্দ্র Left Consolidation Committee নামে যে বামপন্থী মোর্চা গঠন করেন তা অচিরেই নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়। প্রথমে রায়পন্থী, তারপরে সোসালিষ্টরা এবং সবশেষে কমিউনিস্টরা সেটি ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ইতিমধ্যে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হয়।

চল্লিশের দশকে পৌঁছনর আগে ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনের চারটি ধারা চোখে পড়ে—

১. কমিন্টার্নের অধীন কমিউনিস্ট পার্টি।
২. মানবেন্দ্রনাথের অনুগামী রায় গ্রুপ অফ কমিউনিস্টস নামে অভিহিত গোষ্ঠীর লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন নাম পরিগ্রহ এবং চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে সেটি ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের সমর্থনে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে রূপায়িত হয়।
৩. কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি—যা থেকে কিছু কর্মী বেরিয়ে এসে রেভলিউশনারি সোসালিষ্ট পার্টি গঠন করেন (১৯৪০)।
৪. সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক।

বিচিত্র মতাদর্শ ও কর্মপন্থা অনুসরণের ফলে ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলন কোনো ঐক্যবদ্ধ পথে সংযুক্ত হয় নি। কারণ কমিন্টার্ন তথা রাশিয়ার নির্দেশে কমিউনিস্টদের চলতে হত। কংগ্রেস সোসালিষ্টরা এবং সুভাষচন্দ্র ছিলেন গান্ধীর মুখাপেক্ষী। মানবেন্দ্রনাথের কর্মপন্থায় অন্যান্য বামপন্থীরা সায় দিতে পারেন নি। কারণ তিনি চাইতেন কংগ্রেসে বিকল্প বামপন্থী নেতৃত্ব (alternative leadership) এবং ফরাসি বিপ্লবের মডেলে কংগ্রেসকে একটি গণপরিষদে রূপায়িত করে পাল্টা সরকার গঠন ও সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনকে পঙ্গু করে তুলতে।

১৯৪০ সালে রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনকালে সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্বে ভিন্ন মণ্ডপে একটি পালটা আপসবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানে হিন্দু মুসলমানদের নিয়ে গঠিত একটি অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব ও তার উপর ক্ষমতা অর্পণের দাবি জানালেন এবং দেশব্যাপী সংগ্রামের নির্দেশ

দিলেন। তাঁর সংকল্প তখন সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি; অন্ধকূপ হত্যা স্মৃতিস্তম্ভ (হলওয়েল মনুমেন্ট) অপসারণের দাবির আন্দোলনসূত্রে তিনি কারারুদ্ধ হন (জুলাই ১৯৪০)। কারাগারে তিনি এবার বিশেষভাবে অনুভব করেন যে শুধু আইন অমান্য ও সন্ত্রাসবাদ যথেষ্ট নয়; চাই বাইরের সাহায্য। ঠিক করলেন জেল থেকে মুক্তি পেয়েই বাইরে চলে যাবেন।

১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি স্বগৃহে অন্তরীণাবস্থায় সরকারি দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি কাবুল হয়ে বার্লিনে চলে যান। সেখান থেকে বেতারযোগে তিনি দেশবাসীর কাছে প্রস্তুতির নির্দেশ দিতে থাকেন। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সুভাষচন্দ্র জার্মানি থেকে জাপানে চলে যান। জাপানিদের হাতে ধৃত ভারতীয় বন্দী সেনাদের নিয়ে গঠিত আজাদ হিন্দ সেনাদলের তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গেই আজাদ হিন্দ সরকার গঠিত হয়। জাপানিদের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্র আশানুরূপ সাহায্য পান নি। জাপানিরা তাঁকে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগাতে চেয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের সেনাবাহিনী ভারতের ভিতর কিছুটা অনুপ্রবেশ করেছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হওয়াতে তাঁকে পশ্চাদাপসরণ করতে হয়। এই সময়টাই তাঁর জীবনে সবচেয়ে চমকপ্রদ। সুভাষচন্দ্র জীবিত আছেন কিনা এ-প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তিনি এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন বলে সেইসময়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

দর্শনচিন্তা

ছাত্রজীবনের প্রথমাবস্থায় শংকরের দর্শনকেই সুভাষচন্দ্র হিন্দুদর্শনের সারবস্তু বলে মনে করতেন। কিন্তু পরে শংকরের মায়াবাদী দর্শনে তাঁর আস্থা হারিয়ে যায়। মায়াবাদের পরিবর্তে তিনি জাগতিক অস্তিত্বের প্রত্যয় গ্রহণ করেন। বিবর্তনবাদী প্রগতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল। এবিষয়ে তিনি তিনটি যুক্তি দেখিয়েছেন—

১ নৈসর্গিক ও ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ এই সিদ্ধান্তে নিয়ে যায় যে প্রগতি সর্বত্র বিদ্যমান; ২. স্বতঃলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করে যে কালক্রমে আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হই; ৩. জৈবিক ও নৈতিক উভয়বিধ দিক থেকেই প্রগতির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

আত্মার অভিব্যক্তি সম্পর্কে সাংখ্যের বিবর্তনবাদ আধুনিক মনকে স্পর্শ করবে না বলে তিনি মনে করতেন। তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে স্পেনসারের সরল থেকে জটিলতাভিমুখী বিবর্তনবাদ ও হার্টম্যানের "অন্ধ ইচ্ছা" প্রবণতার তিনি উল্লেখ করেছেন এবং শোপেনহাওয়ারের জাগতিক ইচ্ছা (cosmic

will) প্রত্যয়কে তাঁর কিছুটা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। বের্গসঁর সৃজনমূলক বিবর্তন (creative evolution)-তত্ত্বে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করলেও হেগেলের দ্বান্দ্বিক বিবর্তন তাঁর কাছে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ প্রতিভাত হয়েছে। কালাকাশের অভিব্যক্তির দিক থেকে স্পেনসার ও বের্গসঁ অপেক্ষা হেগেলের দ্বান্দ্বিক প্রগতি তাঁকে অধিকতর প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য কোনোটিকেই তিনি সর্বাংশে গ্রহণ করেন নি। তিনি লিখেছেন—

হেগেলের মতই যে সত্যের প্রায় একেবারে নিকটে পেঁাছিয়াছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। অন্য যে-কোনও মত অপেক্ষা উহা অধিকতর সন্তোষজনকভাবে আসল বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করিয়াছে। আবার অখণ্ড সত্য বলিয়াও উহাকে স্বীকার করা যায় না, কারণ যে-সকল বিষয় আমরা জ্ঞাত আছি ঐগুলির সঙ্গে উহা মিলে না।[৫]

হেগেলের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বে কিছুটা অনুপ্রাণিত হলেও সুভাষচন্দ্র হেগেলের বস্তুসত্তার যুক্তিবিচারকে গ্রহণ করেন নি। যদিও উভয়েই ব্রহ্মবাদী, কিন্তু হেগেল সত্তার সারবত্তারূপে "Reason"-কে প্রত্যক্ষ করেন; পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্র সারবত্তাকে প্রেমের লীলারূপে প্রত্যক্ষ করেন—দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সেই প্রেমময় লীলা নিরন্তর আত্মোদ্ঘাটিত করে চলে—সেই প্রক্রিয়ার অন্তরালে নিহিত আবেগ পরিণামে মানুষকে প্রেমময় ঐক্যে আবদ্ধ করে। তিনি লিখেছেন—

আমার নিকট প্রেমই সত্যের স্বরূপ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার হইতেছে প্রেম এবং মানবজীবনের মূলনীতি।[৬]

বস্তুসত্তাকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখার পিছনে সুভাষচন্দ্রের বাস্তবের প্রতি মানবতন্ত্রী মনোভাব পরিদৃষ্ট হয়। হেগেলের দৃষ্টিতে সত্তার সারবত্তা প্রেম নয় বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে কেমব্রিজের ম্যাকটাগার্ট প্রমুখ নব্য-হেগেলীয়দের চিন্তায় প্রেমের স্বীকৃতি সুভাষচন্দ্রকে প্রভাবিত করে থাকবে। মোজেস হেসের মতে, সমাজজীবনে প্রযুক্ত প্রেমের বিধিব্যবস্থাই হল সাম্যবাদ এবং সুষ্ঠু ক্রিয়াকলাপেই প্রেমের পরিণতি। আবার ফয়েরবাক মনে করতেন যে, মানুষ পারস্পরিক বিভেদ ভুলে যে শক্তির সাহায্যে সংঘবদ্ধ হয়, প্রেমই থাকে তার মূলে। প্রেমেই মানুষের যতকিছু নৈতিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়—ব্যক্তিস্বার্থ ও গোষ্ঠীস্বার্থ সুসমন্বিত হয়। হেগেলের ভাববাদী ইতিহাসদর্শনকে সুভাষচন্দ্র সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন নি। তাঁর সমন্বয়চিন্তায় জীবনের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক তাগিদ সমান স্থান পেয়েছে। চিত্তরঞ্জনের প্রভাবে সুভাষচন্দ্র বৈষ্ণব অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী হন। বৈষ্ণব দর্শনের সারমর্ম প্রেম ও প্রীতি—সেদিক থেকেও তিনি বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন।

ঈশ্বর, আত্মা, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে ছাত্রজীবনেই তাঁর মনে নানা দ্বন্দ্ব ছিল। প্রথমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং পরে শ্রীঅরবিন্দের রচনা পাঠ

করে তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটে। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বিশ্বচরাচর ঈশ্বরের লীলাস্থান এবং মনুষ্যজীবনের প্রকৃষ্ট আদর্শ হল আত্মমুক্তি ও মানবতার মঙ্গলবিধান। বিবেকানন্দের বাণীতেই সুভাষচন্দ্র নিজের জীবন-দর্শন গড়ে তোলার প্রয়াসী হন। বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীকে তিনি বীরোচিত জ্ঞান করতেন। সুভাষচন্দ্রের দার্শনিক চেতনা শ্রীঅরবিন্দের ভাবাদর্শেও কিছুটা পরিপুষ্ট হয়। শ্রীঅরবিন্দের "যোগের সমন্বয়" চিন্তা তাঁকে সবিশেষ আকৃষ্ট করে। তবে পরমার্থে অটল বিশ্বাস থাকলেও পার্থিব বিষয় ও বাস্তবজীবন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র সজাগ ছিলেন। তাই হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল যে আদর্শ গুরু হিসাবে মানব সমাজকে পরিচালনার জন্য শ্রীঅরবিন্দের সক্রিয় জীবনে ফিরে আসা দরকার।[৭]

সুভাষচন্দ্র মনে করতেন যে, "এই জগৎ আত্মার প্রকাশ এবং আত্মা ঠিক যেরূপ অবিনশ্বর এই সৃষ্টির জগৎও তদ্রূপ।" সৃষ্টির বিনাশ নেই। জগতের সৃষ্টি কোনো পাপ থেকে নয়; কিংবা তা অবিদ্যা বা অজ্ঞানের ফল নয়। কথাটা শংকরপন্থী চিন্তার বিপরীত। তাঁর মতে সৃষ্টি ঈশ্বরের শাশ্বত লীলার অভিব্যক্তি। তাঁর কথায়—

> সত্য হইতেছে আত্মা—যাহার সার প্রেম, উহা পরস্পরবিরোধী শক্তিসমূহ ও ঐগুলির সমাধানের নিত্য লীলার মধ্য দিয়া নিজকে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতেছে।[৮]

সুভাষচন্দ্রের আত্মা বা পরম সত্য কোনো বিমূর্ত কল্পনা নয়। তিনি চারিদিকে যেমন ঐশ লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন, তেমনি লীলার মধ্যেও অন্তর্নিহিত প্রেমময়তাকে উপলব্ধি করেছেন। এ-সিদ্ধান্তে যুক্তি অপেক্ষা ব্যবহারিক (pragmatic) তাগিদই প্রবল। তাতে সত্যের স্বরূপ সফল রূপায়ণ লাভ করে, অন্যদিকে প্রেমময় পরমই সত্যের স্বরূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়। আপাতবিরোধী এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। "জীবনের সকল দিকের যুক্তিসঙ্গত পর্যালোচনা করিয়া—এবং কিছুটা স্বতঃলব্ধ জ্ঞান ও বাস্তব ধারণা হইতেও এই সিদ্ধান্তে" তিনি উপনীত হয়েছিলেন। ব্যবহারিক জ্ঞানতত্ত্বে সত্যের মাপকাঠি হল কার্যকারিতা এবং সেই দৃষ্টিতেই সত্য বলে প্রমাণিত কোনো কাজ ফলপ্রসূ না হলে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। সুভাষচন্দ্র সেই ব্যবহারিক জ্ঞানতত্ত্বে নিজেকে জড়ান নি। তাঁর মতে মানবিক জ্ঞান আপেক্ষিক এবং চিন্তারও পরিবর্তন ঘটে; সেজন্যে পূর্বে যেটা সত্য বলে মনে হয়েছে সেটা কার্যত নিষ্ফল হলে মিথ্যায় পর্যবসিত হয় না। কারণ তিনি অসত্য থেকে সত্যের পরিবর্তে সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে অগ্রসর হবার অভিমত পোষণ করতেন।

সুভাষচন্দ্রকে কিছুটা অজ্ঞাবাদী বলে মনে করা যায়। "সত্য এত বৃহৎ যে আমাদের ক্ষুদ্র বোধশক্তির সাহায্যে উহাকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা

সম্ভব নয়" বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে যৌগিক প্রক্রিয়া অথবা স্বজ্ঞার দ্বারা ব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব হতে পারে ; ব্রহ্ম সম্পর্কে ধারণাও সেদিক থেকে আপেক্ষিক—অর্থাৎ জ্ঞাতা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সাহায্যে ব্রহ্মের ভিন্ন ধারণা করে থাকেন—বিভিন্ন ধারণার অমিল ও বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও সেগুলি সমান সত্য। এমনকি একই ব্যক্তির সময়ের ব্যবধানে ধারণার ব্যতিক্রম হতে পারে। সেজন্যে কোনো ধারণাকেই অসার মনে করার কারণ নেই। বিবেকানন্দের কথায় "অসত্য হইতে সত্যে নয়, বরং সত্য হইতে উচ্চতর সত্যের দিকে মানুষ আগাইয়া চলিয়াছে"—এই উদার দৃষ্টিভঙ্গিকে সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেন ; তাতে সব মতকেই সহ্য করার একটা ক্ষেত্র থাকে।[৯]

ই তি হা স চি ন্তা

প্রথম জীবনে বৈদান্তিক মনোভাবে আচ্ছন্ন সুভাষচন্দ্র পরিণত বয়সে সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বাস্তববাদী হয়ে পড়েন। তিনি হেগেলের অনুরাগী ছিলেন। হেগেলের ইতিহাসদর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কোথাও তেমন না করলেও স্থানবিশেষে তাঁর মতামত হেগেলীয় চিন্তাকেই সমর্থন জানায়। তিনি স্পষ্টই বলেছেন—

> One that appeals to me most and which in my view approximates to reality more than any other—is the Hegelian Dialectics. Progress is neither unilinear, nor is it always peaceful in character. Progress often takes place through conflict.[১০]

নয় (thesis), প্রতিনয় (antithesis) ও সমন্বয়ের (synthesis) পথ অনুসরণ করে প্রগতি অগ্রসর হয়। কি চিন্তারাজ্য কি বস্তুজগতে বিবর্তনের প্রকৃতি হল একের পর এক বিরোধ ও সেগুলির সমাধানের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়া। দ্বান্দ্বিক (dialectic) প্রক্রিয়ায় পরম সত্তা ক্রমান্বয়ে আত্মোৎঘাটিত করে চলে। সুভাষচন্দ্র সেই ধারায় সকলকে বিলীন হতে আহ্বান জানান। প্রতি যুগকে তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে সমন্বয় খুঁজে নিতে হবে। অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের কল্যাণকর বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে তিনি নতুন ভারত গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

নিজ প্রকৃতির তাগিদে তিনি বিশ্বাস করতেন যে "জড়জগতের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়" আছে।[১১] এবং একথাও মনে করতেন যে "বিশ্বজগতের এবং মনুষ্যজীবনের ঘটনা পরম্পরার অন্তরালে যে একটা অদৃশ্য নিয়ম নিহিত আছে" তা আকস্মিক, অদৃষ্টসম্ভূত বা দুর্দৈব নয়।[১২] অবরোহী ও নির্দেশ্যবাদী এই প্রত্যয়ের পিছনে পর-ব্রহ্মের ক্রিয়াশীলতা উপলব্ধি সাপেক্ষ।

তাঁর মতে মনুষ্যজীবনের মতো সভ্যতারও একটি নির্দিষ্ট জীবনকাল থাকে। আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেলেও বিশেষ কোনো সভ্যতার পুনর্জন্ম ঘটতে পারে, যদি তার অন্তর্নিহিত প্রাণরস বিদ্যমান থাকে। ভারতীয় সভ্যতায় সেই প্রাণ-রস থাকায় তা বারংবার পুনর্জন্ম লাভ করেছে; প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা চিরনবীন।[১৩]

পৃথিবীর আগামী দিনের ইতিহাসে ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তাঁর মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক চিন্তার উৎকর্ষে ইংল্যান্ড মানবসভ্যতায় একটি মূল্য-বান অবদান সৃষ্টি করেছিল। তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসিদেশ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার আদর্শে মানবসভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে মানবসভ্যতায় সর্বোত্তম অবদান হল জার্মানির মার্কসীয় দর্শন। বিংশ শতকে বিশ্বসংস্কৃতি ও সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ সংযোজন রাশিয়ার সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা সংস্কৃতি। এরপর মানব সংস্কৃতির উৎকর্ষ বিধানের দায়িত্ব নির্ভর করছে ভারতের উপর।[১৪]

রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলনে (১৯৪০) সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন—

> The age of Imperialism is drawing to a close and the era of freedom, democracy and socialism looms ahead of us. India, therefore, stands today at one of the crossroads of history. It is for us to share, if we so will, the heritage that awaits the world.[১৫]

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি আদর্শ ভারত কোনো দেশ থেকে ধার করে নি, সেগুলো প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অঙ্গ ছিল। 'মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় তিনি ভারতীয় ইতিহাসের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইংরেজ আসার ফলেই যে ভারতের ঐক্য সাধিত হয়েছে তা মনে করা ভুল।[১৬] ভারতে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ঐক্য ও সমন্বয় যথেষ্ঠই বিরাজ করত। ইদানীং দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ঐক্যের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে পরাধীনতার গ্লানিবোধে। মুসলমানেরা আসার পরও দেশের ঐক্য বিনষ্ট হয় নি। তারাও ভারতীয় ধারায় সমন্বিত হয়েছে। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বৈষম্যকে কৃত্রিম বলে তিনি মনে করতেন। সমন্বয় হয় নি কেবল ইংরেজের সঙ্গে—যাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আচারবিচার সম্পূর্ণ ভিন্ন। ভারতীয় ইতিহাসের আনুপূর্বিক ধারা বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন—

১. একটি যুগের উত্থানের পর আসে পতনের যুগ এবং আবার উত্থান ঘটে;
২. দৈহিক ও মানসিক অবসাদ ও জড়তাই হল অধঃপতনের কারণ;
৩. নতুন চিন্তা ও নতুন রক্তের সঞ্চারে প্রগতি ও নব ঐক্য গড়ে ওঠে;

৪. উন্নত মননশীল শক্তি ও উৎকৃষ্ট সমরকুশলী মানুষের নেতৃত্বেই নবযুগের বোধন সম্ভব;
৫. সারা ভারতের ইতিহাসে বিদেশ থেকে আগত সবাই এদেশের সমাজে মিশে গেছে; ইংরেজই তার প্রথম ও একমাত্র ব্যতিক্রম;
৬. কেন্দ্রীয় শাসনের যতই পরিবর্তন ঘটে থাকুক না কেন, এখানে মানুষ চিরকাল অবাধ স্বাধীনতার অধিকার পেয়েছে।[১৭]

ভারতের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক অধোগতির তিনি কয়েকটি কারণ দর্শিয়েছেন—

১. ভাগ্য ও অতিপ্রাকৃত শক্তির উপর অধিক নির্ভরতা;
২. আধুনিক বিজ্ঞাননির্ভর উন্নয়নে ঔদাসীন্য;
৩. সমরবিজ্ঞানে অরুচি ও পশ্চাৎপদতা;
৪. অহিংসা দর্শন প্রসূত নির্বিরোধ জীবনে আসক্তি।

তাঁর মতে বিদেশীরা এদেশে বাণিজ্যিক কাজে প্রথমটা যখন তৎপর ছিল তখন বিশেষ বৈরিতার ভাব দেখা যায় নি। কিন্তু ক্রমে ক্ষমতাসীন হয়ে শাসন-শৃঙ্খল দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির আদর্শ এদেশে চাপিয়ে দিতে গেলে সংঘাত শুরু হয়। বিদেশী প্রভাবের বিরুদ্ধে ভারতীয় আত্মার বিদ্রোহ রামমোহনের কণ্ঠে প্রথম ঘোষিত হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন।[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক জনকরূপে দেখেছেন। বিবেকানন্দের আদর্শ তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক অবহেলিত হয়েছে বলে সুভাষচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৯]

রাষ্ট্রদর্শন

মানুষকে সুভাষচন্দ্র সামাজিক জীব হিসেবে দেখেছেন। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের আত্মবিকাশ অসম্ভব। জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি, সার্থক পরিণতি ও পরিপুষ্টির জন্যে ব্যক্তি সমাজের উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে সমাজও ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। কিন্তু সমাজের উন্নতি ব্যতিরেকে ব্যক্তি উন্নতি অর্থহীন।[২০] সমাজজীবনের প্রেরণা ও আদর্শ হল স্বাধীনতা। স্বাধীনতার অর্থ সকল প্রকার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি। মানুষ নির্বিশেষে সবলেরই সহজাত একটি অধিকার আছে—সে অধিকার হল নিজেকে বিকশিত করে তোলার অবাধ সুযোগ। সেই সুযোগ দেওয়াটাকেই তিনি স্বাধীনতা বলে মনে করতেন।[২১]

চিন্তায় ও কাজে মৌলিকতা এবং সৃজনীশক্তিই জীবনের লক্ষণ। সেজন্যে

চাই অন্তরের জাগরণ। জনজীবনে ক্লান্তি ও জড়তা এলে চাই তার আমূল পরিবর্তন। পরিবর্তনের এই প্রয়োজন সংস্কার পদ্ধতিতে সাধিত হয় না ; চাই বিপ্লব। বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে মজ্জাগত কোনো প্রভেদ তিনি অনুভব করেন নি। অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে যে-বিবর্তন ঘটে তাকে তিনি বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে যে-বিপ্লব সম্পন্ন হয় সেটা তাঁর মতে বিবর্তন। উভয়ের গোড়ার কথা বিবর্তন। বিপ্লব ও বিবর্তন উভয়েরই সামাজিক প্রয়োজন আছে।[২২] বিপ্লব সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলেছেন যে, বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘর্ষের ফলে ভাবজগতে বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইংরেজ এদেশে আসার ফলে ভারতীয়দের চিন্তাজগতে ঐরূপ একটা বিপ্লব ঘটেছিল।[২৩] সেই নবজাগরণের ফলে ভারতীয়দের মনে অতীত ঐতিহ্যবোধ ও জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত হয়। সেই বোধ ও চেতনা থেকেই তাঁর বৈপ্লবিক আদর্শ উদ্ভূত হয়েছিল। নিজের স্বপ্ন ও আদর্শ কী সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

আমি চাই একটা নূতন সর্বাঙ্গীণ মুক্তি সম্পন্ন সমাজ এবং তার উপরে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র ; যে-সমাজে ব্যক্তি সর্বভাবে মুক্ত হইবে এবং সমাজের চাপে আর নিষ্পিষ্ট হইবে না…সর্বোপরি যে সমাজ ও রাষ্ট্র ভারতবাসীর অভাব মোচন করিয়া বা ভারতবাসীর আদর্শ সার্থক করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, পরন্তু বিশ্বমানবের নিকট আদর্শ সমাজ ও আদর্শ রাষ্ট্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে।[২৪]

সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন। জাতীয়তাবাদকে সংকীর্ণ, স্বার্থান্বিত ও আক্রমণাত্মক নীতি হিসাবে বৈশ্বিক মানবতার অন্তরায় বলে সমালোচনা করা হয়ে থাকে। সেজন্যে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন এই বলে—

My reply to the charge is that Indian nationalism is neither narrow, nor selfish, nor aggressive. It is inspired by the highest ideals of the human race, viz., Santyan (the true), Shivam (the good), Sundaram (the beautiful). Nationalism in India has instilled into us truthfulness, honesty, manliness and the spirit of service and sacrifice. What is more, it has roused the creative faculties which for centuries had been lying dormant in our people and, as a result, we are experiencing a renaissance in the domain of Indian art.[২৫]

সুভাষচন্দ্র প্রচলিত অর্থে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভারতের মত অনুন্নত দেশের কোনো উপকার হবে না বলেই তিনি মনে করতেন। তাঁর কথায় : "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজবাদী ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কারসাধন সম্ভব নয়। এ-কারণে আমাদের পূর্ণ কর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি করতে হবে। পশ্চিমী ধাঁচের

পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে তাঁর আদৌ আস্থা ছিল না। সোভিয়েত বা চীনের কেন্দ্রাভিগ এবং দলীয় একনায়কতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর মনোভাবের মিল দেখা যায়। সুভাষচন্দ্র টোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে এক ছাত্রসভায় (নভেম্বর, ১৯৪৪) বলেন—

with a democratic system we cannot solve the problems of free India Therefore, modern progressive thought in India is in favour of a State of an authoritarian character.[২৬]

সুভাষচন্দ্রের জীবনদর্শনে একটি পরিবর্তন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আধ্যাত্মিক ভাববাদী থেকে তিনি ক্রমে বাস্তববাদীতে পরিণত হন। সেজন্যেই হয়তো রাজনীতির সঙ্গে নীতিশাস্ত্রের সংমিশ্রণ তিনি পছন্দ করতেন না। গান্ধীর রাজনৈতিক মত ও পথের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে, গান্ধীবাদে রাজনীতিকে সঠিক স্থানে বিচার করা হয় না। তাঁর মতে: "We have to render unto Caesar what is Caesar's"।[২৭] প্লেটো, সিসেরো, গ্রীন প্রমুখ অনেকেই রাজনীতিকে তত্ত্বগতভাবে নীতিশাস্ত্রের দ্বারা পরিমার্জনের প্রয়াসী হয়েছিলেন। এদেশেও গান্ধী, গোখলে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ব্যবহারিক দিক থেকে আরো কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। সুভাষচন্দ্র কিন্তু তা চাইতেন না। রাজনৈতিক বাস্তববাদী সুভাষচন্দ্রের মতে সিজার ও খ্রীষ্টের স্থান স্বতন্ত্র হওয়া উচিত। রাজনৈতিক রীতিনীতিকে তিনি সুবিধা আদায়ের একটি পদ্ধতি বলে ধরে নিয়েছিলেন। তাই ১৯৩১ সালে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধীর সরল ঘোরপ্যাঁচহীন কথাবার্তার তিনি তারিফ করতে পারেন নি। কোপ বুঝে কোপ মারাই ছিল সুভাষচন্দ্রের মত। তিনি চেয়েছিনেন রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে গান্ধীর কণ্ঠে একটু কঠোরতা বেজে উঠুক।

সুভাষচন্দ্র বুঝতেন যে দেশ গড়তে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। চাই ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা—সুবিধামত সহজ পথে দেশের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। সেজন্যে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বা এডমন্ড বার্কের সহজপন্থী নীতিতে সায় দিতে পারেন নি। হ্যাম্পডেন ও ক্রমওয়েলের আপসহীন নীতিই ছিল তাঁর এ বিষয়ে আদর্শ।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তিনি ঐ-পদ্ধতি সমকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক ধারায় প্রয়োগ করে একটি অভিনব বিচারবিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে যে-কোনো প্রগতিশীল আন্দোলনের মধ্যে একটি স্ববিরোধী (antithesis) শক্তি থাকে যাকে তিনি বামপন্থী আখ্যা দেন। অন্তর্নিহিত এই বিরোধী শক্তি কালক্রমে বল ও বিস্তার লাভ করে। বিশেষ অবস্থায় এই শক্তির বিকাশ ও পরিপুষ্টির জন্যে যথোচিত রাজনৈতিক ও দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। অনেক সময়ে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে রফা ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে বামপন্থী ধারা শক্তিসঞ্চয়

ও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তখন নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় ও অনুগতদের সুসংবন্ধ রাখা উচিত। ক্রমে বাম ও দক্ষিণের সংঘাত উপস্থিত হয়। সে-সংঘাত যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন মূলত সেটা প্রগতির পরিপূরক। পরে উভয়-পক্ষের সমন্বয় ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে ওঠে। অভীষ্ট ফললাভের পর ক্রমে সেই-বামপন্থী শক্তিরও সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ঘটে ইতিহাসে পুনরাবর্তন অর্থাৎ নতুন বামপন্থী শক্তির উদ্ভব। পুরনো বামপন্থী শক্তি হীনবল হয়ে ক্ষমতাচ্যুত হয়। ১৯২০ সালের পর গান্ধীবাদীরা কংগ্রেসের ছিলেন বামপন্থী। ক্ষমতার শীর্ষে উঠে তাঁদের শক্তি ও সম্ভাবনা পূর্বোক্ত ঐতিহাসিক কারণেই ক্ষয় পেতে শুরু করে। ঐতিহাসিক প্রয়োজনও তাদের ফুরিয়ে যায়। দেশে আবার নতুন বামপন্থী শক্তি দেখা দেয়। ১৯৩৬ সালের আগে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে নতুন বামপন্থী শক্তি ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৩৮ সালে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে একত্র চলতে অক্ষম হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সুভাষচন্দ্র বামপন্থীদের নিজ স্বাতন্ত্র্যে সচেতন হয়ে শক্তিবৃদ্ধি ও ঐক্যের জন্যে তৎপর হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বামপন্থী ঐক্যকে তিনি একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন বলেই অভিহিত করেন।[২৮] বামপন্থীদের সেই ভূমিকা তাঁর মতে আদৌ নেতিবাচক নয়। তিনি বলেন—

> The role of the antithesis in the History is not a negative one. It is something positive and dynamic which has to carry us swiftly along the path of progress.[২৯]

সুভাষচন্দ্র তাঁর বামপন্থী মতবাদকে একাধারে সমাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধীরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে তাঁকে মার্কসবাদী মনে করা ভুল। সুস্পষ্টভাষায় তিনি মার্কসবাদী কমিউনিজমকে পরিহার করেন—

১ কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে ভারতীয় সংগ্রাম মূলত একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম।

২. কমিউনিস্টরা বিশ্ববিপ্লবের চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। রাশিয়া তার ঘর গোছাতেই ব্যস্ত। পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে রাশিয়া মিতালি করছে।

৩. কমিউনিস্টরা ধর্মে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক। রাশিয়ায় প্রাক্‌বিপ্লবকালে জারের স্বেচ্ছাচারকে চার্চ সমর্থন করত বলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে চার্চ ও ধর্মের বিরোধিতা। ভারতে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক না থাকায় মানুষের সঙ্গে ধর্মের কোনো সংঘাত নেই।

৪ কমিউনিস্টরা ইতিহাসের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে অতি বেশি বিশ্বাসী। কমিউনিস্টদের অর্থনৈতিক তত্ত্বের কিছুটা গুণগ্রাহী হলেও ভারত ইতিহাসকে কেবলমাত্র অর্থনীতির দিক থেকে দেখে না।

৫. কমিউনিস্ট অর্থনীতির কিছু গুণ থাকলেও আসলে তা গতানুগতিক।

মুদ্রাতত্ত্ব সম্পর্কে তার বিশেষ কোনো অবদান নেই।

৬ কমিউনিস্টরা শ্রেণীসংঘর্ষ ও শ্রমিকদের উপর সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়। ভারত শ্রেণীসংঘর্ষ চায় না এবং কৃষিপ্রধান দেশ বলে এখানকার চাষীদের স্বার্থ শ্রমিকদের সমতুল্য।[৩০]

তবে কমিউনিজমের সঙ্গে তাঁর তত্ত্বগত প্রভেদ থাকলেও মার্কসবাদকে তিনি মানবসভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান বলে গ্রহণ করেছেন। লেনিনও ছিলেন সুভাষচন্দ্রের কাছে একজন আদর্শ পুরুষ। সোভিয়েত দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

আ র্থ নী তি ক চি ন্তা

সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় অর্থনীতির গুরুত্ব দেখা যায়। এবিষয়ে মৌলিক কোনো অবদান তাঁর না থাকলেও মনে তাঁর তত্ত্বগত কৌতূহল ও উৎসাহ বেশ সজাগ ছিল। মার্কসীয় ইতিহাসের ব্যাখ্যায় অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদকে সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেন নি এবং মুদ্রাতত্ত্বে মার্কসীয় অর্থনীতির দুর্বলতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন মাত্র; তাত্ত্বিক আলোচনার গভীরে প্রবেশ করেন নি। তাঁর অর্থনীতি সম্পর্কিত চিন্তাভাবনা দেশের সমস্যা ও প্রয়োজনের দিক থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। তাঁর কথায়—

> ভারতবর্ষে রাজনীতি ও অর্থনীতি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে রয়েছে—এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য শুধু রাজনৈতিক প্রভুত্ব নয়, অর্থনৈতিক শোষণও। তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে মূলত অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা দরকার।[৩১]

প্রসঙ্গত সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী রাজনীতির দুটি ধারা লক্ষণীয়। বিশের দশকে তিনি ডোমিনিয়ন স্টেটাস ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতাই শুধু করেছেন। ত্রিশের দশকে তাঁর চিন্তা অর্থনীতির ব্যঞ্জনা লাভ করে। সেই সময়ে সমাজতন্ত্রের প্রশ্নকে আশু বিষয় বলে মনে না করলেও সমাজতান্ত্রিক প্রচারের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভব করেন—যাতে দেশবাসীর মন স্বাধীনতার পর দেশগঠনের কর্তব্য সম্পর্কে প্রস্তুত থাকে। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে স্বাধীনতার পর কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন "have" যারা তারা "have not"-দের অনুকূলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্যোগী হবে না এবং হয়তো ইংরেজের সঙ্গে মিতালি করবে। তাই স্পষ্টই বলেন—

> The logic of history will, therefore, follow its inevitable course. The political struggle and the social struggle will have to be conducted simultaneously. The party that will win

political freedom of India will be also the party that will win social and economic freedom ।[৩২]

দেশ যতদিন পরাধীন থাকবে ততদিন অন্নবস্ত্র, শিক্ষাস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্যার সুরাহা হবে না বলে তিনি মনে করতেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতার পূর্বে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প-সম্প্রসারণের চিন্তাকে তিনি ঘোড়ার আগে গাড়ি যোতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। অথচ ১৯৩৮ সালে যখন তিনি কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তখন তাঁরই নেতৃত্বে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হয়েছিল দেশের সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠনের পরিকল্পনা রচনার জন্যে।

দারিদ্র্য ও বেকারসমস্যাকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে এর কারণ হল, প্রথমত ইংরেজের স্বার্থে স্বদেশী শিল্পে বিনাশ ও দ্বিতীয়ত কৃষিকার্যে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রচলন। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, ইংরেজ আসার আগে ভারত শিল্পবাণিজ্যে উন্নত ছিল। ইংরেজের স্বার্থে এদেশের শিল্পবাণিজ্য বিনষ্ট হয়েছে ; কাঁচা মাল রপ্তানিতেই ভারতের বহির্বাণিজ্য সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একই কারণে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাসও ব্যাহত হয়েছে ; তাই জনসাধারণ দুঃসহ দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। শতকরা সত্তর ভাগ ভারতীয় কৃষক ছ-মাস বেকার থাকে, প্রতিকারস্বরূপ তিনি রাষ্ট্রায়ত্ত দ্রুত শিল্পোন্নয়নের কথা ভেবেছিলেন।

শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধি, ন্যায্য সুযোগসুবিধাদি, কর থেকে রেহাই ও তাদের উপযুক্ত কল্যাণ প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন। অর্থনৈতিক যোজনাই দ্রুত দেশোন্নয়নের একমাত্র পথ এবং সেজন্যে তিনি সোভিয়েত প্ল্যানিং ব্যবস্থার তারিফ করেন। প্ল্যানিং-এর সঠিক রূপায়ণের জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ইংরেজশাসন স্বর্ণ ও রৌপ্য সঞ্চয়কে নিঃশেষ করে দিয়েছে—তাই দরকার স্বর্ণমান ত্যাগ করে জাতীয় শ্রম, উৎপাদন ও ধনের ভিত্তিতে মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন। তাঁর মতে বহির্বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত করা উচিত। ১৯৩৩ সালে জার্মানির আদর্শ অনুসরণ করে পণ্যের বিনিময়ে বাণিজ্য ব্যবস্থার নবরূপায়ণ পন্থার সমর্থন করেন।[৩৩]

উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার পূর্ণ বিলোপের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ভূমি ব্যবস্থার আশু পরিবর্তনকল্পে তিনি জমিদারি প্রথার অবসান দাবি করেন। চাষীদের ঋণের বোঝা মকুব করে দিয়ে স্বল্প সুদে কৃষিঋণ ব্যবস্থার উপরও তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। একসময়ে সমবায় আন্দোলনের সাহায্যে কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণের বিষয়েও তাঁর উৎসাহ ছিল।

শি ক্ষা চি ন্তা

নিজের ছাত্রজীবন থেকেই সুভাষচন্দ্র শিক্ষা সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং উত্তরকালে শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ ও অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি অনুভব করেন যে আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটি মস্ত দৈন্য হল ভাবের দৈন্য। এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় আদর্শের বীজ বপনের চেষ্টা অনুপস্থিত। সেজন্যে তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের দায়ী করেন। তাই তিনি সখেদে বলেছেন—

> অধ্যাপক সম্প্রদায় যদি নিজেদের কর্তব্য না করেন—তাঁহারা যদি নিজ নিজ জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে মানুষ সৃষ্টি করিতে অক্ষম হন—তাহা হইলে ছাত্রদিগকে নিজের চেষ্টায় ও সাধনার দ্বারা মানুষ হইতে হইবে।[৩৪]

সাংস্কৃতিক উজ্জীবন ও বৈশ্বিক মনোভাব সৃষ্টিকেই তিনি শিক্ষার লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথায়—

> In order to facilitate cultural rapprochement a dose of secular and scientific training is necessary. Fanaticism is the greatest thorn in the path of cultural intimacy, and there is no better remedy for fanaticism than secular and scientific education.[৩৪]

নিরক্ষরতাকে সুভাষচন্দ্র জাতীয় অগ্রগতির সর্বপ্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। তাঁর মতে দেশের শিক্ষিত বেকার শ্রেণী সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই সমস্যার সুরাহা করতে পারে। দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন তিনি চেয়েছিলেন। রোমান অক্ষরে এদেশের মুদ্রণকে উৎসাহ দান ও জনপ্রিয় করে তোলারও তিনি সমর্থক ছিলেন। আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের পর এই বিষয়টির রূপায়ণে তিনি উদ্যোগী হন।

প্রাথমিক শিক্ষাকালে পাঠ্য বইয়ের চেয়ে বস্তুচেতনাই তাঁর মতে বেশি প্রয়োজন—সেজন্যে চাই হাতেকলমে শিক্ষার প্রচলন। শিক্ষকদের প্রধান গুণ হল দরদ ও ব্যক্তিত্ব। শিক্ষাব্যবস্থার তিনটি উপাদান: ১ শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব; ২. শিক্ষার উপযুক্ত প্রণালী এবং ৩. শিক্ষার বিষয় ও পাঠ্য-পুস্তক।[৩৬]

ছাত্রজীবনে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, অভারতীয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পাঠালে তাদের স্বাভাবিক মনের বিকাশ ব্যাহত হয়। ইংরেজ শিক্ষকদের দিয়ে এদেশে বিদ্যালয় পরিচালনার প্রচেষ্টা সেই কারণে ক্ষতিকর। দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি লিখেছেন—

> প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মিলনের যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক উপায় শৈশবাবস্থায় ভারতীয় ছেলেদের উপর জোর করিয়া ইংরাজী শিক্ষা চাপাইয়া দেওয়া নয়,

বরং তাহারা বয়োপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে পশ্চিমের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনিতে হইবে; তাহা হইলে তাহারা নিজেরাই বিচার করিতে পারিবে যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে কোন্‌টা ভাল এবং কোন্‌টা মন্দ।[৩৭]

তরুণ ও যুবকদের দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতিকল্পে সুভাষচন্দ্র তাদের জন্যে নানাধরনের প্রতিষ্ঠান গঠনে বিশেষ উৎসাহী ও যত্নবান হয়েছিলেন।

গান্ধী ও সুভাষচন্দ্র

গান্ধী সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের মনোভাবে পারম্পর্যের অভাব দেখা যায়। কখনো তিনি গান্ধীকে 'জাতির জনক' হিসেবে তাঁর আশীর্বাণী চেয়েছেন—কখনো বা গান্ধীর দ্বারা ভারতের 'salvation' হবে না বলে তাঁকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। বস্তুত গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের অমিলের চেয়ে মিলই ছিল বেশি। পার্থক্য কেবল ভিন্ন পথে তাঁরা একই লক্ষ্যে পৌছতে চেয়েছিলেন। উভয়েরই প্রেরণার উৎস ছিল গীতার বাণী। ভারতের সনাতন ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবত্তায় উভয়েই বিশ্বাসী ছিলেন। উভয়েই মনে করতেন যে, প্রেমই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের মর্মকথা। এই আধ্যাত্মিক মানবতাবোধেই দুজনের মিল লক্ষণীয়। ভারতীয় ঐতিহ্য ও ভাবধারার সমন্বয়ে দুজনেই সামাজিক পুনর্গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের সমন্বয়ী আদর্শ কেবল রূপায়ণের ভিন্ন পথ খুঁজেছে।[৩৮]

সত্যের প্রতি গান্ধীর অবিচল নিষ্ঠা, ক্লান্তিবিহীন প্রয়াস ও মানবিক হৃদয়বত্তার উদ্দেশে সুভাষচন্দ্র প্রণতি জানান। কংগ্রেসকে ঐক্যবদ্ধ রাখা ও দেশের জনজাগরণে গান্ধীর অবদানকে সুভাষচন্দ্র অস্বীকার করেন নি। ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্‌কালেও তিনি গান্ধীকে ভারতের সর্বোত্তম নেতা বলে অভিহিত করেন।[৩৯] এমনকি ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপনের সময়েও গান্ধী প্রবর্তিত কর্মপন্থা অনুসরণের সিদ্ধান্ত তিনি ঘোষণা করেছিলেন।[৪০]

এতৎসত্ত্বেও তিনি গান্ধীবাদীতে পরিণত হন নি। এর কারণ যত না দার্শনিক তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যবহারিক রাজনীতিক। গান্ধী প্রদর্শিত কর্মপন্থা তাঁর মনঃপূত না হওয়ার কারণস্বরূপ বলেছেন—

১. চালকের চেয়ে চালিতের চরিত্রই শক্তির মান নির্ধারণ করে। বহু নেতাই গান্ধীর চেয়ে অনেক কম সংখ্যক অনুগামী নিয়ে সফল হয়েছেন।
২. গান্ধী দেশের লোকের মন বুঝতেই ব্যস্ত। বিদেশীদের মন বোঝার চেষ্টা করেন নি। তাদের কাছে তাঁর যুক্তিভাবনা অবোধ্য।
৩. সব তাস ফেলে খেলার মতো নীতি এক্ষেত্রে অচল। ইংরেজের সঙ্গে রাজনীতির কূটনৈতিক চাল চালা দরকার।

৪. গান্ধী আন্তর্জাতিক অস্ত্র-প্রয়োগে অক্ষম হয়েছেন। অহিংসার পথে স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক প্রচারকর্ম অপরিহার্য।

৫ পরস্পরবিরোধী স্বার্থের নিষ্ফল ঐক্যসাধন প্রচেষ্টা গান্ধীর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। রাজনীতির লড়াইয়ে সেটা শক্তির পরিবর্তে দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মুক্তিযুদ্ধে চাই বিপ্লবী ও জঙ্গিমনোভাবাপন্ন কর্মিদল, যারা যে-কোনো কষ্টস্বীকার করতে প্রস্তুত।

৬ গান্ধীর মধ্যে দ্বিমুখী ভূমিকা তাঁর ব্যর্থতার শেষ কারণ। একদিকে তিনি পরাধীন জনগণের অধিনায়ক; অপরদিকে তিনি এক নতুন আদর্শ নিয়ে সকলের ধর্মগুরু হয়েছেন; ফলে কারো সঙ্গে বোঝাপড়া করতে তিনি অপারগ।[৪১]

বাস্তববাদী হওয়ার দরুন সুভাষচন্দ্র গান্ধীর নীতিনিষ্ঠ আদর্শবাদকে মেনে নিতে পারেন নি। মনে করতেন রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে অহেতুক নৈতিক মাপকাঠিতে ধোঁয়াটে করে তোলা হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র আশু কার্যকারিতার দৃষ্টিতে রাজনীতিকে নিছক পাওনাগণ্ডা আদায়ের একটা পন্থা হিসেবে দেখতেন। তাঁর মতে গান্ধীবাদ শুধু একটি পথই বাতলেছে, সেটি হল সত্যাগ্রহ —তার মধ্যে না আছে কোনো সুস্পষ্ট সমাজদর্শন, না-কোনো পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম। সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মপন্থা।

গান্ধীর জ্ঞানতত্ত্ব অর্ধযুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। ঈশ্বরের সদিচ্ছায় বিশ্বাসী গান্ধী ভাবতেন "one step is enough for me"। গান্ধীর দৃষ্টিতে শুভ লক্ষ্যে পেঁছিতে হলে মাধ্যমটাও সৎ (means justifies the end) হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাস্তববাদী সুভাষচন্দ্র দেশের আশু লক্ষ্যবস্তু অনুযায়ী এক যুক্তিনির্ভর চিত্র কল্পনা করেন এবং তাকে আয়ত্ত করার তাগিদে যে কোনো মাধ্যম (end justifies the means) অবলম্বন করতে প্রস্তুত ছিলেন।

গান্ধীর "intuition" ও "inner voice" সুভাষচন্দ্রের কাছে বোধগম্য হত না। রাজনৈতিক শক্তিসঞ্চয় ও কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগই ছিল তাঁর কর্মসূচির অঙ্গ। গান্ধীবিরোধী স্বরাজ্যদলের প্রতিষ্ঠাকে সুভাষচন্দ্র যুক্তিসম্মত প্রতিক্রিয়ারূপে দেখেছিলেন। দেশবন্ধু, লালা লাজপৎ ও মোতিলাল নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতের রাজনৈতিক কার্যধারা যুক্তিবিহীন গান্ধীবাদী নেতৃত্বে প্রভাবিত হয়েছে। যুক্তিবাদী কিছু মানুষ গান্ধী বিরোধী হলে কি হবে, অসীম শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগে বিগলিত জনসাধারণ গান্ধীর সম্মোহনে আচ্ছন্ন।[৪২]

সুভাষচন্দ্র গান্ধীর সমালোচনা করে বলেছেন যে, জেনেই হোক বা না জেনেই হোক গান্ধী ভারতীয়দের এক মস্ত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে থাকেন। এদেশে সাধুসন্ন্যাসীদের উপর লোকের অগাধ ভক্তি। সন্ন্যাসীদের মত বেশভূষা

ধারণ করায় গান্ধী অপরিসীম সমর্থন ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছেন। মানুষের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির পরিবর্তে তাদের ভাবাবেগ ও দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করা যুক্তিহীন রাজনৈতিক পন্থা ছাড়া আর কিছু নয়।[৪৩]

অবিসংবাদী নেতা হিসাবে গান্ধী নানা মত ও সম্প্রদায়ের ঐক্য ও সম্প্রীতি সাধনে তৎপর থাকতেন এবং তাদের সংঘর্ষকে প্রশমিত করতেন। তিনি একাধারে জমিদারের প্রতিনিধি, আবার কৃষকেরও প্রতিভূ ছিলেন—পুঁজিপতিরাও তাঁকে নেতা বলে মনে করত, আবার শ্রমিকেরাও তাঁকে নেতারূপে বরণ করে। সুভাষচন্দ্র শ্রেণীসংঘর্ষ না চাইলেও বিত্তহীন বনাম বিত্তবানদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ধনী ও বিত্তবানেরা ইংরেজের সঙ্গে যে আঁতাত করতে পারে, তাঁর সে-আশংকার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই গান্ধীর নেতৃত্ব পরস্পরবিরোধী দল ও মতের সমন্বয়-প্রচেষ্টাকে তিনি এক মস্ত গোঁজামিল বলে মনে করতেন। এবং সে-কারণেই দেশের পরিবর্তনকামী সংগ্রামী মানুষদের নিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্র দল গঠনের প্রয়োজন বহু পূর্বেই অনুভব করেছিলেন। গান্ধীর প্রভাবমুক্ত এই দলই দেশের মুক্তি সাধন করবে বলে বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে "India's salvation will not be achieved under his (গান্ধীর) leadership"।[৪৪]

কেবল অহিংস পন্থা আঁকড়ে থাকলে স্বরাজ আসবে না বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। অহিংস সত্যাগ্রহ জনচেতনাকে জাগ্রত করতে পারে; কিন্তু একমাত্র তার সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জন করা অসম্ভব। অহিংস কার্যক্রমকে সম্প্রসারণের জন্য হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র দুটি অতিরিক্ত পন্থা সংযোজন করতে চেয়েছিলেন: ১ কূটনীতি; ২. আন্তর্জাতিক প্রচার অভিযান। এবিষয়ে বহু পূর্বে গুরু দেশবন্ধু ও মোতিলাল নেহরু তাঁকে প্রভাবিত করেছিলেন। গান্ধী দেশেই সুসংগঠিত কার্যধারা বজায় রাখা এবং উৎকৃষ্ট কাজের দৃষ্টান্ত স্থাপনে বেশি উৎসাহী ছিলেন।

অহিংসা গান্ধীনীতির মূলকথা। পক্ষান্তরে সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় অহিংসা সময়বিশেষের একটি পন্থামাত্র। গান্ধীর দৃষ্টিতে সত্য ও অহিংসা ব্যতীত প্রেমের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়—অহিংসাকে জীবনের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করলে সত্য ও প্রেমের প্রতিষ্ঠা হবে সর্বত্র। অন্যদিকে ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে, ঘাতপ্রতিঘাতের আশ্রয়ে ইতিহাস এগিয়ে চলে এবং চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই প্রেম অবিরাম আত্মপ্রকাশ করে—সেখানে হিংসা ও অহিংসার মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। চিরন্তনের মাপকাঠিতে হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন আপেক্ষিক। প্রগতির বিধান তথা বিশ্বজীবনের ধর্ম ও বিবর্তনের ধারায় হিংসা ও অহিংসার প্রশ্ন মীমাংসিত হয়। এবিষয়ে হেগেলীয় চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

গান্ধীর বিকেন্দ্রিত অর্থনীতি, আধুনিক শিল্পোন্নয়নের পরিবর্তে খাদি ও কুটির শিল্প, অছিবাদ ইত্যাদি সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করেন নি। সুভাষচন্দ্র কুটিরশিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে শিল্পের আধুনিকীকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। গান্ধী সমুদয় বিষয়কেই তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। সুভাষচন্দ্র দেখেছেন আশু সমস্যা ও বাস্তব কার্যকারিতার দিক থেকে।

সুভাষচন্দ্র ও ফ্যাসিবাদ

সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় ফ্যাসিবাদী প্রভাব সুপরিস্ফুট। তবুও তাঁকে পুরোপুরি ফ্যাসিস্ট বলা যায় কিনা সে-বিষয়ে বিস্তর বাদানুবাদ আছে। বিদেশী শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা। সেজন্যে সম্ভাব্য যে কোনো পথেই যেতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্বের দরবারে দেশের এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে জানাবার জন্যে সদাই তিনি চিন্তা করতেন। বহির্ভারতে এবিষয়ে সহানুভূতিশীল বন্ধু তিনি খুঁজেছিলেন এবং শেষাবধি একথা তিনি উপলব্ধি করেন যে, বাইরের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া দেশের মুক্তি সাধিত হবে না। সকল পথই যখন দেখেছিলেন রুদ্ধ তখন তিনি ফ্যাসিস্টদের কাছে সাহায্যপ্রার্থী হন। তবে একথাও প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগ দেবার আগে তিনি সোভিয়েত সাহায্যের প্রত্যাশা করেন, এমনকি যুদ্ধে পরাজয়ের পরও তিনি সোভিয়েত দেশে চলে যাবার কথা চিন্তা করেছিলেন। কাজেই তাঁর কাছে কোনো 'ইজম' অপেক্ষা দেশের মুক্তিই ছিল প্রধান ও একমাত্র প্রশ্ন।

বস্তুত সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও তার আক্রমণাত্মক রূপের পরিচয় ঘটে বহু পরে। একথার আভাস পাওয়া যায় পরবর্তীকালের নানা উক্তি এবং বিশেষ করে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট নেতা রজনী পাম দত্তের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে।[৪৫] তার আগে সুভাষচন্দ্রের মানসিক গঠন ও প্রবণতা দেখা দরকার। ছোটবেলা থেকেই তিনি নিয়মানুবর্তিতা ও ফৌজি রীতিনীতির অনুরাগী ছিলেন। হেগেলের দর্শন থেকে উত্তরকালে সমষ্টিবাদী চিন্তা আহরণ করেন। সীমিত সময়ে কার্যসিদ্ধি ও দেশের পুনর্গঠনের জন্য তিনি লৌহকঠোর ব্যবস্থা ও একনায়কতন্ত্রের উপযোগিতা প্রত্যক্ষ করেন। সে ব্যাপারে মুসোলিনীকে তাঁর আদর্শ মনে হয়েছিল। গান্ধী ইতালিতে মুসোলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করায় সুভাষচন্দ্র খেদ প্রকাশ করেন। ফ্যাসিস্টদের দ্রুত দেশোন্নয়নের প্রয়াস তাঁকে একদিকে যেমন মুগ্ধ করেছিল, তেমনি ইংরেজের সঙ্গে তাদের বৈরিতাও তাঁকে ফ্যাসিস্টদের অনুরাগী করে তোলে। জওহরলাল লিখেছেন—

He did not approve of any step being taken by the Congress which was anti-Japanese or anti-German or anti-Italian···We passed many resolutions and organized many demonstrations of which he did not approve during the period of his Presidentship····.[৪৬]

সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিবাদী প্রবণতার সমর্থনে নীচের উদ্ধৃতিগুলি লক্ষণীয়—

এক. Superman-এর যে-রূপ জার্মান দার্শনিক Nietzsche (নীটশ) দিয়াছেন অথবা ভারতের কোনও মনীষী দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা আপনারা অখণ্ড সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিতে পারেন—কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্যে যে সাধু ও মনুষ্য জাতির পক্ষে কল্যাণকর এবং তাঁদের প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ('নূতনের সন্ধান'। পৃ ৯০-৯১)

দুই. আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম Collective সাধনা বা সমষ্টিগত সাধনা; আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে জাতিকে বাদ দিয়া যে সাধনা—সে সাধনার কোনও সার্থকতা নাই।···আদর্শের চরণে নিজেকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—ঐ আদর্শের অনুসরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে হইবে। আদর্শের, চরণে আত্মবলিদান করিতে পারিলে—মানুষের চিন্তা, কথা ও কার্য্য—এক সুরে বাঁধা হইবে। ('নূতনের সন্ধান'। পৃ ৮২-৮৩)

তিন. অরাজকতা দমন করে স্বাধীন ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রাখবার জন্য মধ্য ভিক্টোরিয় গণতন্ত্র নয়, সামরিক নিয়মানুবর্তিতা দ্বারা আবদ্ধ শক্তিশালী একদলীয় সরকার। (সাম্যবাদী সংঘের কার্যক্রম। সংখ্যা ৮)।

চার. সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করতে হলে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দ্বারা চলবে না। (অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ২৩)

পাঁচ. ভারতবর্ষের রোগ একটা নয়। তার এতরকমের রাজনৈতিক ব্যাধি একমাত্র একজন নির্মম ডিক্টেটরই সারাতে পারে। (হিউ টয়। 'ব্যাঘ্রকেতন'। পৃ ৮৪)

ছয়. মার্কসীয় সমাজতন্ত্র ষোল আনা আন্তর্জাতিক। জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সম্পর্ক নাই। এক্ষেত্রে বরং ফ্যাসীবাদ বা নাৎসীবাদের সঙ্গে সুভাষের সাদৃশ্য আছে। (অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৪০)

সুভাষচন্দ্রের ফ্যাসিবাদে যে-অরুচি ছিল তারও সমর্থনে নানা যুক্তি ও উক্তি দেখানো যায়—

এক. হিটলারবাদের আমি বিরোধী, তা' সে হিটলারতন্ত্র কংগ্রেসের মধ্যেই থাকুক বা অন্য দেশেই থাকুক। আমার মনে হয়, হিটলারবাদের হাত থেকে

বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো সমাজতন্ত্র। (অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ: ৩২)

দুই. দূর প্রাচ্য থেকে জাপান পাশ্চাত্ত্য শক্তিকে তাড়াতে চায়। কিন্তু এই পাশ্চাত্ত্য তাড়ানো কি বিনা সাম্রাজ্যবাদ করা চলে না? চীনের মত প্রাচীন সভ্য একটা জাতকে আক্রমণ না করলেই চলতো না? না, না, জাপানের কৃতিত্বের যতই প্রশংসা করি না কেন, আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণ চীনের এই বিপদের সময়ে চীনেরই কাছে যাবে। (অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ: ৪০)

তিন. দেশকে স্বাধীন করার জন্যে তিনি এতই অস্থির হয়ে পড়েন যে ফ্যাসিস্ট শিবিরে সাহায্যের আশায় যোগ দেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে এরূপ সুবিধা গ্রহণ নতুন কিছু নয়। স্টালিনও হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন। জার্মানিতে কমিউনিস্টরাও হিটলারকে ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করেছিল সোসাল ডেমোক্র্যাটদের প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্যে।[৪৭] কমিউনিস্ট চীনও ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন করে।

চার. সুভাষচন্দ্রের চিন্তায় ফ্যাসিবাদী উগ্রতা অনুপস্থিত। তিনি সাম্রাজ্য-বাদকে চিরকাল নিন্দা করেছেন—ফ্যাসিস্টরা উগ্রতর সাম্রাজ্যবাদী। তাছাড়া তিনি তাদের জাতিশ্রেষ্ঠতা তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের জন্যে চিরকাল তাঁর মর্মবেদনা ব্যক্ত হয়েছে।

পাঁচ বৈষ্ণব প্রেম ও প্রীতির ভাবধারায় প্রভাবিত সুভাষচন্দ্র ফ্যাসিবাদী দর্শনের প্রত্যয়ে অধিনেতার ইচ্ছাশক্তি ও অনুভূতিতত্ত্ব নিশ্চয় গ্রহণ করতেন না। তাদের দর্শন ও রাজনীতির বহু মৌলিক বিষয় তাঁর মধ্যে অবর্তমান ছিল। সাময়িক প্রয়োজনের তাড়নায় তিনি তাদের অনুকরণে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের বিরোধিতা করেছেন ও তাদের কিছু রীতিনীতি অবলম্বন করেছেন।

ব্রিটেনে ভিক্টোরীয় গণতন্ত্র কিংবা ফরাসিদের বুর্জোয়া গণতন্ত্রে তিনি অনাস্থা প্রকাশ করেন। তিনি ফ্যাসিবাদের মধ্যে কিছু গুণ দেখেছিলেন; এবং কমিউনিজমের মধ্যেও অনুরূপ কিছু গুণ প্রত্যক্ষ করে উভয়ের সমন্বয়ে এক স্বতন্ত্র মতবাদ প্রচার করেন। ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের এই সমন্বয়চিন্তা বেশ গোলমেলে। কারণ তাদের মূলগত দার্শনিক প্রভেদ।

সুভাষচন্দ্রের জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্র ও জার্মান নাৎসিদের ন্যাশন্যাল সোসালিজমের মধ্যে কিছুটা মিল আছে। সুভাষবাদী মতবাদের বিশিষ্ট প্রবক্তা অনিল রায় সাম্যবাদী সংঘের কার্যক্রম আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

এই সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম থেকে দেখা যায় সুভাষ তথাকথিত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নন। ফ্যাসীবাদ ও মার্কসবাদের সাংগঠনিক নীতির মধ্যে দুটি বিষয়ে খুব মিল আছে। এরা উভয়েই স্বৈরতান্ত্রিক (authoritarian) বা সমগ্রতান্ত্রিক (totalitarian) রাষ্ট্রে বিশ্বাসী। তাছাড়া রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত আর্থিক পরিকল্পনা

এদের দুয়েরই সমাজগঠনের ভিত্তি। সুভাষ এই দুটিই গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া জাতীয়তাবাদ সুভাষের মূলমন্ত্র। এক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদের সঙ্গে আংশিক মিল রয়েছে সুভাষবাদের। কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদও সুভাষের মৌলিক নীতি ; এদিক দিয়ে মার্কসবাদের সঙ্গেও মিল রয়েছে সুভাষের। উপরের প্রগ্রামে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটার উল্লেখ নেই। কিন্তু জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, জনতার পূর্ণ আর্থিক মুক্তি এবং কিষাণ মজুরদের পক্ষেও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ঘোষণা এই কার্যক্রমে রয়েছে। ফ্যাসীবাদ ও মার্কসবাদের সঙ্গে সুভাষের সাদৃশ্য থাকলেও গুরুতর পার্থক্যও রয়েছে। সুভাষের জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এই দুই-ই নানা বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয়তায় একেবারে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত।[৪৮]

সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়বাদ

"ন্যাশন্যাল সোসালিজম ও কমিউনিজমের সমন্বয়ই আমাদের রাষ্ট্রদর্শন হওয়া উচিত" বলে সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। বহু পূর্বেই তিনি বলেছিলেন যে, "পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ব্যবস্থার সমন্বয়সাধন করে আমাদের নূতন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব করতে হবে"।[৪৯] এ-চিন্তার তত্ত্বগত যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বলেন—

বিবর্তনের একেবারে শেষস্তরে এসে না পেঁছালে কিংবা বিবর্তনকে একেবারে অস্বীকার না করলে, একথা বলবার কোনও যুক্তিই নেই যে আমাদের সামনে কেবল দুটি বিকল্প পথই মাত্র আছে, তার মধ্যেই বেছে নিতে হবে। হেগেলীয় বা বার্গসোনীয় বা অন্য কোনও ধরনের বিবর্তনই মানি না কেন, কোনও ক্ষেত্রেই একথা মনে করবার কারণ নেই যে সৃষ্টি শেষ হয়ে এসেছে। সকল দিক বিবেচনা করে এই মতই স্বীকার করতে হয় যে বিশ্ব ইতিহাসের পরবর্তী স্তরে কম্যুনিজম ও ফ্যাসীজমের একটা সমন্বয়সৃষ্ট হবে।[৫০]

ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের কল্যাণকর বিষয়গুলির তুলনা করে তিনি দেখিয়েছেন যে "দুটি ব্যবস্থাই গণতন্ত্রবিরোধী অথবা একনায়কত্ববাদী। দুটি ব্যবস্থাই পুঁজিবাদবিরোধী। কিন্তু এই মিল সত্ত্বেও কয়েকটি ব্যাপারে তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান···ন্যাশন্যাল সোসালিজম জাতীয় ঐক্য ও সংহতিবিধানে এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধনে সমর্থ হয়েছে"। ফ্যাসিবাদে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার সাধন না হওয়ায় ঐ ব্যবস্থায় তাঁর আপত্তি ছিল। অপরদিকে কমিউনিজমের ভিত্তিতে গঠিত সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন ও ব্যক্তিগত মালিকানার বিলোপ তাঁকে

আকৃষ্ট করেছিল। কমিউনিজমে জাতীয়তাবাদের স্থান নেই, ধর্মের কদর নেই, শ্রমিক ছাড়া অন্য শ্রেণীর মানুষের গুরুত্ব নেই ও ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকেই শুধুমাত্র গ্রহণ করায় তাতেও তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। তাই তিনি ঐ দুটির নিষ্কর্ষ সমন্বিত করে তাঁর সাম্যবাদী বা সমন্বয়ী রাষ্ট্রদর্শন প্রচার করেন। তত্ত্বগতভাবে তিনি এই মতবাদের সমর্থনে বলেছেন—

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ব, মহত্তর কোনও সমন্বয়ের মধ্যেই তার নিবৃত্তিসাধন করতে হবে। দ্বন্দ্বনীতি সেই কথাই বলে। এ যদি না করা হয় তো, মানবপ্রগতি রুদ্ধস্রোত হয়ে পড়বে। ভারতবর্ষে তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে উত্তীর্ণ হবার জন্যই চেষ্টা করা যাবে।[৫১]

সুভাষবাদী সমাজতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনিল রায় লিখেছেন: "ফ্যাসীবাদের একটা মূল উপাদান হলো জাতীয়তাবাদ। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র জাতীয়তাবাদকে যুক্ত করেছেন। এটাই সুভাষী সাম্যবাদের অন্যতম সমন্বয়।" প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যাশ্রয়ী সুভাষবাদী চিন্তাকে তিনি আরো বিশ্লেষণ করেছেন এই বলে—

সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ হলো ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নব সমাজতন্ত্রবাদ। একদিকে গান্ধীবাদের আতিশয্য, অন্যদিকে মার্কসবাদের আতিশয্য। এই দুই মতবাদের বাইরে তিনি তৃতীয় মতবাদ 'সমাজতন্ত্রের' পরিকল্পনা করেছেন। কিন্তু এই সমাজতন্ত্রও ভারতবর্ষের আদর্শের মধ্যেই রয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূল তত্ত্বের উপরেই এই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হবে। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে জীবনের অন্যান্য দিকের সমন্বয়ই এযুগের কালধর্ম। সুভাষচন্দ্রের সাম্যবাদ সেই আদর্শের বাহক এবং সেই সমন্বয়েরই ধারক।[৫২]

সুভাষচন্দ্রের ভারতীয় রাজনীতির দ্বান্দ্বিক বিচারবিশ্লেষণ ও বামপন্থী দলের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। কংগ্রেসকে তিনি পাঁচমিশালী মতের এক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখেছেন। সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একটি আদর্শকে সামনে রেখে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামকে পরিচালনার জন্যে তিনি একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বামপন্থী দলের প্রয়োজন বহু আগেই অনুভব করেছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের ভিতরে থেকেই তার প্রগতিবাদী বামপন্থী বিভিন্ন দলগুলিকে একটি দলের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসী হন এবং কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মসূচিকেও মেনে নেন। তিনি বলেছিলেন—

The Forward Bloc will function as an integral part of the Congress. It will accept the present constitution of the Congress—its creed, policy and programme. It will cherish

the highest respect and regard for Mahatma Gandhi's personality and complete faith in his political doctrine of non-violent non-co-operation.[৫৩]

কথাটি বলেছিলেন ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর। ত্রিপুরীতে সভাপতিপদে তিনি পুনর্নির্বাচিত হন বটে, কিন্তু তাঁর সমর্থকেরা এ. আই. সি সি.-তে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি এবং হাইকম্যান্ডের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। সেজন্যেই মূলত এই দলের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তিনি দুটি কর্তব্য স্থির করেন—প্রথমত, কংগ্রেসের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার সৃষ্টি ও দ্বিতীয়ত, আমূল পরিবর্তনের দাবিতে দেশব্যাপী গণসংগ্রামের প্রস্তুতি। সেজন্যে ছাত্র ও যুব সংগঠন, ভলান্টিয়ার দল, কিষাণ সভা ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে এই কাজে লাগাতে চান।

সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী ঐক্যের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকও ক্রমে কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে একটি পার্টিতে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবস (৯ জুলাই, ১৯৩৯) অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করায় সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। ফরওয়ার্ড ব্লকেরও কার্যকলাপ হয়ে দাঁড়ায় আরও স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তিনি বলেন: "দক্ষিণপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে গান্ধীপন্থীদের যে সম্পর্ক বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পর্কও ঠিক তা-ই। দার্শনিক ভাষায় বলা যায়, ফরওয়ার্ড ব্লককে গান্ধীপন্থীদের 'প্রতিক্রিয়া' (antithesis) বলে গণ্য করা যেতে পারে।" ব্লকের ভূমিকা সম্পর্কে অনেকের ভুল ধারণা ও প্রচারের বিরুদ্ধে তিনি বলেন –

The role of the Forward Bloc in Indian history is not that of His Majesty's opposition. We have seen remarks to the effect that the aim of the Forward Bloc is merely to ginger up the present policy and programme of the Congress. There could be no greater misunderstanding than this. The Bloc stands for something positive and dynamic.[৫৪]

ব্লকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৩৯ সালের মে মাসে এবং ১৯৪০ সালের জুন মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই দলকে একটি পার্টি বলে ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে আপসহীন সংগ্রাম এবং সংগ্রামোত্তর কালে সামাজিক পুনর্গঠনই তার আদর্শ—

১. পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা, এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম; ২ সম্পূর্ণরূপে আধুনিক ও সমাজবাদী রাষ্ট্র; ৩. দেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় ব্যাপক শিল্পোৎপাদন; ৪. উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার সামাজিক মালিকানা

ও নিয়ন্ত্রণ; ৫. ধর্মোপাসনার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ৬. সকলের জন্য সমান অধিকার, ৭ ভারতীয় সমাজের সর্বশ্রেণীর ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা; ৮. স্বাধীন ভারতে নববিধান গঠনে সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার-নীতির প্রয়োগ।[৫৫]

উপসংহার

ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্রের মনে এক তীব্র অবসাদ দেখা দিয়েছিল। রাজনীতির দলাদলি ও নোংরামি তাঁর মনে সৃষ্টি করে তিক্ত বীতস্পৃহা। সেই সময়ে তিনি লিখেছিলেন—

Owing to the morally sickening atmosphere of Tripuri, I left that place with a loathing and disgust for politics as I have never felt before during the last 19 years···I began to ask myself again and again what would become of our public life when there was so much of vindictiveness even in the highest circles...At times the call of the Himalayas became insistent, I spent days and nights of moral doubts and uncertainties. Then slowly a new vision dawned on me and I began to cover my mental balance.[৫৬]

রাজনীতিতে এ-ধরনের অনাসক্তি ও বীতস্পৃহা কেবল তাঁর ক্ষেত্রেই দেখা যায় নি। বহু নেতা ও কর্মীর মধ্যেই এরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। রাজনীতিকে এদেশে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে না দেখাই তার কারণ। রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্তি ও নীতির পরিবর্তে আবেগ ও উচ্ছ্বাস এবং স্বাধীন চিন্তার পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস প্রাধান্য পেয়েছে। জাতি, ধর্ম, প্রদেশ, ভাষা ইত্যাদির বিদ্বেষ ও সংকীর্ণ মনোভাবে উদারনীতি ও মানবতার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বোধ, সহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ হয়নি। কায়েমীস্বার্থের হাতে রাজনীতি হয়েছে খেলার বস্তু। যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও শক্তি থাকা সত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র দেশের এই প্রবণতা থেকে নিষ্কৃতি পান নি। চিন্তার সীমা ও স্ববিরোধ থাকায় তাঁর সংবেদনশীল মানবদরদী উদার মন বিষাক্তচক্রে আবর্তিত হয়ে তীব্র জ্বালা ও গভীর ব্যথায় কেবলই রুদ্ধ গর্জন করেছে।

দেশকে স্বাধীন দেখাই ছিল তাঁর একমাত্র স্বপ্ন। স্বাধীন না হলে দেশের দুর্গতি দূর হবে না। সেজন্যে ধৈর্যহারা হয়ে তিনি যে-কোনো পথই অনুসরণ করতে কৃতসংকল্প হন। শেষাবধি কিছুটা অনভিপ্রেত পথেই তাঁকে পা বাড়াতে হয়। তিনিও যেমন চরমপন্থা চেয়েছিলেন, দেশের প্রতিকূল পরিবেশও

পাকেচক্রে তাঁকে সেইদিকে যেতে বাধ্য করে। তাই সুভাষচন্দ্রের এক ও অদ্বিতীয় বন্ধু দিলীপকুমার রায় সখেদে লিখেছেন—

So, Subhas was a victim of a conspiracy of forces which, by exploiting his heart-sickness, induced him to seek a kind of catharsis through adventure. I do not suggest that his decision had been right, for I cannot but think that he should have remained here and faced the music rather than shake hands with the contaminating Fascists.[৫৭]

ভারতীয় জনমনের প্রাণপ্রতিম সুভাষচন্দ্র ছিলেন জাতীয়তাবাদের এক নিষ্ঠাবান পূজারী। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মূলাধার ছিল দেশভক্তি। তাঁর রচনাদির মধ্যে জাতীয়তাবাদই বারংবার ও বৃহদাকারে ফুটে উঠেছে। দেশের সর্বাত্মক ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতাকেও তিনি বিষ-নজরে দেখতেন। জাতীয়তাবাদের তাত্ত্বিক আলোচনায় বিশেষ প্রবৃত্ত না হলেও তিনি জাতির উপর এক পরম সত্তা আরোপ করেছেন—সমষ্টিকে ব্যষ্টির উপর স্থান দিয়েছেন—এমন এক দেশে যেখানকার ধমনীতে ধর্মের উন্মাদনা, সামন্ততন্ত্রী ঐতিহ্য ও যূথবাদী মনের শোণিতধারা প্রবল।

ভারতের রাষ্ট্রদর্শনে গান্ধী, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ বা মানবেন্দ্রনাথের মতো সুভাষচন্দ্রের স্থায়ী ও মৌলিক কোনো অবদান নেই। তিনি তত্ত্বকথার চেয়ে কাজেই বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী মূলত বিশ্লেষণমূলক ও সমকালীন সমস্যার প্রেক্ষাপটে রচিত। গান্ধী ও বামপন্থী নেতাদের মতো তিনি অর্থনৈতিক সমস্যার উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্গতি থেকে মুক্তির জন্যে প্ল্যানিং-এর আবশ্যকতা অনুভব করেন। দেশের সমগ্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ধারাবদলের চিন্তায় তাঁকে অন্যতম পথিকৃৎ বলে মনে করা যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সুভাষচন্দ্র তাঁর চিন্তার অসংগতি ও পরস্পর-বিরোধিতা সম্পর্কে কিছুটা অবহিত ছিলেন। সেজন্যে নিজের মতামতের পরিবর্তনও করেন। ফ্যাসিবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ম্লান হয়ে যায় যখন তিনি তার আক্রমণাত্মক রূপ প্রত্যক্ষ করেন। বস্তুত তাঁর কমিউনিজম ও ফ্যাসিজমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা কতটা নির্ভুল ও ভারতের মত দেশেও তা প্রযোজ্য কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রভুত্ববিস্তারী ও একনায়কতন্ত্রী প্রণালী উক্ত দুটি সমাজব্যবস্থারই প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের মত অনুন্নত দেশেতো বটেই, এমনকি আজকের দিনে কোনো দেশের পক্ষেই তা আদৌ কল্যাণকর নয়। মানুষের সহজাত যুক্তিবাদী চিন্তা ও সমাজ-চেতনার বিকাশ, বিকেন্দ্রিত প্রশাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ও ব্যক্তির

সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতাই ভারতীয় জনগণকে নবজীবনে বলীয়ান করবে। পরম অধিনেতার ইচ্ছাধীনে ও ফৌজি দলের সাহায্যে মানুষের উপর যে-কোনো সিদ্ধান্ত জোর করে চাপিয়ে দেবার রীতি আজকের দিনে একেবারেই পরিত্যাজ্য। হিংসা ও জাতি-বিদ্বেষ কোনোক্রমেই সমর্থনীয় নয়। অবশ্য তার একটা পরিসীমা আছে। অন্য রাষ্ট্র ভারত আক্রমণ করলে তখন আর নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না; তবে আন্তর্দেশিক কলহের নিষ্পত্তি—সম্প্রীতি ও যুক্তির সাহায্যে হওয়াই সবসময়ে বাঞ্ছনীয়। তার পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রী সার্বিক দেশের অনুকরণ শুধু অর্থহীনই নয়, রাজনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিবর্তনেরও পরিপন্থী।

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাসচন্দ্রের ভূমিকা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের তিনি ছিলেন অন্যতম। পরাধীন দেশের শৃঙ্খলমুক্তির জন্য তিনি নিজের জীবনাহুতি দিয়েছেন। রাষ্ট্রদর্শন ও তত্ত্ব-আলোচনার তাঁর অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক না হলেও সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ, সমাজবাদ ও সমন্বয়বাদী চিন্তাভাবনা বিশ্লেষণমূলক ও মননোদ্দীপক হিসেবে অবশ্যই মূল্যবান।

উৎস নির্দেশ

১: সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ। পৃ ৭৮।
২। হিউ টয়। 'ব্যাঘ্রকেতন'। ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। পৃ ৫৩।
৩: অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৪০।
৪. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ। পৃ ১৩৫।
৫: তদেব। পৃ ১৩৬। ৬. তদেব। পৃ ১৩৪।
৭. তদেব। ৮. তদেব। পৃ ১৩৬। ৯. তদেব। পৃ ১৩২।
১০. Subhas Chandra Bose. *Crossroaas*. 1962. p. 174.
১১. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ। পৃ ১৩৩।
১২: সুভাষচন্দ্র বসু। 'নূতনের সন্ধান'। ৪র্থ সংস্করণ। পৃ ৮০।
১৩. Subhas Chandra Bose, *Selected Speeches*. 1962. 31-32.
১৪. ——— *The Indian Struggle ; 1920-42*. 1964. p. 372.
১৫. ——— *Crossroads*. 1962. p. 272.
১৬. ——— *The Indian Struggle ; 1920-42*. 1964. p. 11.
১৭. *Ibid.* ১৮. *Ibid.* p. 20.
১৯. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। ১৩৭২ বঙ্গাব্দ, পৃ ৬৪।
২০. সুভাষচন্দ্র বসু। 'নূতনের সন্ধান'। পৃ ৫৯।
২১. তদেব। পৃ ১২৮-১২৯। ২২. তদেব। পৃ ৫৩-৫৪।
২৩. তদেব। পৃ ৭৩। ২৪. তদেব। পৃ ৯২।
২৫. ——— *Selected Speeches*. *1962*, P. 33.

২৬. ——— *What we believe.* The Socialist Republican Party, Calcutta: 1948. p. 45,
২৭. ——— *The Indian Struggle ; 1920-42.* 1964, p. 295.
২৮. ——— *Crossroads.* 1962, pp. 174-177.
২৯. *Ibid.* p. 253.
৩০. ——— *The Indian Struggle ; 1920-42.* 1964, pp. 314-315.
৩১. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩, পৃ ৬০।
৩২. ——— *The Indian Struggle ; 1920-42.* 1964. p. 298.
৩৩. *Ibid.* pp. 456-457.
৩৪. সুভাষচন্দ্র বসু। 'নূতনের সন্ধান'। পৃ ১১৪।
৩৫. ——— *Selected Speeches.* 1962. pp. 35-36.
৩৬. সুভাষচন্দ্র বসু। 'তরুণের স্বপ্ন'। ১৩৬৫। পৃ ৫৭-৬০।
৩৭. সুভাষচন্দ্র বসু। 'ভারত পথিক'। পৃ ৩০।
৩৮. সমর গুহ। 'নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা'। পৃ ১৭০।
৩৯. ——— *Selected Speeches.* 1962. pp. 100-101.
৪০. *Ibid.* p. 114.
৪১. ——— *The Indian Struggle ; 1290-42.* 1964. p: 295.
৪২. *Ibid.* pp. 113-114.
৪৩. *Ibid.* pp. 93, 114.
৪৪. *Ibid.* p. 298.
৪৫. *Ibid.* pp. 392-394.
৪৬. Jawaharlal Nehru. *The Discovery of India.* 1956, p. 447.
৪৭. *Encyclopaedia Britannica.* 1960. (*INTERNATIONAL*)
৪৮. অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৩৪।
৪৯. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি-সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩। পৃ ১০৬।
৫০. ——— *The Indian Struggle ; 1920-42.* p. 313.
৫১. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি-সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩। পৃ ১০৬-১০৭।
৫২. অনিল রায়। 'নেতাজীর জীবনবাদ'। পৃ ৪৪।
৫৩. ——— *Selected Speeches.* 1962. p. 114.
৫৪. ——— *Crossroads.* 1962. p. 253.
৫৫. সুভাষচন্দ্র বসু। 'মুক্তি সংগ্রাম ; ১৯৩৫-৪২'। ১৯৫৩। পৃ ৯০।
৫৬. *Modern Review.* April, 1939.
৫৭. Dilip Kumar Roy. *Netaji : The Man.* 1966. p. 151.

তিন. বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী রাষ্ট্রদর্শন

পরিপ্রেক্ষিত

মানবতাবাদী রাষ্ট্রচিন্তার দুটি মূল ধারার অন্যতম আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ সম্পর্কে প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। অপর যে নিরীশ্বরবাদী ধারা সেটি বস্তুবাদী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রচলিত দৃষ্টিতে যে-দার্শনিক মতে তত্ত্বের (reality) মনোনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র সত্তা (existence) থাকে তাকে বস্তুবাদ বলা হয়। তদনুযায়ী বস্তুকেই (matter) সবকিছুর অগ্রবর্তী বলে মনে করা হয়। ইদানীং বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বস্তুবাদ সম্পর্কে এই মনোভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বস্তু ও মন অদ্বয় (monistic) অস্তিত্বে একীভূত ধারায় প্রবহমান। পরবর্তী মূল অংশে এ-প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হবে। ভারতে বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী ধারা সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

আঠার ও উনিশ শতকে এদেশে পশ্চিমের সংস্পর্শে যে-রেনেসাঁস আন্দোলন দেখা দেয়, চরিত্রে সে-আন্দোলন ইউরোপীয় রেনেসাঁসের সমগোত্রীয় ছিল না। ইউরোপীয় রেনেসাঁস ও পরবর্তী কালের যুক্তিবাদী এনলাইটেনমেন্টের অন্তঃসার ছিল মানবতাবাদ এবং সেটা অনেকাংশেই বস্তুবাদী। প্রাচীন গ্রীসের বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী জীবনাচার ছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁসের মডেল। উনিশ শতকের ভারতীয় রেনেসাঁসের নায়কেরা প্রাচীন ভারতের বস্তুবাদী ভাবধারার কপিল, কণাদ, বুদ্ধ, চার্বাক প্রমুখকে আদর্শ হিসেবে দেখেন নি।

পশ্চিমী প্রভাবে ঘটলেও এদেশে রেনেসাঁসের প্রকৃতি ছিল বিমিশ্র ও দ্বৈতধারায় বিভক্ত। একদিকে প্রাচীন সংস্কৃতি তথা হিন্দু বৈদান্তিক চিন্তার পুনরাবর্তনের প্রয়াস, অন্যদিকে পশ্চিমী শিক্ষা ও বিজ্ঞানচর্চার প্রতি অনুরাগ, ইহমুখী জীবনবোধ ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যুক্তিবাদী প্রবণতা।

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম উদ্যোক্তা ছিলেন উইলিয়াম জোনস, ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড, হেনরি টমাস কোলব্রুক, চার্লস উইলকিন্স, ডেভিড হেয়ার, উইলিয়াম কেরি প্রমুখ বিদেশী বিদ্বজ্জনেরা যাঁরা করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা, কিংবা ভারতের সমস্ত ভাষার অক্ষর ঢালাই ও বইপত্রের মুদ্রণ অথবা ব্যাকরণ অভিধান প্রভৃতি আকর গ্রন্থের প্রকাশনা। তাঁরাই করেছিলেন এদেশে মানবিক বিদ্যার স্বাধীন চর্চা, প্রাচ্যবিদ্যা বিষয়ে অনুসন্ধান ও গবেষণা, পশ্চিমী শিক্ষার প্রবর্তন এবং বই ও পত্রপত্রিকা প্রকাশনের মাধ্যমে রেনেসাঁসের গোড়াপত্তন। চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তাঁদের কারো কারো ছিল খ্রীষ্টান

ধর্মের প্রচার। সে কাজ করতে গিয়ে তাঁরা সুদূরপ্রসারী ও বৃহত্তর কল্যাণ-সাধন করেন।

ভারতীয় রেনেসাঁসকে ত্বরান্বিত করতে ক্রমে এদেশের বিদ্বজ্জনেরাও তৎপর হন। দেশবাসীর বিজ্ঞানচেতনা ও ব্যবহারিক জীবনের উন্নতিকল্পে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা রামমোহনের স্মারকপত্র ছিল সেদিনের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি তাতে এদেশে বেকনের যুক্তিবাদী চিন্তানুসারী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছিলেন।

এদেশে আধুনিক মানসিকতার অন্যতম আদি পুরুষ রামমোহনের ছিল দ্বৈতসত্তা। একদিকে তিনি বৈদান্তিক চিন্তার পুনরাবর্তনের প্রয়াসী হন, অন্যদিকে বিজ্ঞানচেতনা ও যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রবর্তন এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের উন্নতি ও শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন।

রামমোহনের অব্যবহিত পরে বঙ্গদেশে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হেনরি ডিরোজিওর ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ইয়ং বেঙ্গল নামে একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল; সকল অর্থে তাঁরা ছিলেন রেনেসাঁসের মানুষ। যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তা, ইহমুখী (সেকিউলার) জীবনবোধ এবং রাষ্ট্রচিন্তায় ব্যক্তিস্বাধীনতার আদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হন। তাঁরা ছিলেন ফরাসি বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম আদর্শের অনুরাগী। উদারনৈতিক মতাদর্শে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল এদেশে তাঁরাই প্রথম গঠন করেন। কয়েক দশক যাবৎ কলকাতায় বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নানা ধরনের সমাজোন্নয়নে তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বেশি জড়িয়ে পড়ার ফলে তাঁদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে।

ইয়ং বেঙ্গলের পরোক্ষ প্রভাবে উনিশ শতকে যথার্থ মানবতন্ত্রী হিসেবে দেখা যায় অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে। প্রথম জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন অনুরূপ একজন যুক্তিবাদী, যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে টোল-চতুষ্পাঠীর শিক্ষায় এদেশের ব্যবহারিক ও মননজীবনের অগ্রগতি হওয়া অসম্ভব।

বিশ শতকে ভারতীয় রেনেসাঁসের চেতনা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়। যদিও তিনি আধ্যাত্মিক ধারার একজন মানবতাবাদী ছিলেন, কিন্তু মানুষের ইহজীবনের উন্নয়নই ছিল তাঁর ধ্যানের বস্তু। তিনি ভোগবিমুখ জীবনে সায় দেন নি।

ভারতে বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি পায় মার্কসীয় রাজনীতির সূত্রপাত থেকে, যার পুরোভাগে ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ। কমিউনিস্ট জীবনের প্রথম পর্বে ভারতে তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন মুজফফর আহমদ ও কবি নজরুল ইসলাম। তবে বিভিন্নধারার সমাজতন্ত্রীরা সবাই নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। জওহরলাল ছিলেন অজ্ঞাবাদী, কিন্তু জয়প্রকাশ ঈশ্বরে বিশ্বাস

করতেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকেই পরাধীনতাজনিত ইংরেজ-বিদ্বেষ ক্রমে পশ্চিমী বিদ্বেষের পথ অনুসরণ করে আধুনিক সভ্যতার বিদ্বেষে পরিণত হয়। স্বাধীনতার অর্থ যদি সর্বজনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়, তাহলে শুধুমাত্র দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সনাতন ধারাকে আঁকড়ে থাকলে চলে না। চাই রেনেসাঁসের সঠিক উপলব্ধি—অর্থাৎ সমগ্র মানবসমাজের যা কিছু বর্তমান বিকাশের পক্ষে অনুকূল তার অনুসরণ এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে মানুষের ঐহিক উন্নতি ও ব্যক্তিমানুষের বিচিত্র সৃষ্টিসত্তার অবাধ উন্মেষ।

এ-শতকের ভারতীয় সাধনায় বিশ্বের সকল স্থান ও কাল থেকে মানুষের বিকাশোপযোগী উপকরণ আহরণের মধ্যে দিয়ে দেশের মননজীবনকে পরিপুষ্ট করে তোলার কাজে দুজনই সবিশেষ তৎপর হয়েছেন—একজন রবীন্দ্রনাথ এবং অপরজন মানবেন্দ্রনাথ। মানবতাবাদকে দুজনে ভিন্নভাবে বিচার করে থাকলেও দুজনের চোখে মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি এবং উভয়ের রাষ্ট্রতত্ত্ব মূলত নীতিনির্ভর।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ॥ ১৮৮৭-১৯৫৪

বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তায় মানবেন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি কিছুটা বিতর্কমূলক। কারণ প্রথমত, জাতীয় ভাবধারায় তাঁর মন গঠিত হয় নি এবং তাঁর মানসিক গঠনে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবই ছিল বেশি। দ্বিতীয়ত, তাঁর কর্মক্ষেত্র এত ব্যাপক ও বহুদেশিক ছিল যে তাঁকে কোনো দেশ বা জাতির গণ্ডিতে ফেলা যায় না; বস্তুত অনুরূপ কর্মক্ষেত্র ইতিহাসে আর কোনো মনীষীর জীবনে দেখা যায় না। তাহলেও মানবেন্দ্রনাথের ধমনীতে বাঙালী তথা ভারতীয় শোণিতধারাই ছিল প্রবহমান। ভারতেই তাঁর জন্ম ও মৃত্যু; জীবনের মাত্র ষোল বছর (১৯১৫-৩১) তাঁর বহির্বিশ্বে কাটে। সে-সময়েও স্বদেশের মুক্তির ভাবনা তাঁর মনে অণুক্ষণ বিরাজ করত। এদেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকাও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক বিশ্বের চিন্তার ভাণ্ডারে ভারতীয় অবদানকে তিনি স্বকীয় মৌল বৈশিষ্ট্যে পরিপুষ্ট করেছেন।

মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও মননধারা মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিবর্তিত হয়। জাতীয়তাবাদ থেকে মার্কসবাদের মধ্যে দিয়ে ক্রমে তিনি নবমানবতাবাদে উপনীত হন। শেষোক্ত পর্যায় তাঁর আজীবনকাল অর্জিত বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনন্য জ্ঞানেরই পরিণতি। ভূমণ্ডলের উভয় গোলার্ধে পরিব্যাপ্ত কর্মজীবনে রুশ, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিস, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় মানবেন্দ্রনাথের শতাধিক ছোটবড় গ্রন্থ বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত হয়। বাংলায় তিনি কিছু লেখেন নি। কারাজীবনে লিখিত দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি এখন অনেকাংশে অমুদ্রিত রয়েছে। এমতাবস্থায় তাঁর কর্মজীবন ও ভাবজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রস্তুতি সম্ভব নয়। নিজের জীবনকথা তিনি সামান্যই বলে গেছেন। শেষ জীবনে লেখা তাঁর *Memoirs* থেকে কর্মজীবনের প্রথম দিকে স্বদেশে বিপ্লব ঘটানোর জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা, মেক্সিকোর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের (সংক্ষেপে কমিন্টার্ন) যোগদানের পর গোড়ার দিককার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বহু রাষ্ট্রনেতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথের পিতৃদত্ত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বৈপ্লবিক কর্মে আত্মগোপন করে থাকার জন্যে তিনি কয়েকটি নাম গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৩৬) তাঁর মানবেন্দ্রনাথ রায় নামকরণ করেন।[১] নরেন্দ্রনাথের পিতা ছিলেন যাজক ও সংস্কৃত পণ্ডিত। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্র নরেন্দ্রনাথ কৈশোরেই রাজনীতিতে প্রবেশ

করেন। সে-সময়ে বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করে। বিপিনচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী ভাষণে তিনি স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন। কিন্তু মডারেটদের আবেদন-নিবেদন নীতির পরিবর্তে সশস্ত্র বিপ্লব-সাধনই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই সাভারকর ও অরবিন্দের আদর্শে তাঁর কর্ম-জীবন শুরু হয়; যুগান্তর দলের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭০-১৯১৫) প্রধান সহযোগী হয়ে ওঠেন।

অস্ত্র-সংগ্রহের তাগিদে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্যই বিপ্লবীরা তৎকালে রাজনৈতিক ডাকাতিতে লিপ্ত হতেন। ১৯০৭ সালে নরেন্দ্রনাথ এক রেলস্টেশনে ডাকাতির দায়ে অভিযুক্ত হন। অপরিণত বয়সদৃষ্টে বিচারক সেই অভিযোগ অবিশ্বাস করে তাঁকে রেহাই দেন। এরপর অনুরূপ অভিযোগে কয়েকবার গ্রেপ্তার হন এবং প্রমাণাভাবে মুক্তি পান। ১৯১০ সালে হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীনে যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীগণসহ তিনি কুড়ি মাস কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পরে পুনরায় গার্ডেনরীচ ও বেলেঘাটা ডাকাতি মামলায় দীর্ঘদীন বিচারাধীনে নিঃসঙ্গ কারাদণ্ড ভোগ করেন। কারাজীবনে ধর্মগ্রন্থ পাঠে তাঁর মনে এক নতুন ভাবের উদয় হয়। মুক্তির পর তিনি সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেছিলেন। পদব্রজে দেশভ্রমণে বেরিয়ে তিনি বহু সাধুসন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে আসেন। কিন্তু তাতে তাঁর মনের প্রকৃত তৃষ্ণা মেটে নি। দেশের মুক্তির তাগিদে তিনি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) বেধে যাবার পর যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যুগান্তর দল সশস্ত্র বিপ্লবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাঁর প্রধান সহকর্মী নরেন্দ্রনাথকে জার্মানদের সহায়তায় বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ব্যাটাভিয়া থেকে সুন্দরবনে অস্ত্র আমদানি করতে গিয়ে ধরা পড়ে তিনি দূর প্রাচ্যে পাড়ি দেন। উদ্দেশ্য ছিল চীনের মধ্যে দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্ত্র আমদানি করা। সেই সময়ে রাসবিহারী বসু (১৮৮৫-১৯৪৫) ও সান-ইয়াৎ-সেনের (১৮৬৬-১৯২৫) সঙ্গে সংযোগ ঘটে। জাপান, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ ঘুরে শেষাবধি তিনি তাঁর কাজে ব্যর্থ হন। চীনে কিছু সময় পুলিশের হাজত-বাসেও কাটে; কারাদণ্ড এড়াবার জন্য তিনি পরিশেষে গোপনে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং সেখানকার ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন লালা লাজপত রায় ও ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। যুক্তরাষ্ট্রে থাকার সময়ে মানবেন্দ্রনাথ লাইব্রেরী অফ কংগ্রেসে বহুবিধ অমূল্য গ্রন্থরাজির আস্বাদ পান। কিন্তু সেখানে তিনি বেশি দিন থাকতে পারেন নি। সেখানকার সরকার তাঁকে সে-দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে। শেষে মেক্সিকোয় তিনি আশ্রয় নেন।

মেক্সিকোতে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় ও এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয়।

সেখানকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রবেশ করে ক্রমে তিনি মেক্সিকোর সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। সেই সময়ে জারের কিছু জহরত বেচার জন্য রাশিয়া থেকে মাইকেল বোরোদিন (১৮৮৪-১৯৫৩) মেক্সিকোয় এসেছিলেন। তিনিই মানবেন্দ্রনাথকে মার্কসবাদে দীক্ষা দেন। সময়ের হেরফেরে সাত বছর পরে চীনদেশে বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার উপদেষ্টা এই গুরুরই কর্মপদ্ধতি সংশোধনের জন্য কমিন্টার্ন থেকে তাঁকে হ্যানকৌতে পাঠানো হয়েছিল। পরবর্তীকালে আবার এই বোরোদিনই বুখারিনের সহায়তায় তাঁকে স্টালিনের রোষানল থেকে রক্ষা করে রাশিয়া থেকে পালাতে সাহায্য করেন। মেক্সিকোয় মানবেন্দ্রনাথ রাশিয়ার বাইরে পৃথিবীর প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিলেন (১৯১৯)। তিনি কমিউনিস্ট ইন্টার-ন্যাশন্যালের সভাপতিমণ্ডলী এবং কার্যনির্বাহিক সমিতির সদস্য হন।

১৯২০ সালের জুলাই মাসে পেট্রোগ্রাডে কমিণ্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। মানবেন্দ্রনাথ মেক্সিকোর প্রতিনিধি হিসাবে সেই অধিবেশনে যোগদান করেন। তার আগে মাস পাঁচেক তিনি বার্লিনে আটকে পড়েন। সেই সময়ে সেখানে ভারতীয় বিপ্লবীদের বার্লিন কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। একই সময়ে বার্নস্টিন, কৌটস্কি, পীক, মেয়ার, থালহাইমার, জেটকিন, লেভি, র‍্যাডেক প্রমুখ বিভিন্ন দেশের প্রবীণ ও নবীন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে রোসা লুক্সেমবুর্গের স্পার্টাকাস লীগের সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন মার্কসীয় মতাদর্শ সংশোধনের প্রয়াসী, আবার অনেকে অতিবাম কমিউনিস্ট। শেষোক্তদের প্রভাবে রায়ের মনে উগ্র মনোভঙ্গি সঞ্চারিত হয়, যার নিদর্শন মেলে সেই সময়ে প্রচারিত রায়ের An Indian Communist Manifesto নামে অভিহিত একটি ইস্তাহারে এবং কমিণ্টার্নের আসন্ন দ্বিতীয় বিশ্ব কংগ্রেসে।

দ্বিতীয় কংগ্রেসে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে লেনিনের ইতিহাস-বিখ্যাত এক বিতর্ক ঘটে। ঔপনিবেশিক ও অনুন্নত দেশগুলিতে কমিণ্টার্নের ভূমিকাই ছিল তার মূল আলোচ্য বিষয়। লেনিনের "Thesis on the national and colonial questions"-এর মূল প্রস্তাবের প্রথম বাক্যটি সংশোধিত আকারে চূড়ান্ত প্রস্তাবে রূপায়িত হয় এই বলে—

> The Communist International must be ready to establish temporary relationships and even alliances with the bourgeois democracy of the colonies and backward classes.[২]

লেনিন মনে করতেন যে পৃথিবীর বুকে সাম্রাজ্যবাদ যতদিন আধিপত্য করবে ততদিন পরাধীন দেশের সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে পশ্চিমী উন্নত দেশগুলির সর্বহারা আন্দোলনের মৈত্রীর সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রথমোক্ত বুর্জোয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশের কমিউনিস্টরাও হাত

মেলাবে।

লেনিনের থিসিস মানবেন্দ্রনাথ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। কারণ তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল ভিন্ন। তিনি দেখেছিলেন যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধোত্তরকালে রণবিধ্বস্ত সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলিতে আধিপত্য বজায় রাখার জন্য সেখানকার উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীকে কিছু সুযোগসুবিধা দিয়ে তাদের আনুকূল্য অর্জন করেছে। ঐ অধিবেশনে মানবেন্দ্রনাথ একটি পাল্টা থিসিস উপস্থাপিত করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে প্রাথমিক পর্যায়ে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সংযোগ রাখলেও কমিউনিস্টদের কাজ হবে যুগপৎ নীচে থেকে (from below) কৃষক ও শ্রমিকদের গণপঞ্চায়েতের (অনেকটা সোভিয়েত ধরনের) মধ্যে দিয়ে আসন্ন বিপ্লবে ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুত করা। মানবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

Two distinct movements which grow farther apart each day are to be found in the dependent countries. One is the bourgeois democratic nationalist movement, with a programme of political independence under the bourgeois order The other is the mass struggle of the poor and ignorant peasants and workers for their liberation from all forms of exploitation [৩]

লেনিনও মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। তবে ঔপনিবেশিক দেশগুলি সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত চিন্তা ও অখণ্ডনীয় যুক্তি লেনিনের সপ্রশংস স্বীকৃতি অর্জন করে। রায় বিশ্ববিপ্লবের একটি বিকল্প কর্মকৌশল তুলে ধরেন। তাঁর মতে ইউরোপের বিপ্লব এশিয়ার বৈপ্লবিক সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। কারণ পরাধীন দেশগুলিতে অর্থনৈতিক শোষণের মাধ্যমে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখে। এবিষয়ে লেনিনের দ্বিমত না থাকলেও এশিয়ার উপর রায়ের মাত্রাধিক গুরুত্ব আরোপ করাকে তিনি মানতে পারেন নি। লেনিন চেয়েছিলেন বিশ্ববিপ্লবে ইউরোপকে অগ্রাধিকার দিতে। তাহলেও তিনি তাঁর থিসিসের মর্ম কিছুটা শিথিল করে করেন এই বলে—

We as communists, should and will support bourgeois liberation movements in the colonies···When their exponents do not hinder our work of educating and organising the peasantry and the masses. And if these conditions did not exist, the communists must combat the reformist bourgeoisie'.[৪]

লেনিন অবশ্য রায়ের "non-capitalist path of development" তত্ত্বকে

মেনে নেন। অর্থাৎ ধনতন্ত্রী উন্নয়ন ব্যতিরেকেই সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। তাছাড়া লেনিন তাঁর থিসিসে "বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক"-এর পরিবর্তে "ন্যাশন্যাল রেভলিউশনারি" কথাটি যুক্ত করেন।[৫]

ঐ অধিবেশনে লেনিনের থিসিস কিংদাংশে সংশোধিত হয়। এবং রায়ের থিসিসও অল্পবিস্তর সংশোধনের পরে "সাপ্লিমেন্টারি থিসিস" হিসেবে গৃহীত হয়।[৬]

উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালে মানবেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর চিন্তাভাবনা ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করেন। কিন্তু লেনিন-রায় বিতর্কের বিষয়টি সুদূরপ্রসারী হয়ে দাঁড়ায়। অনুন্নত দেশ সমূহে কমিউনিস্টদের সঙ্গে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্কের প্রশ্নে সাম্প্রতিক রুশ-চীন বিরোধ এবং ভারতে সি-পি-আই এবং সি-পি-আই (এম) পার্টি-দ্বয়ের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্যের আদি উৎস, প্রবীণ ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা গঙ্গাধর অধিকারীর অভিমত অনুযায়ী লেনিন ও রায়ের বিতর্কে নিহিত।[৭]

ইংরেজের ঔপনিবেশিক নীতির ক্রমান্বয় পরিবর্তন ও বিশেষ করে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোগতি সম্পর্কে একটি সুন্দর চিত্র মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *India in Transition* গ্রন্থে (১৯২২) তুলে ধরেন। লেনিনের আগ্রহ ও পরামর্শে রায় গ্রন্থটি রচনায় উৎসাহিত হন। তাতে তিনি বিস্তর তথ্যের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটে, তার ফলে ইংরেজরা উপনিবেশের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি আস্থা প্রদর্শনস্বরূপ তাদের মাথা তোলবার সুযোগসুবিধা দেবে। ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার Indian Industrial Commission গঠন করেন এবং সে-সময়ে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা হয়।

কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রায় সমসময়ে ভারত থেকে দলে দলে মুসলিম মুহাজির আফগানিস্তান, সোভিয়েত তুর্কিস্তান প্রভৃতি মুসলিম অধ্যুসিত দেশে উপস্থিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তুরস্কে খলিফার অবমাননার প্রতিবাদে তারা তখন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে উন্মুখ। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে মানবেন্দ্রনাথ তাদের নিয়ে একটি সেনাদল গঠন এবং আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে ভারত অভিযানের এক পরিকল্পনা করেন। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তিনি তাসখন্দে উপস্থিত হন এবং একটি সামরিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু আফগান সরকারের প্রতিবন্ধকতায় সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। রায় তখন নির্বাচিত কিছু সংখ্যক মুহাজিরকে নিয়ে মস্কোয় ফিরে যান এবং তাদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণের জন্যে Communist University of the Toilers of the East নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। তাসখন্দে অবস্থানকালে রায়ের সবচেয়ে বড়

উল্লেখযোগ্য কাজ হল ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা (১৭ অক্টোবর, ১৯২০)। পার্টি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অন্যান্য ছজন সহযোগীর মধ্যে ছিলেন স্ত্রী এভলিন, মহম্মদ আলি, অবনি মুখার্জী ও তাঁর স্ত্রী রোসা, শফিক সিদ্দিকী এবং তিরুমল আচারিয়া।[৮]

প্রবাসে গঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদর দপ্তর ১৯২২ সালে বার্লিনে স্থানান্তরিত হয়। সেখান থেকে তিনি 'ভ্যানগার্ড' (পরে 'অ্যাডভান্স গার্ড'-এ নামান্তরিত) পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন। স্বদেশে যুগান্তর ও অনুশীলন দলের পুরোনো সহকর্মী এবং বামপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পত্র বিনিময়, 'ভ্যানগার্ড' সমেত কয়েকটি প্রচারপুস্তিকা এবং বিভিন্ন দূত মারফৎ তিনি ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনা করেন। কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনের (১৯২১) আগে নলিনী গুপ্তকে সংযোগ ও সংগঠনের কাজে তিনি ভারতে পাঠান। প্রায় একই সময়ে পাঠানো হয় রায়ের তাসখন্দ সামরিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সৌকত উসমানিকে। উসমানি বেনারস ও কানপুরে পার্টিকেন্দ্র গঠন করেন। ইতিপূর্বে বোম্বাইতে এস. এ. ডাঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে একটি বামপন্থী গোষ্ঠী তৈরি করে 'সোসালিষ্ট' নামে একটি পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেছিলেন। বঙ্গে মুজফফর আহমদ এবং মাদ্রাজে সিঙ্গারভেলু চেট্টিয়ার শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। নলিনী গুপ্ত মুজফফর আহমদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চার্লস অ্যাসলে নামক এক ব্রিটিশ কমিউনিস্টের মাধ্যমে রায় বোম্বাইতে ডাঙ্গে এবং অন্যান্যদের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।[৯]

রায়ের নিরন্তর প্রয়াসের ফলে ১৯২২ সালের মাঝামাঝি কলকাতা (আহমদ), বোম্বাই (ডাঙ্গে), মাদ্রাজ (চেট্টিয়ার), পাঞ্জাব (গোলাম হোসেন) এবং উত্তর প্রদেশে (উসমানি) কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে ওঠে। ইউরোপের বিভিন্ন শহর থেকে প্রেরিত 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থাদির মাধ্যমে রায়ের কর্মসূচি ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় প্রচার লাভ করে। বঙ্গে বিপ্লবীদের 'আত্মশক্তি', 'ধূমকেতু', 'দেশের বাণী' ছাড়াও দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা', বোম্বাইতে 'সার্ভ্যান্ট' ও ডাঙ্গে সম্পাদিত 'সোসালিষ্ট' এবং লাহোরে 'ইনকিলাব' ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় রায়ের 'ভ্যানগার্ড' থেকে সংবাদ ও নিবন্ধাদি উদ্ধৃত হত।

মানবেন্দ্রনাথের গোপন কর্মকাণ্ড এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্রমবিস্তারে ব্রিটিশ সরকার সচকিত হয়ে ওঠে। অচিরে আহমদ, উসমানি ও হোসেন ধরা পড়েন (১৯২৩) ও কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হন (১৯২৪)। উত্তর প্রদেশে উসমানির দায়দায়িত্ব তাঁর সহযোগী সত্য ভক্তের উপর গিয়ে পড়ে। সত্য ভক্ত কানপুরে ১৯২৪ সালে ভারতের মাটিতে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯২৫ সালে তিনি কানপুরে অনুষ্ঠিত এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে

বিভিন্ন কমিউনিষ্ট গ্রুপকে সমন্বিত করতে সমর্থ হন।

কারামুক্তির পরে মুজফফর আহমদ যদিও উক্ত সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় কানপুরে গঠিত পার্টি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনায় বলেন—"the communist conference in Kanpur was a disgraceful affair."[১০] কারণ সত্য ভক্ত ও তাঁর অনুগামীরা কমিন্টার্ন ও রায়ের নেতৃত্ব মানতে অনিচ্ছুক এবং গোপন ক্রিয়াকর্মের বিরোধী ছিলেন। কমিন্টার্নের প্রতিবেদনেও সত্য ভক্ত প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তীব্র নিন্দা করা হয় এই বলে—"a bogus Indian Communist Party was founded by very questionable elements."[১১]

পরের বছর থেকে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির ফিলিপ স্প্র্যাট, সাকলাতওয়ালা প্রমুখ প্রতিনিধিরা ভারতে এসে পার্টিকে সংগঠিত করেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন রায়ের বিপক্ষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। বস্তুত এই সময় থেকে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ক্রমশ রায়ের হাত থেকে চলে গিয়ে ব্রিটিশ পার্টির উপর বর্তাতে শুরু করে।

কানপুরে কমিউনিস্ট সম্মেলনের কিছুকাল আগে স্বরাজ্য দলের কার্যকলাপে বিক্ষুব্ধ বামপন্থীরা কলকাতায় লেবার স্বরাজ পার্টি নামে একটি দল গঠন করেন। 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' নামে দুটি মুখপত্রে দলের নীতি ও কর্মপন্থা প্রচারিত হত। ১৯২৭ সালে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল নামে সেটির নতুন নামকরণ হয়। ক্রমে সারা ভারতে দলের কিছু কিছু শাখা গড়ে ওঠে। এবং সেটি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি নামে অভিহিত হয়। বস্তুত এই ধরনের প্রকাশ্য শ্রমিক ও কৃষক দলের অন্তরালে এবং গোপনে সক্রিয় থাকার জন্যে কমিউনিস্টদের প্রতি মানবেন্দ্রনাথের ছিল দীর্ঘকাল পূর্বের নির্দেশ। তিনি মুজফফর আহমদ ও নলিনী গুপ্তকে ঐ পার্টিতে যোগদান করতে বলেন। চরমপন্থী ও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে তিনি মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা-সম্পন্ন সনাতন সংস্কারবাদীরূপে দেখেছিলেন। বিকল্প রাষ্ট্রদর্শন হিসাবে তিনি সে-সময়ে মার্কসবাদী আদর্শকে তুলে ধরেন।

১৯২৩ সালে প্রকাশিত *India's Problem and its Solution* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ তদানীন্তন ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন। তখন তিনি পুরোপুরি মার্কসবাদী। গান্ধীর মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও রক্ষণশীল নেতৃত্বের তিনি সমালোচনা করেন। আহমেদাবাদ কংগ্রেসের (১৯২১) সিদ্ধান্ত তাঁর কাছে সংগ্রামী শক্তির প্রতিকূলে বুর্জোয়া স্বার্থ সংরক্ষণের পরাকাষ্ঠারূপে প্রতিপন্ন হয়। বার্দোলি তালুক কংগ্রেসে (১৯২২) গৃহীত গান্ধীর গঠনমূলক সংগ্রাম নীতিরও তিনি সমালোচনা করেন। তাই তিনি আহমেদাবাদ কংগ্রেস হবার আগে মস্কো থেকে একটি আদর্শ কর্মসূচি প্রেরণ করেছিলেন।

কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন হয়েছিল চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে গয়া শহরে (১৯২২)। আপাতদৃষ্টিতে বামপন্থী চিত্তরঞ্জনের কাছে মানবেন্দ্রনাথের ছিল মস্ত প্রত্যাশা। তাই রায় গয়া কংগ্রেসে সংগ্রামী আন্দোলনের এক কর্মসূচি পাঠান মস্কো থেকে নলিনী গুপ্তর মাধ্যমে। *What do we want* নামে এক প্রচার পুস্তিকায় স্বরাজের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত সে-বিষয়ে একটি চিত্র তুলে ধরেন। তাতে পূর্ণ স্বাধীনতা, ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময়সীমা নির্ধারণ এবং সংগ্রামী গ্রাম সমিতি গঠনের সুপারিশ করা হয়। বলা বাহুল্য দেশবন্ধু তথা কংগ্রেসের নেতৃবর্গের উপর মানবেন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রামী প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হন। দেশবন্ধু সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্তি নিরসন হতে অবশ্য আরো কিছু সময় লাগে। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে বিশেষ করে বেলগাঁও অধিবেশনে (১৯২৪) মানবেন্দ্রনাথের অনুরূপ প্রচার ও প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নি।

১৯২৩ সালে প্রকাশিত *One year of Non-Co-operation* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর গণঅভ্যুত্থান প্রয়াসের সমালোচনা প্রসঙ্গে তার লাভ ও ক্ষতির দিকগুলি বিশ্লেষণ করেন। লাভের দিক সম্পর্কে তিনি বলেন: ১. রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনার্থে জনশক্তির বোধন ও ব্যবহার; ২. কংগ্রেসের ঐক্য সাধন; ৩. রাজশক্তির নিপীড়ন থেকে গণশক্তিকে রক্ষার নিমিত্ত অহিংসার ধ্বনি তোলা; ৪. অসহযোগ কর্মপন্থার মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন ও কর প্রদানে অস্বীকার।

ক্ষতির দিকগুলি সম্পর্কে বলেন: ১. জনসমর্থন অর্জনকল্পে উপযোগী অর্থনৈতিক পথপ্রদর্শনে গান্ধীর ব্যর্থতা; ২. গান্ধীবাদে শোষক ও শোষিত, জমিদার ও কৃষক, মালিক ও শ্রমিককে সমন্বিত করার অর্থহীন প্রয়াস; ৩. রাজনীতিতে ধর্মের প্রবর্তন—আধ্যাত্মিকতার ভাবাদর্শে রজনৈতিক গতিশীলতার অবরোধ; ৪. প্রগতিবিরোধী চরকাতত্ত্বের প্রবর্তন; ৫ গান্ধীবাদ দুর্বল, দ্বিধাগ্রস্ত ও সংস্কারপন্থী—তাতে বিপ্লবের স্থান নেই—বড়লাটের সঙ্গে গান্ধীর বারংবার দেখাসাক্ষাৎ তাঁর অব্যবস্থিতচিত্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মনের পরিচায়ক।

১৯২৬ সালে প্রকাশিত *Future of Indian Politics* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথ ভারতে একটি জনগণের পার্টি (People's Party) গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। স্বরাজ্য দলের বিলোপ, দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং রাজনীতির পরিবর্তে গঠনমূলক কাজে গান্ধীর আত্মনিয়োগের ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দেশের সংগ্রামী শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। তাঁর প্রস্তাবিত সেই পার্টির নেতৃত্ব সর্বহারা শ্রেণীর অধীনে রাখার কথা বলা হলেও অন্যান্য শ্রেণী যথা বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, কৃষক, ছোটখাট ব্যবসায়ী প্রভৃতিকেও অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা হয়। তাঁর কর্মপন্থা অনুযায়ী বিপ্লবীদের কাজ

হবে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে গণতান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয় বিপ্লবে উপযোগী করে তোলা। প্রস্তাবিত পার্টিরই হবে এই কাজ। তাঁর দৃষ্টিতে স্বরাজ্য দল সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রের প্রতিভূ হয়ে পড়ে। দেশের মুক্তি-আন্দোলনকে জনসাধারণের স্বার্থ ও কর্তৃত্বাধীনে আনাই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু বিলাতি ধাঁচের লেবার পার্টি গঠনের তিনি বিরোধী ছিলেন।

কমিন্টার্ন-এর সঙ্গে বিচ্ছেদের (১৯২৯) পূর্বে মানবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল কমিন্টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর চীন-বিপ্লবে নেতৃত্ব গ্রহণ। এই সময়ে চীনদেশে বিপ্লব চলেছিল। কমিউনিস্টদের সাহচর্যে কুওমিন্‌টাং দল ছিল বিপ্লবের পরিচালক। দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিত্তিতে ঐ দল দুটি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল; পুঁজিপতি, মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক এই চারটি শ্রেণী সেই সংগ্রামী আন্দোলনে যুক্ত হয়।

চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টি ও কুওমিন্‌টাং-এর পিছনে ছিল কমিন্টার্নেরই নির্দেশ। সে-সময়ে কমিন্টার্নের প্রতিনিধি হিসাবে মাইকেল বোরোদিনকে বিপ্লবের তত্ত্বাবধান ও পরামর্শদানের জন্য চীনে পাঠানো হয়। ১৯২৬ সালে কমিউনিস্ট-কুওমিন্‌টাং ঐক্যে ভাঙন ধরে। ঐ বছর মার্চ মাসে চিয়াং-কাই-শেক কমিউনিস্টদের ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করে দেন। তখনও তর্ক চলেছিল কমিউনিস্টরা কুওমিন্‌টাং-এর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকবে কিনা? কমিন্টার্নে এবিষয়ে বাদবিতণ্ডার ঝড় বয়ে চলে। চীন থেকে আসছিল পরস্পরবিরোধী নানা সংবাদ। শেষে স্থির হয় যে কুওমিন্‌টাং থেকে কমিউনিস্টরা বেরিয়ে আসবে; তবে তারা বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে মিতালি বজায় রাখবে। তবুও অবস্থার উন্নতি হয় না। নভেম্বরে কমিন্টার্নের কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠক বসে। তাতে সমগ্র পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে একটি নতুন নীতি নির্ধারিত হয় এবং সেই নীতিকে কার্যকর করার জন্যে মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি-দলকে চীনদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয়। তিনি তখন কমিন্টার্নের প্রেসিডিয়াম ও চীন কমিশনের সদস্য। চীনের অভিজ্ঞতা মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *Revolution and Counter-Revolution in China* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টি কমিন্টার্নের নতুন কর্মপন্থা রূপায়ণ করে নি। স্বভাবতই তাদের পক্ষে কমিন্টার্নের প্রতিনিধি মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার ও সহযোগিতা করা সম্ভব ছিল না। এমনকি কমিন্টার্নের পূর্বপ্রেরিত প্রতিনিধি ও একদা দীক্ষাগুরু বোরোদিনের সঙ্গেও তাঁর মতভেদ প্রকট হয়ে পড়ে। চীন সে-সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি স্বতন্ত্র প্রশাসনে খণ্ডিত। বোরোদিন চেয়েছিলেন কুওমিন্‌টাং-এর বামপন্থী গোষ্ঠীর সহযোগে দ্বিতীয়-বার উত্তর চীনে পিকিং অভিমুখে অভিযান করা এবং তদবধি মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত 'Agrarian Revolution'-কে স্থগিত রাখা। মানবেন্দ্রনাথ সেই

অভিযান-পরিকল্পনার অপরিণামদর্শিতা উপলব্ধি করে সহকর্মীদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন—

Right now we have only to cope with Chiang Kai-Shek. But we are running from him into unknown territories, where in all probability we will have to encounter many men like him··· The Chinese Revolution will either win as an agrarian revolution or it will not win at all.

বোরোদিন ও চৈনিক কমিউনিস্ট নেতাদের বিরোধিতা করে তিনি একটি বিকল্প কর্মপন্থা উপস্থাপিত করেন—

...an organisation, concentration and consolidation of revolutionary forces by (1) pressing the agrarian revolution, (2) establishing peasant power in the villages, (3) creating a revolutionary army that would not be merely a creature of landowning generals.[১১]

১৯২৭ সালের মে মাসে হ্যানকৌতে অনুষ্ঠিত চৈনিক কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে এই মতবিরোধের একটা নিষ্পত্তি হয়। দীর্ঘ আলোচনা ও বাদানুবাদের পর মানবেন্দ্রনাথের অভিমত গৃহীত হয়। কিন্তু তখনও কিছু সংখ্যক সদস্যের মনে চাষীমজুরের স্বতন্ত্র সংস্থা গঠনের ফল হিসাবে কুওমিনটাং-এর বামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে বিচ্ছেদবেদনা কাটে না। ইতিমধ্যে নানা জায়গায় কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু কমিউনিস্টরা নিষ্ক্রিয় থাকে। কুওমিনটাং-এর বামপন্থী প্রগতিশীল সামরিক কর্তৃপক্ষ নির্মমভাবে কৃষক বিদ্রোহ দমন করে। মানবেন্দ্রনাথ তখনও কমিউনিস্টদের মতিগতি ফেরাবার শেষ চেষ্টা করেন। বিফল হয়ে উপায়ান্তর না দেখে তিনি মস্কোয় স্টালিনের পরামর্শ চান। স্টালিন টেলিগ্রাম করে রায়ের কর্মপন্থা সমর্থন করেন। কুওমিনটাং-এর বামপন্থী নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্টদের কৃষক বিদ্রোহের জন্যে অভিযুক্ত করে এবং দক্ষিণপন্থী চিয়াং-কাই-শেকের সঙ্গে নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে নিয়ে কমিউনিস্ট নিধন শুরু করে দেয়। জুলাই মাস নাগাদ কমিউনিস্টরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মানবেন্দ্রনাথ ও বোরোদিনকে ফিরে যাবার জন্যে মস্কো থেকে নির্দেশ আসে। মস্কোয় ফিরে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর সদর দপ্তর বার্লিনে চলে যান।

চীন বিপ্লবের ব্যর্থতা পরোক্ষে মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে কমিন্টার্নের বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। চীন থেকে ফেরার পর বছর দেড়েক কেটে যায়। চৈনিক ব্যর্থতার সঙ্গে নিজে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকায় স্টালিন মানবেন্দ্রনাথকে সরাসরি অভিযুক্ত করেন নি। তাছাড়া মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ছিল বিশেষ বন্ধুত্ব। চীনের ব্যাপারে মানবেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন স্টালিন তাঁকে সমর্থন করবেন,

কিন্তু ট্রটস্কির বলবুদ্ধির আশঙ্কায় স্টালিন প্রকাশ্যে কিছু তুলতে চান নি। স্টালিনের দেখা না পেয়ে ও তাঁর হাবভাব সুবিধাজনক নয় বুঝে মানবেন্দ্রনাথ গোপনে বার্লিন চলে যান।

১৯২৭ সালে চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বিশ্ববিপ্লবের কৌশল ও কর্মপন্থা এবং ভারতে কমিউনিস্টদের ভূমিকা সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তায় এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়, যার ফলে তিনি পূর্ব অনুসৃত উগ্র এবং অসহিষ্ণু মনোভাব ক্রমে পরিত্যাগ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তিনি প্রত্যক্ষ করেন ফ্যাসিবাদী শক্তির দুর্নিবার উত্থান। সেজন্য তিনি সোসাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে বৈরিতার পরিবর্তে যুক্তফ্রন্ট গঠনের জন্য কমিউনিস্টদের পরামর্শ দেন। তখন তিনি কমিন্টার্নের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় কংগ্রেসে রায়ের পূর্বতন উগ্র কর্মপন্থার সুর স্টালিনের কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হয়। অন্যদিকে ভারতে তখন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছিল। কংগ্রেসে জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রমুখ বামপন্থী নেতৃবৃন্দের প্রভাবে সংগ্রামী আবেগ ও চেতনার বিস্তারও মানবেন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ এবং ভারতশাসন সংস্কারসূত্রে আগত সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ আন্দোলন মানবেন্দ্রনাথকে চমৎকৃত করে। তিনি তাই কংগ্রেসের ভিতরে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগে বামপন্থী নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

ভারতে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে নেতিবাচক আন্দোলনের পরিবর্তে মানবেন্দ্রনাথ একটি গঠনমূলক বৈপ্লবিক কর্মপন্থা সুপারিশ করেন। বার্লিন থেকে প্রতি মাসে প্রকাশিত তাঁর 'দি মাসেস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮) মানবেন্দ্রনাথ সাইমন কমিশন বয়কটের বিকল্প কর্মসূচি হিসাবে ভারতের গাঁয়ে-গঞ্জে ও শহরে ফরাসি বিপ্লবের ধাঁচে 'কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লি গঠন এবং সেগুলির সমন্বিত শক্তির সাহায্যে পালটা সরকার পরিচালনার নির্দেশ দেন, কালক্রমে যাতে ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করা যায়।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে মস্কোয় কমিন্টার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব কংগ্রেস বসে। অসুস্থতা ও অস্ত্রোপচারের জন্য মানবেন্দ্রনাথ সে-অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। চীনের বিষয় নিয়ে মানবেন্দ্রনাথকে না ঘাঁটিয়ে তাঁর Decolonisation Theory-কে বিকৃত করে দাঁড় করিয়ে তাঁকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, রায়ের প্রসঙ্গ না তুলে ব্রিটেন ও এশিয়ার প্রতিনিধিরা প্রায় একবাক্যে উক্ত থিওরির অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ষষ্ঠ কংগ্রেস কমিন্টার্ন অনুসৃত পূর্বের যুক্তফ্রন্ট নীতি বর্জন এবং উগ্র বামপন্থী নীতি গ্রহণ করে। মানবেন্দ্রনাথ ভারত ও অন্যান্য অনগ্রসর দেশের পটভূমিকায় ঐ নব্যনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। জার্মানিতে কমিন্টার্নের সরকারি নীতির বিপক্ষ

ব্র্যান্ডলার থালহাইমার গোষ্ঠীর মুখপত্র 'গেগেন ডেন স্ট্রম' প্রভৃতি পত্রিকায় মানবেন্দ্রনাথের স্বাধীন মতামত প্রকাশিত হওয়ায় তিনি কমিন্টার্ন থেকে বহিষ্কৃত হন (সেপ্টেম্বর, ১৯২৯)।[১৩] এখানেই তাঁর কমিউনিস্ট জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাঁকে কমিউনিস্টরা তখন শুধু পরিত্যাগ ও একঘরেই করল না—উপরন্তু তাঁর বিরুদ্ধে শুরু করল কুৎসার অভিযান।

১৯২৮ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক হারে শ্রমিক ধর্মঘট দেখা দেয়। করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ প্রবল হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশন মণ্ডপের সামনে বিরাট শ্রমিক সমাবেশ সংগ্রামী বামপন্থী শক্তির পরিচয় দেয়। অন্যদিকে কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) তখন ভারত-নীতি নিয়ে চলেছিল মস্ত বিতর্ক। উক্ত অধিবেশনে গৃহীত এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিন্টার্ন ভারতে ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজ্যান্টস পার্টি ভেঙে দিয়ে সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টির অধীনে কেবল শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণসংগ্রাম এবং সেইসঙ্গে পেটি বুর্জোয়া বামপন্থী নেতৃবর্গসহ সমগ্র কংগ্রেসের মুখোস খুলে দেবার নির্দেশ পাঠায়। ভারতে ওয়ার্কার্স পার্টির তখন কলকাতায় সর্বভারতীয় সম্মেলন চলেছিল। সম্মেলন মানবেন্দ্রনাথের নির্দেশই অনুসরণ করে। কমিন্টার্নের সিদ্ধান্ত তখনও জানা ছিল না। বিলম্বে কমিন্টার্নের সদ্য গৃহীত সিদ্ধান্ত এসে পেঁছিলে সম্মেলন নতুন কর্মপন্থা গ্রহণ করে। সম্মেলনের শেষে সরকারি নির্দেশে আচম্বিতে ৩১ জন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দীর্ঘসূত্রী মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের অল্পবিস্তর মেয়াদে বন্দী করা হয়। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলন এই সময় থেকে দীর্ঘকালের জন্যে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

মানবেন্দ্রনাথের আশা ছিল কমিন্টার্ন একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে ও অন্যান্য বিশিষ্ট কর্মীদের ফেরার পথ খুলে দেবে। ১৯৩৫ সালে কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসের পুনরায় কর্মপন্থার হেরফের হয় এবং শেষাবধি মানবেন্দ্রনাথের পূর্ব প্রস্তাবিত নীতিই গৃহীত হয়। কিন্তু মানবেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের ফিরে যাবার আহ্বান জানানো হয় না।

মানবেন্দ্রনাথ নিষ্ক্রিয় রইলেন না। ১৯২৯ সালে লাহোরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তিনি কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরিত এক বার্তায় বিপ্লবী কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য আবেদন জানান।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট চক্রান্তররূপে অভিহিত মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় (১৯২৯) দেশের বিপ্লবী কর্মীরা অনেকেই কারারুদ্ধ হন। বিদেশে থাকায় এই চক্রান্তের প্রকৃত নায়ক মানবেন্দ্রনাথকে তখন ধরা যায় নি। দেশের রাজনীতির আবহাওয়া ছিল খুবই মন্দা। সেই সময়ে বন্ধুদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে ইউরোপ থেকে ১৯৩০ সালে গোপনে তিনি ভারতে চলে আসেন। বিভিন্ন

ছদ্মনামে তিনি দেশের সর্বত্র ঘুরে জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেসে জওহরলালের উদ্যোগে প্রথম আমূল পরিবর্তনকামী একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাবের পিছনে মানবেন্দ্রনাথের বিশেষ প্রভাব ছিল বলে ইদানীং কোনো কোনো গবেষকের দৃঢ় বিশ্বাস।

সেই সময়ে বিভিন্ন ছদ্মনামে আত্মগোপন করে মানবেন্দ্রনাথ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলেন। রায় গ্রুপ নামে অভিহিত তাঁর অনুগামীরা কমিটি অফ অ্যাক্শন ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ ইন্ডিয়া নামে একটি গোপন দলের মাধ্যমে বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত থাকেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একাদিক্রমে প্রকাশিত কয়েকটি সাময়িকপত্র ও বহুবিধ প্রচারপত্রের সাহায্যে উক্ত দল নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে। সুভাষচন্দ্র যে-সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি হন (১৯৩১) সে-সময়ে তাতে রায়পন্থীদের ছিল বিশেষ আধিপত্য।

১৯৩১ সালের ২১ জুলাই মানবেন্দ্রনাথকে সরকার গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়। কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁকে ছবছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রায়পন্থীরা তাঁদের গুপ্ত রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি গঠনের সময়ে রায়পন্থীদের একাংশের ছিল বিশেষ ভূমিকা।

১৯৩৬ সালে কারামুক্তির পর মানবেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগদান করেন। গান্ধীর সঙ্গে রায়ের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে ফৈজপুর কংগ্রেসের (১৯৩৬) প্রাক্কালে। রায় তাঁর পূর্বতন কমিউনিস্ট জীবনের গোড়া থেকেই গান্ধীনীতির তীব্র সমালোচক হিসাবে সুপরিচিত। ১৯২৪ সালে ২১ আগস্ট 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধী বলশেভিকবাদ সম্পর্কে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার প্রতিবাদে মানবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি প্রবন্ধ গান্ধী ৬ জানুয়ারি ১৯২৫ তারিখের 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-তে প্রকাশ করেন। ফৈজপুর কংগ্রেসের আগে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পরে গান্ধী তাঁর প্রার্থনসভায় যোগদানের জন্যে রায়কে আহ্বান জানান। প্রার্থনায় আস্থা না থাকায় রায় সে-আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। গান্ধী বুঝেছিলেন রায় তাঁর মূলেই আঘাত করতে চান। সেইকারণে গান্ধী তাঁর আশ্রমবাসীদের রায়কে এড়িয়ে চলার উপদেশ দেন। কংগ্রেসের বিস্তর কর্মী রায়ের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসকে বিপ্লবী আদর্শে সক্রিয় ও গণতান্ত্রিক করে তোলার প্রয়াসী হন এবং 'ইন্ডিপেনডেন্ট ইন্ডিয়া' (বর্তমান নাম 'র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট') পত্রিকা বের করেন। তাঁর সঙ্গে ক্রমে গান্ধীর বিরোধ বাড়ে। গান্ধীনীতিকে তিনি কায়েমী পুঁজিবাদী শোষণের প্রচ্ছন্ন পন্থারূপে দেখেছিলেন। সত্যাগ্রহের আধ্যাত্মিক ও দিব্য প্রত্যয় মানবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেন নি।

সমকালীন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে রায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, দেশের অধিকাংশ মানুষ যতদিন যুক্তিবিমুখ, ধর্মান্ধ এবং নানাবিধ আপ্তবাক্য ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকবে ততদিন দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে উক্ত মানসিকতা হবে মস্ত অন্তরায়। তিনি অনুভব করেন যে, রাজনৈতিক বিপ্লবের আগে দরকার একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব। তাই তিনি তাঁর রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে চেয়েছিলেন একটি রেনেসাঁস আন্দোলন গড়ে তুলতে। কারাজীবন থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন এর উপযোগী গ্রন্থাদি রচনা।

১৯৩৯ সালে তিনি কংগ্রেসের ভিতরে লীগ অফ র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন নামে একটি উপদল গঠন করেন এবং কংগ্রেসে বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানান। রামগড় কংগ্রেসে (১৯৪০) সভাপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি মৌলানা আজাদের কাছে পরাজিত হন। ইতিপূর্বে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল (১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। যুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবর্গের আমূল মতপার্থক্য দেখা দেয়। সাতটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা পরিত্যাগের তিনি বিরোধিতা করেন। যুদ্ধনীতি সম্পর্কে বিরোধের ফলেই তিনি কংগ্রেস ছেড়ে র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করেন। সেই সঙ্গে তাঁর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনরূপে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব লেবার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের ঈপ্সিত গতিপথ ও শ্রেণী-সম্পর্ক বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *Scientific Politics* গ্রন্থে ফরাসি বিপ্লবে জ্যাকোবিন-দের ভূমিকা এদেশে অনুসরণের সুপারিশ করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবে জ্যাকোবিনদের ভূমিকা ছিল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, এবং তাদের সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের পুরোগামী বলা হয়। বিপ্লবের মার্কসবাদী প্রত্যয় অনুযায়ী ভারতে প্রথমে একবার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তারপরে প্রস্তাবিত প্রলেটারিয়েট বিপ্লবের পরিবর্তে উভয়ের সমন্বয়ে মানবেন্দ্রনাথ এক স্বতন্ত্র পথের নির্দেশ দেন—তাকে তিনি "বিশ শতকের জ্যাকোবিনিজম" নামে অভিহিত করেন। তাতে বলা হয়: ১. ভারতীয় বিপ্লব সর্বশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত হবে, কেবল মুষ্টিমেয় প্রলেটারিয়েটের নেতৃত্বে নয়; ২. ভারতীয় বিপ্লব প্রথমে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক এবং পরে প্রলেটারিয়েট বিপ্লব না হয়ে দুইয়েরই সংমিশ্রণে সোসালিষ্ট বিপ্লব হওয়াই সুবিধাজনক ও বাঞ্ছনীয়। মার্কসবাদী হয়েও সে-সময়ে মানবেন্দ্রনাথ মার্কসীয় চিন্তাকে যে নির্বিচারে গ্রহণ করেন নি এই বিশ্লেষণই তার অন্যতম প্রমাণ।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে মানবেন্দ্রনাথ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষকে নিঃশর্ত সমর্থনের আহ্বান জানান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বা বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিছক একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ

হিসেবে দেখেন নি। তিনি বুঝেছিলেন যে বিপর্যয়কারী সেই যুদ্ধ বিশ্ব-ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দেবে। বিশ্বব্যাপী সেই সর্বনাশা যুদ্ধকে তিনি আন্তর্জাতিক গৃহযুদ্ধরূপে অভিহিত করেন। কোনো দেশ বা জাতিকে তিনি শত্রুরূপে দেখেন নি—দেখেছিলেন ভয়াবহ ও সর্বগ্রাসী এক মতবাদ—সে-মতবাদ হল ফ্যাসিবাদ। তাঁর মতে ফ্যাসিবাদের জয় হলে মানব সভ্যতারই হবে চরম বিনাশ। তিনি আরো বলেছিলেন যে ফ্যাসিবিরোধী সেই যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদও তার শক্তি হারাবে এবং যুদ্ধোত্তরকালে পরাধীন উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা অনিবার্যভাবেই আসবে। *India and War* গ্রন্থে মানবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ সম্পর্কে চিন্তার বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়।

ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনে মানবেন্দ্রনাথ কোনো দলের সমর্থন পান নি। ফলে তিনি তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেন। ১৯৪১ সালে জার্মান বাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা রায়ের অনুকরণে যুদ্ধকে সমর্থন জানায়। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মিত্রশক্তির অনুকূল হয়ে ওঠে তখন ভারতের যুদ্ধোত্তর স্বাধীনতা অনিবার্য বলে মনে করে রায় জনস্বার্থের উপযোগী সুষ্ঠু অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য *People's Plan* (১৯৪৪) নামক একটি পরিকল্পনা প্রচার করেন। সেই সময়ে ভারতীয় পুঁজিপতিরাও যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করে। বোম্বাই প্ল্যান নামে খ্যাত সেই পরিকল্পনাকে মানবেন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী একচেটিয়া স্বত্বের ফ্যাসিবাদী পরিকল্পনা বলে অভিহিত করেন।

বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনকে মানবেন্দ্রনাথ নিন্দা করে বলেন যে, জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতিবিদ্বেষে এমনই জর্জর যে তাঁরা বোঝেন নি ইংরেজ পরাজিত হলে ফ্যাসিবাদ দুনিয়ায় আধিপত্য করবে। কংগ্রেস ও জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে তিনি ফ্যাসিবাদী বলতেও কুণ্ঠিত হন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তির (Axis Powers) পক্ষে অনুকূল আচরণে তাঁরা সে-কথাই দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন বলে তিনি মনে করতেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে বাধা দেওয়া হয়। তিনি দেখান যে, রণক্ষেত্র যতদিন দূরে ছিল ততদিন ভারতীয় পুঁজিপতিরা যুদ্ধে মাল সরবরাহ করে দুহাতে পয়সা লুটেছে, আর রণক্ষেত্র যখন ঘরের পাশে এগিয়ে এসেছে তখন তারা আপৎকালীন অধিক ত্যাগ ও ক্ষতির ভয় এবং বিজেতাদের সম্ভাব্য প্রতিশোধের আশঙ্কায় যুদ্ধ প্রচেষ্টা থেকে সরে এসে কংগ্রেসের পিছনে অবিলম্বে স্বাধীনতার দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে। নিরক্ষর, মূঢ়, ধর্মান্ধ দেশবাসীর আবেগ ও উন্মাদনার সুযোগ নিয়ে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের কাজ হাসিলে তৎপর হয়। মানবেন্দ্রনাথ ভারতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া চরিত্র উদঘাটনে তৎপর হন। তাঁর মতে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসকে তোয়াজ করে

প্রতিবিপ্লবের পথ সুগম করে দেয়।

বিশ্বমহাযুদ্ধের গতি ক্রমেই মিত্রপক্ষের অনুকূল হয়ে ওঠায় মানবেন্দ্রনাথের পূর্বপ্রত্যয় আরও দৃঢ় হয় যে যুদ্ধোত্তরকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি উপনিবেশ ছেড়ে চলে যাবেই। কারণ দেশের উদ্বৃত্ত মূলধন উপনিবেশে বিনিয়োগ করাই হল তার চারিত্রিক লক্ষণ; রাজনৈতিক শাসন তার লক্ষ্য নয়; বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের শিল্পবাণিজ্যের বিপর্যয় ও বিপুল দায়দেনা তাকে শক্তিহীন করে দেয়। পরিত্যক্ত শাসনক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর পরিবর্তে যাতে জনগণের হাতে আসে তাই মানবেন্দ্রনাথ সেদিন ভারতের বামপন্থী দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানান এবং জনস্বার্থের উপযোগী *Constitution of Free India* (১৯৪৪) নামে একটি খসড়া সংবিধান প্রচার করেন। মানবেন্দ্রনাথের আহ্বানে কোনো বামপন্থী দলই সেদিন কর্ণপাত করে নি। যুদ্ধোত্তর প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মানবেন্দ্রনাথের পার্টি এককভাবে ভারতের সর্বত্র শক্তিশালী কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জাতীয়তা, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস ও রাজনৈতিক নিশ্চেতনার সুযোগে কংগ্রেস ও লীগই সেই নির্বাচনে জয়ী হয়। তাদেরই সম্মতিতে দেশকে দুভাগ করে ইংরেজ শাসক তাদের হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দিয়ে চলে যায়।

বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই মানবেন্দ্রনাথের ভাবজীবনে চলেছিল এক বিরাট আলোড়ন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে কী লিবার্যালিজম, কী মার্কসিজম কোনোটিতেই মানুষ নিরঙ্কুশ মুক্তির আস্বাদ পায় নি—সংসদীয় গণতন্ত্র ও শ্রেণী একনায়কত্ব দুই-ই অচল। ফ্যাসিস্টদের মতো কমিউনিস্ট দেশেও রাষ্ট্রের বেদীমূলে ব্যক্তিসত্তা উৎসর্গীকৃত হয়েছে। পরিশেষে তিনি যে মৌল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তার সঙ্গে এযাবৎকাল অনুসৃত মার্কসবাদী দর্শনের অসংগতি ফুটে ওঠে। মার্কস-উত্তর শতাব্দীকালে সম্প্রসারিত জ্ঞানবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, মার্কসবাদ অসম্পূর্ণ এবং সে-কারণে বর্তমানে অনুপযোগী। মার্কসবাদের বিরোধিতার পরিবর্তে মার্কসীয় দর্শনকে অতিক্রম করে মানবেন্দ্রনাথ র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম নামে এক নব্যদর্শনের প্রবর্তন করেন—যার মূল বিষয়-বৈশিষ্ট্য হল তিনটি: যুক্তি, নৈতিকতা ও মুক্তি। নতুন ইতিহাসতত্ত্ব ও দার্শনিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমবায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো এবং শ্রেণী ও পার্টির আধিপত্যমুক্ত সমাজের একটি সুস্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেন। তাঁর মূল বক্তব্য তিনি দেরাদুন নিদাঘ শিবিরে (১৯৪৬) উপস্থাপন করেন। মানবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের এই বার্ষিক রাজনৈতিক শিক্ষা-শিবিরের আয়োজন সেদিনের ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে একটি অনন্য নিদর্শন। রাজনীতিকে যুক্তিবিবর্জিত চিন্তা ও মেঠো বক্তৃতার আবেগ থেকে উদ্ধার করে বিচারবিতর্কের মাধ্যমে বিজ্ঞাননির্ভর করার সাধনা এদেশে

মানবেন্দ্রনাথের একক বৈশিষ্ট্য। সেই বছরেই তিনি দেরাদুনে ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সম্পাদনায় *Marxian Way* (পরে *Humanist Way*) নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

বাইশটি সূত্রে বিধৃত র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম দর্শনের প্রয়োগকালে অনুভূত হয় যে প্রকৃত গণতন্ত্রী সমাজে পার্টি-রাজনীতির প্রথা অচল। গতানুগতিক পার্টি-প্রথার মধ্যে দিয়ে মানবতন্ত্রী দর্শন ও রাজনীতির আন্দোলন সম্ভব নয়। কারণ তাতে পার্টির আধিপত্য ও ক্ষমতাদখলই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে শুভলক্ষ্যে পেঁছনোর তাগিদে অশুভ পথ অনুসরণেও আপত্তি থাকে না। ফলে সমাজ ও সাধারণ মানুষেরই হয় অকল্যাণ ও অধোগতি। তাই ১৯৪৮ সালে অনুষ্ঠিত শেষ অধিবেশনে মানবেন্দ্র-নাথ প্রতিষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ভেঙে দেওয়া হয়। সেই থেকে ঐ দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা কোনোরূপ সাংগঠনিক নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ না থেকে নানাভাবে সর্বক্ষেত্রে বহুমুখী কর্মতৎপরতার মধ্যে দিয়ে উক্ত আদর্শের প্রচারে উদ্যোগী হন। তাঁর দলহীন রাজনীতির আদর্শে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হন। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁদের অন্যতম। অনুরূপ প্রচেষ্টা যাতে অন্যান্য দেশেও বিস্তার লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে তিনি আন্তর্জাতিক সংযোগেরও সূচনা করেন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু (১৯৫৪) হওয়ায় জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজকে মানবেন্দ্রনাথ সুসম্পূর্ণ করে রেখে যেতে পারেন নি।

ইতিহাসচিন্তা

ইতিহাসকে মানবেন্দ্রনাথ মানুষের চিরন্তন মুক্তি-সংগ্রামরূপে দেখেছেন। তাঁর মতে মনুষ্যজীবনের সারবত্তা হল মুক্তির সন্ধান। পৃথিবীর বুকে মনুষ্য-জীবনের উৎপত্তিকাল থেকেই মানুষ প্রথমে জৈব অস্তিত্বের তাগিদে পারিপার্শ্বিকের আধিপত্য থেকে মুক্ত হবার জন্যে নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে; সেই জৈব সংগ্রাম-প্রবণতার ফলে মানুষ ক্রমে অজ্ঞানতার বন্ধন ছিন্ন করে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছে—মানুষের শিল্প-সংস্কৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় সাধনার পিছনে আছে তার সেই মুক্তির প্রেরণা—পশ্চাতে ঐশ ও আধ্যাত্মিক কোনো নির্দেশ নেই।[১৪]

মানুষকে তিনি নিয়মনিয়ন্ত্রিত (law-governed) জগতের অঙ্গরূপে বিচার করেছেন। নিশ্চেতন বিশ্বজগৎ হতে ক্রমবিবর্তনের আশ্রয়ে অবশেষে মানুষের মনোজগতের বিকাশ-প্রক্রিয়ায় একটি জৈব-বিবর্তন ঘটেছে; জড় থেকে চেতনার উৎপত্তি ও উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকলেও পরিণামে চেতনা এক

স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা অর্জন করেছে। পরিচিন্তন মানুষের একটি জৈব ক্রিয়া হলেও, চিন্তা ও চেতনা সামাজিক বিবর্তন-নির্ভর না হয়ে নিজ পথে অগ্রসর হয়েছে—বস্তুত পরিচিন্তন ও সমাজ-বিবর্তন যুগপৎ সমান্তরাল ধারায় বিকশিত হয়—একের দ্বারা অপরে প্রভাবিত হয়েছে। সমাজ-বিবর্তন নিয়মনির্দিষ্ট হলেও সমাজের স্রষ্টা হল মানুষ এবং সমাজ-বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করার জন্য মানুষ বিপ্লবের সাহায্য নেয়। চিন্তার বিকাশ সমাজ ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ নয়।[১৫]

মুক্তি ও সামাজিক অধিকার অর্জনের অন্তরায় অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করাই বিপ্লবের একমাত্র লক্ষ্য নয়। মানুষের সহজাত সম্ভাবনার বিকাশে বাধাস্বরূপ যে-কোনো সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নির্মূল করাই বিপ্লবের আদর্শ। ইতিহাসের যাত্রাপথে দেখা যায় অনেক সময়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা মানুষের দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ও সৃষ্টিশীল সত্তার প্রতিকূলতা করে। জৈব অস্তিত্বের সংগ্রাম-প্রক্রিয়ায় ক্রমবিকশিত প্রগতি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বিপ্লবের সাহায্যে ঐ সব অন্তরায়গুলিকে অপসারণের প্রেরণা যোগায়। নতুন দর্শনের আলোয় মানুষ নতুনতর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে।

মুক্তি ও সৃজনশক্তির আবেগসম্পন্ন মানুষের মনোভাবকে মানবেন্দ্রনাথ "রোমান্টিক" আখ্যা দিয়েছেন। বিপ্লব সেই অর্থে রোমান্টিক এবং যুক্তিসম্মতও বটে। যুক্তিপ্রবণতা মানুষের সহজাত একটি জৈব ধর্ম। যুক্তিনির্ভর মন থেকেই মুক্তির আবেগ ও ন্যায়পরায়ণতা উদ্ভূত হয়। ন্যায়নীতির পিছনে মানবেন্দ্রনাথ কোনো আধ্যাত্মিক অথবা দিব্য কারণের পরিবর্তে যুক্তিপ্রবণতাকেই উৎসরূপে বিশ্লেষণ করেছেন। মানবেন্দ্রনাথের রোমান্টিক বিপ্লবের প্রত্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিবহ ও নীতিসম্মত।

বস্তুবাদী মানবেন্দ্রনাথের কাছে বৈদান্তিক ভাববাদ যে গ্রহণযোগ্য ছিল না সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। শংকর ও রামানুজের ভাববাদকে তিনি মধ্যযুগীয় বদ্ধধারণাপ্রসূত এবং যুক্তিবিরোধী সূক্ষ্ম যুক্তিজাল (scholasticism) বলে অভিহিত করেছেন। মুক্তিপিয়াসী বৌদ্ধ মতবাদকে খর্ব করার জন্য ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় তাঁদের উত্থান ঘটে। বৌদ্ধধর্মে তিনি বৈপ্লবিক সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে বৌদ্ধরা পরাশ্রিত বিলাসব্যসন পরিহারের মনোবৃত্তি নিয়ে উন্নত ও উজ্জ্বল জীবনযাত্রার পথ অনুসরণ করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রয়াসকে দমন করে প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনরায় আধিপত্য অর্জন করে।[১৬] প্রাচীন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা যে তখনকার মুনি-ঋষি পরিবেষ্টিত সমাজজীবনে কেবল উচ্চ আধ্যাত্মিক মনোভাবই শুধু বিরাজ করত। তাঁর মতে তা সত্ত্বেও তখনকার সমাজে সাধারণ মানুষেরও একটা বিশেষ স্থান ছিল, যারা ঐহিক জীবনাচারকেই প্রাধান্য দিত। ভারতীয়দের মনে সাধারণত আর্য রক্তের গরিমা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নৃতাত্ত্বিক বিচারে

ভারতীয়দের সঙ্গে অনার্যদেরই মিল বেশি এবং আর্যদের আবির্ভাবের পূর্বে এখানকার অনার্য সভ্যতা অনেক বেশি উৎকর্ষ অর্জন করেছিল। সে-সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না।[১৭]

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পশ্চাতে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাবের প্রচলিত ব্যাখ্যা খণ্ডন করে তিনি দেখিয়েছেন যে, জেনোয়াতে ব্যবসাবাণিজ্যের চরমোৎকর্ষ সাধিত হলেও সেখানে রেনেসাঁসের চিন্তাশীল কোনো মানুষের উত্থান ঘটে নি, সেখানে মানবতন্ত্রী সাধনারও কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। একথা সেই যুগের শেষাশেষি ভিনিসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অথচ যে-ফ্লোরেন্সে রেনেসাঁসের মনীষীবর্গের জন্ম হয়েছিল, সেখানে ব্যবসাবাণিজ্যের তেমন বিকাশ হয়নি। সুতরাং বলা যায় রেনেসাঁসে উদ্ভূত মানবতাবাদের সঙ্গে বুর্জোয়া অভ্যুন্নতির কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল না। তাই এ-যুগের একদল ঐতিহাসিক ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ারূপে অভিহিত করেছেন। মানবেন্দ্রনাথের মতে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রেরণার উৎস ছিল প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সাংস্কৃতিক আদর্শ। সে-আদর্শ ছিল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ—তাই ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে তিনি আধুনিক সভ্যতা তথা মুক্তির দর্শন ও বস্তুবাদের বোধনরূপে দেখেছেন; রেনেসাঁস থেকেই পেয়েছেন তাঁর প্রেরণা।[১৮]

দ র্শ ন চি ন্তা

দর্শন সাধারণত দু-শ্রেণীতে বিভক্ত, একটি ভাববাদী, অপরটি বস্তুবাদী। ভাববাদী দার্শনিকেরা মূলত কল্পনাপ্রবণ; তাঁরা বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে যান নি। বস্তুনিরপেক্ষ ভাববাদী দর্শনকে অধিবিদ্যা (metaphysics) বা আধ্যাত্মিকতার গোত্রে বিবেচনা করা যায়; বস্তুবাদী দর্শনে বস্তুকেই (matter) সব কিছুর অগ্রবর্তী বলে মনে করা হয়। বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) বিচারপ্রসঙ্গে বস্তুবাদীরা আবার দু-শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর বিশ্লেষণপদ্ধতি যান্ত্রিক (mechanistic) এবং অপরশ্রেণীর পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক (dialectical)। যান্ত্রিক বিশ্লেষণে বলা হয়ে থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ব-জগৎ নির্দিষ্ট নিয়মে সরল কার্যকারণ ধারায় এগিয়ে চলে; তার সব রহস্য অজ্ঞেয় নয়; কিন্তু তা জানা সময়সাপেক্ষ।

মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ দর্শন হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে বস্তুবাদ যুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে এককভাবেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সেজন্যে তার কোনো বিশেষণের প্রয়োজন নেই। সেই কারণে বস্তুবাদের উল্লিখিত দুটি শ্রেণীবিভাগে তিনি বিশ্বাস করতেন না।

নিউটনের ধ্রুপদী mechanistic প্রত্যয়কে তিনি বিজ্ঞানসম্মত নয় বলে নাকচ করেছেন। ডায়ালেকটিস সম্পর্কে তাঁর অনুরূপ মনোভাব এরপর মার্কসের সঙ্গে তাঁর তুলনামূলক আলোচনার স্থানে উল্লেখ করা হবে।

নিউটনের mechanistic প্রত্যয়কে তিনি প্রত্যক্ষ পূর্ব জ্ঞানপদ্ধতি (a priori) হিসেবে দেখেছেন, যাতে জগৎপ্রকৃতি যেন একটা ঘড়ির মতো পূর্বনির্ধারিত—পরিণামবাদী (teleological) নিয়মে সবকিছু ঘটে চলে। প্রত্যয়টির সমালোচনাসূত্রে তিনি বলেন যে, বস্তু সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রকৃতিবিজ্ঞান এখন আর অবরোহী (deductive) প্রণালীতে চলে না। পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে বিশেষ (particular) থেকে সাধারণ (general) নিয়মে পৌঁছনর আরোহী (inductive) পদ্ধতিই বিজ্ঞান-সম্মত। প্রকৃতিবিজ্ঞান কোনো দেওয়াল-লিখন নয়। কতকগুলি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বারেবারে ঘটে, যার অপরিবর্ত্তনীয় (invariant) সম্পর্ক গবেষণার মাধ্যমে গাণিতিক সূত্রে পরিমাপন সম্ভব। এবং প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও একটা যোগসূত্র থাকে। সেইসব ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তই হল নিয়মনিয়ন্ত্রিত জগৎ (law-governed universe); পরীক্ষার মাধ্যমে জগতের বিভিন্ন নিয়মনিয়ন্ত্রিত অংশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা (order) দেখা যায়। এই বিশ্লেষণ পরিণামবাদী নয়।

মানবেন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুসৃত নিয়মানিয়ন্ত্রিত জগৎ প্রত্যয় অনুযায়ী প্রকৃতির অংশ জীবন ও জড়ের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। জড় এখন নিছক একটা hard lumps of reality নয়। মনোজগৎ বস্তুর অন্তর্গত। মানুষও প্রাকৃতিক জগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মনন যদিও তাপগতি বিজ্ঞান অনুসরণ করে না, কিন্তু মানুষের আচরণ মনোবিজ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করে, যার ভিত্তি হল শরীরবিদ্যা ও রসায়ন।

জৈব বিবর্তনের ধারায় সঞ্জাত মানুষের যুক্তিবোধ সেই নিয়মনিয়ন্ত্রিত জগতের অংশ। নিয়মনিয়ন্ত্রণ যেহেতু সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটা সাধারণ ব্যাপার, তাই জাগতিক সবকিছুর পিছনে একটা নিয়মশৃঙ্খলা আছে। যখন বলা হয় যে মানুষ মূলত যুক্তিশীল, তার অর্থ হল যে মানুষের সব আচরণই ব্যাখ্যা করা যায়। ধ্রুপদী mechanistic প্রত্যয়ের মস্ত ত্রুটি হল যে, তার সঙ্গে নৈতিকতার কোনো সঙ্গতি নেই। বাস্তব জীবন ও মানবিকতার সঙ্গে প্রত্যয়টি সম্পর্ক বিরহিত।[১৯]

বস্তুবাদকে তিনি সর্বার্থে একটি দর্শন হিসাবে বিচার করেছেন; তাঁর মতে দর্শন বলতে বস্তুবাদকেই বোঝায়—কারণ দর্শন বিজ্ঞানের নিষ্কর্ষ। বিজ্ঞান বিরহিত দর্শনচিন্তা অধিবিদ্যারই নামান্তর। বস্তুবাদ সম্পর্কে, খাও-দাও স্ফূর্তি কর—প্রচলিত স্থূল ও বিকৃত এই ধারণার তিনি নিন্দা করেছেন।

বস্তু সম্পর্কে সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায়

বস্তুবাদের উপযুক্ত নামকরণের প্রশ্ন একদিন দেখা দেবে বলে তিনি মনে করেন। কারণ তথাকথিত বস্তুই চূড়ান্ত বাস্তব সারবত্তা নয়। তাঁর কথায়—

Matter as classically conceived, is not the ultimate physical reality ; but that does not prove that ultimate reality as known today is immaterial or mental or spiritual.[২০]

মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদী দর্শনকে আরো উন্নত ও সম্প্রসারিত করেছেন। বস্তুবাদে ভাব ও বুদ্ধির অনুপ্রবেশ সাধন করে তিনি এক যুগান্তকারী পথ রচনা করেছেন। তাঁর মতে—

···materialistic conception of history must recognise the creative role of intelligence. Materialism cannot deny the objective reality of ideas··· . They are biologically determined ; priority belongs to the physical being, to matter...once the biologically determined process of ideation is complete ideas are formed, they continue to have an autonomous existence, an evolutionary process of their own, which runs parallel to the physical process of social evolution.[২১]

সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় ভাব ও চিন্তার ভূমিকাকে যথোচিত স্থান দেবার জন্য বস্তুবাদকে তিনি নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত জগতের (law-governed universe) প্রত্যয়ে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অতীন্দ্রিয় ভাববাদ তাঁর কাছে যে পরিত্যাজ্য তা বলাই বাহুল্য। শারীরবিদ্যার নবতম আবিষ্ক্রিয়ার আলোকে তিনি দেখিয়েছেন যে পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যার মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে। পরীক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও physico-chemical substance-এ গঠিত দেহের বিকারেই তিনি প্রাণের সন্ধান দর্শিয়েছেন। জৈব বিবর্তনধারায় প্রাণ ও মস্তিষ্কের পরিণত অবস্থায় পরিচিন্তন এক বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা অর্জন করেছে।

চিন্তা মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া; কিন্তু তা স্বাধীন গতিতে অগ্রসর হয়। পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে না। উভয়ের যুগপৎ ও সমান্তরাল গতি ইতিহাসের জৈব প্রক্রিয়ার (organic process) বিচারপদ্ধতি সৃজন করেছে; জড় ও চেতনাকে মানবেন্দ্রনাথ অদ্বয় (monistic) সত্তায় সমন্বিত করেছেন; পক্ষান্তরে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে তা দ্বৈতরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে। স্টালিনের ব্যাখ্যানুসারে—

Marxist materialist philosophy holds that matter, nature, being is an objective reality existing outside and independent of our mind.[২২]

বস্তুবাদী দর্শনকে মার্কস সমাজ ও ইতিহাসে প্রয়োগ করে এই মত প্রকাশ

করেছেন যে, উৎপাদন সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আশ্রয়ে উদ্ভূত শ্রেণী-সংঘর্ষের প্রতিফলনস্বরূপ রাষ্ট্র ও সমাজচেতনা গড়ে ওঠে। মার্কসের কথায়—

> The mode of production of material life determines the social, political and intellectual life process in general. It is not the consciousness of men that determines their being, but on the contrary, their social being that determines their consciousness.[২০]

মানবেন্দ্রনাথের মতে বস্তুবাদের এই অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ একদেশদর্শিতার সামিল—কারণ তাতে চিন্তন-প্রক্রিয়ার গুরুত্বকে উপেক্ষা করে তাকে কেবল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিবিম্বরূপে দর্শানো হয়েছে। চিন্তন ও অর্থনৈতিক সমাজকাঠামোর মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক যেটুকু আছে সেটা এই অর্থেই যে "action is always motivated by ideas"। ইতিহাসকে মানবেন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার ছকেবাঁধা অপরিহার্য ঘটনা-পরম্পরা হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ইতিহাসের পথ রচনায় সৃজনশীল মানুষের ভূমিকাই প্রধান। মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদে চিন্তন "objective reality" হিসাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। ইতিহাস বিশেষত সমাজেতিহাস চিন্তনের দ্বারাই নির্দেশিত। তাকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা ভুল। তাঁর মতে ইতিহাস নির্দেশিত—কিন্তু সেই নির্দেশ্যবাদের কারণ শুধু একটিই নয়—অনেক আছে।[২১]

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর বস্তুবাদী মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসে যুগান্তকারী সব ঘটনার বহু পূর্বেই চিন্তা তথা ভাববিপ্লব অগ্রণী হয়েছে। তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

> ...at no point of history, ideas were divinely inspired. From any point of their history, ideas can be traced back to their biological origin, which is embodied in the background of physical universe.[২২]

মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *Science and Philosophy*-গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বকে বস্তুবাদের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। আইনস্টাইন, প্ল্যাংক প্রমুখ পদার্থবিদদের বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক চিন্তা-ভাবনা বস্তু সম্পর্কে সংকীর্ণ ধারণা ভেঙে দিয়েছে। reality-র ব্যাখ্যায় দ্বান্দ্বিক প্রণালীই একমাত্র পথ নয় বলে তিনি সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ন্যায়-বৈশেষিকের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে আধ্যাত্মিকতার অনুপ্রবেশ উত্তরকালে ঘটে।

নবমানবতাবাদ

মানবেন্দ্রনাথের আজীবনকাল অর্জিত অনন্য অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের চূড়ান্ত পরিণতি হল তাঁর নবমানবতাবাদ দর্শন। স্বাধীন চিন্তার নিরঙ্কুশ প্রকাশে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। মূলত এই কারণেই তাঁর কমিউনিস্ট জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কমিণ্টার্নে অবস্থানকালের শেষ পর্যায়ে এই নব্যজীবন-দর্শনের বীজ তাঁর মনে অংকুরিত হয়েছিল।

মানবতা কথাটি নতুন নয়। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এবং এদেশের বৈষ্ণব ও সন্ত দার্শনিকদের চিন্তায় এ-আদর্শের প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। তার আলোচনা অন্য পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বে করা হয়েছে। একমাত্র মানবেন্দ্রনাথই এদেশে আধুনিককালে মানবতাবাদকে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে দেখেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের ব্যক্তিত্বের ও সৃজনশীলতার প্রতিকূল সমুদয় বাধা অপসারিত করেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণেই মানুষের সৃষ্টিসত্তা মুক্তি পেয়েছে, বিদূরিত হয়েছে যাবতীয় কুসংস্কারমূলক ভ্রান্তি ও ভীতি। অতীন্দ্রিয় চিন্তার আধিপত্য ও আধ্যাত্মিকতার শৃঙ্খল থেকেও মানুষ মুক্তি পেয়েছে।

ইউরোপীয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারতন্ত্রী আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত হন। উদারতন্ত্রী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে মার্কস বুর্জোয়া মনোভাব বলে বর্জন করেন। মানবেন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ অনুসারে নীতিতত্ত্বের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে মার্কসের যথোচিত অভিজ্ঞতার অভাব ছিল। তাঁর মতে মানবসভ্যতার সামনে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক যে সংকট দেখা দিয়েছে তার সুরাহা হতে পারে একমাত্র মানবতন্ত্রী মূল্যবোধের পুনরুজ্জীবনে। আশু কার্যকারিতা (pragmatism) ও সুবিধাসন্ধানী চিন্তার প্রাবল্যে মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিবোধ উন্মেষিত হচ্ছে না, ফলে সারা বিশ্বেরই নৈতিক ধারা নিম্নখাতে প্রবহমান; বাস্তবে নৈতিক মূল্যবোধ আজ বিলীয়মান।

মানবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন যে, সারা পৃথিবীর চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনভিপ্রেত ও নৈরাশ্যজনক এই গতিকে রোধ করতে চাইছেন; অন্বেষণ করছেন স্থায়ী ও কল্যাণকর পরিবেশ। ভারতে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক পথে অতীন্দ্রিয় শুভশক্তির বোধন চেয়েছেন। মানবেন্দ্রনাথ বস্তুবাদ ও বিজ্ঞানের উদ্‌গাতা—তাঁর কাছে অতিলৌকিক আধ্যাত্মিক পথের অনুসরণ অচিন্তনীয়; তিনি চেয়েছেন বিজ্ঞানের আশ্রয়ে যুক্তিমুখী নীতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। তাঁর মতে মানুষের যুক্তিপ্রবণতা ঐশ ইচ্ছায় উদ্ভূত হয় নি—হয়েছে জৈব বিবর্তনধারায়। সহজাত যুক্তিবোধই মানবতন্ত্রী যুক্তিতত্ত্বের ভূমিষ্ঠভূমি—বিবেক যুক্তিরই বিম্ব। আধ্যাত্মিকতার পরিমিশ্রণহীন এবং স্বভাবগত যুক্তিবোধসাপেক্ষ নীতিতত্ত্বের উপর মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ দর্শন প্রতিষ্ঠিত। সৃষ্টি-স্থিতির বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী একমাত্র যুক্তিনির্ভর

মানবতন্ত্রী নীতিতত্ত্বে আলোকিত পথই মানুষের নিকট অনুসরণীয়।[২৬]

বিবর্তনতত্ত্বের সাহায্যে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, বিশ্ব-বিবর্তনের শেষ ধাপ হয়েছে মানুষ; নিজস্ব নিয়মে নিয়ন্ত্রিত বিশ্বজগতের সে এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ বিশ্বজগতের কোলেই যুক্তিপ্রবণ মানুষের জন্ম। মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যেন যুক্তিবহ সুশৃঙ্খল জগতেরই এক প্রতিধ্বনি। যুক্তিপ্রবণতা আধ্যাত্মিক বা দিব্য কোনো সত্তা নয়—বিবর্তনধারার শেষ পর্যায় মাত্র; এই যুক্তির ভূমিতেই হয় নীতির জন্ম। সামাজিক সামঞ্জস্য এবং সহিষ্ণুতার তাগিদেই মানবমনে নীতিবোধ উন্মেষিত হয়।[২৭]

মানুষ বিশ্বচরাচরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই মানবিক সত্তায় ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে বিমূর্ত ব্যঞ্জনা আরোপ করা অসঙ্গত। নবমানবতাবাদ দর্শনে মানুষই সব কিছুর একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত; মানুষের মধ্যে কোনো ঐশ সত্তার স্বীকৃতি নেই তাতে। আধ্যাত্মিক মানবতাবাদে মানুষকে বিমূর্ত কল্পনায় বিশ্বাতীত মহত্ত্ব দান করা হয়। পক্ষান্তরে বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদে প্রাকৃতিক বিবর্তনের অংশ হিসাবে জৈব দৃষ্টিতে মানুষ বিবেচিত হয়েছে। কি ইউরোপ কি ভারতের পূর্বতন মানবতাবাদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদ দর্শনের এইটাই মৌল পার্থক্য। তাঁর দর্শন সম্পূর্ণরূপে মানুষের জ্ঞান ও গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত—তার প্রেক্ষাপট একাধারে বস্তুবাদী ও গতিসম্পন্ন। সর্বার্থে বিজ্ঞানভিত্তিক এই দর্শন মানুষের সৎ, শুভ ও সৃজনশীল জৈবধর্মে আস্থাবান—তার ভিতর শাস্ত্রীয় নির্দেশ অথবা পরম বৈভব বলে কিছু নেই। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর দর্শনে পার্থক্যের চিহ্নস্বরূপ "New" কথাটি যুক্ত করেছেন এই বলে যে, তাতে মানুষকে নতুনভাবে দেখা হয়েছে—যে-দেখার পিছনে আছে ইতিহাস ও বিজ্ঞানের মনোভাব। জীববিদ্যার আধুনিকতম আবিষ্কারে মনুষ্য-প্রকৃতির নতুন রূপ নির্ণীত হয়েছে। তাতে একথা স্পষ্টভাবে দেখা গেছে যে, বিশ্ব-বিবর্তনধারায় উদ্ভূত জীবের শেষ ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি হল মানুষ। মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব কোনো বিশ্বাতীত অতীন্দ্রিয় শক্তি থেকে অর্জন করে নি—করেছে তার সহজাত সৃজনীশক্তির সাহায্যে প্রকৃতিকে জেনে ও জয় করে। প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে নিয়ন্ত্রিত হলেও সে প্রকৃতিতে নিমজ্জিত নয়। প্রকৃতির মধ্যেও যেমন নিয়মশৃঙ্খলা আছে তেমনি মানুষের সহজাত স্বভাবেও অনুরূপ নিয়মানুবর্তিতা থাকায় মানুষ মূলত যুক্তিবাদী ও ন্যায়পরায়ণ। জৈব বিবর্তনধারাতেই মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে তার সহজাত গুণগুলি অর্জন করেছে। মানবেন্দ্রনাথ তাঁর এই দর্শনকে নবতম জ্ঞানের সমন্বয় স্বরূপ অতিরিক্ত "Integral" শব্দটি দিয়েও তার স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছেন।[২৮]

নবমানবতাবাদ দর্শন দূরকল্পী (speculative) অথবা কারণ বিচারপূর্বক কার্যনির্ণায়ক পদ্ধতির (deductive) পরিবর্তে ঐতিহাসিক বিবর্তনে লব্ধ

অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে রচিত। এই দর্শনের মর্ম হল যুক্তি, নীতি ও মুক্তি। স্বতন্ত্র অস্তিত্ববিশিষ্ট বিশ্বনিয়ন্ত্রক (logos) শক্তিরূপে যুক্তির প্রত্যয় এই দর্শনের পরিপন্থী। মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নিয়মনিয়ন্ত্রিত বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থানকে আশ্রয় করেই যুক্তির উদ্ভব ঘটে। মানুষ মূলত যুক্তিবাদী জীব হলেও অনেক সময়ে তার অপরিশীলিত আদিম মনোবৃত্তি ফুটে ওঠে। সেজন্যে চাই মানবমনের যথোচিত কর্ষণ। তাঁর নীতিতত্ত্ব স্বজ্ঞা (intuition) সঞ্জাত যেমন নয়, তেমনি তা বিশ্বাতীত পরম সত্তার অভিব্যক্তিও নয়। মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ ও সামাজিক বিধিব্যবস্থায় যুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ থেকেই নীতিনিষ্ঠা গড়ে ওঠে। তার লক্ষ্য সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণসাধন। মানবেন্দ্রনাথ যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে নীতিতত্ত্বে প্রবেশ করেছেন। কোনো অতীন্দ্রিয় ভাবাবেগ বা শাস্ত্রীয় নির্দেশ তাঁর দর্শনে অবর্তমান।

নবমানবতাবাদ দর্শনে যুক্তিনির্ভর নীতিতত্ত্ব ও সর্বাঙ্গীণ মুক্তিকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মার প্রত্যয় অথবা জগতের ইষ্টহেতুক পরিণামবাদ তাতে নেই। "আত্মা" শব্দটি মানবমনের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁসেও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তির দাবি ঘোষিত হয়েছিল। নবমানবতাবাদ যুক্তি, নীতি ও মুক্তি—এই তিন মূল্যবত্তার ভিত্তিতে সমন্বিত। প্রকৃতির প্রতিকূল পরিবেশে আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জৈব সংগ্রামেই মুক্তির প্রত্যয় নিহিত। মুক্তিই মানুষের অবাধ বিকাশ ও সামাজিক প্রগতির মানদণ্ড। মুক্তি আর মোক্ষ এক কথা নয়। ধরা-ছোঁয়ার এই পৃথিবীতেই মুক্তি চাই। অতীন্দ্রিয় দৃষ্টিতে বহির্বন্ধন সত্ত্বেও আত্মা সদাই মুক্ত এ-প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর চিন্তার কোনো সাদৃশ্য নেই। তেমনি পূর্বনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সমন্বয়-প্রত্যয়ও যথার্থ মুক্তির পরিপন্থী; পরমকারণজনিত উদ্দেশ্যবাদ বা পরিণামবাদী (teleology) ও এমনকি মার্কসের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যবাদেও মুক্তি অনুপস্থিত। শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে মুক্তি মানুষের একটি দিব্যসত্তা। মানবেন্দ্রনাথের মনে ডারউইনের ক্রমবিবর্তন তত্ত্বানুসারে অস্তিত্বের সংগ্রাম ও আত্মসংরক্ষণেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়।[২৯] মুক্তির আবেগ সমাজ ও সভ্যতার গতিসঞ্চারক। মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বে মুক্তিকে জৈব বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দেখা হয়েছে, বিমূর্ত মানসের বিশ্বাতীত বিষয়রূপে নয়। মুক্তির আবেগ প্রতি মানুষের অন্তরে নিহিত থাকে। মান্ধাতা আমলের আধ্যাত্মিক ও অতিপ্রাকৃত সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করলে মানুষের আত্মিক মুক্তি ঘটবে; মুক্তি অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপাদান অন্তর্নিহিত সৃষ্টিশক্তিময় সম্ভাবনার উপলব্ধি। আত্মিক বন্ধন-মুক্ত মানুষই কেবল নতুন ও স্বাধীন সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম। সামাজিক ও রাজনৈতিক বন্ধনমুক্তি একমাত্র সংস্কারমুক্ত মানুষের উপর নির্ভর করে। মানবেন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী নীতিতত্ত্ব তাঁর বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বেরই অঙ্গ। তাঁর সকল কথার মূলে একটি

সুর সদাই যেন অনুরণিত—সেটি হল আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কয়েদখানা থেকে মানবতার মুক্তিসাধন। মানবতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও যুক্তিনির্ভর নীতিতত্ত্ব মুক্তির তিন প্রধান স্তম্ভ।[৩০]

নবমানবতাবাদ সার্বভৌম মানুষের জয়গান করেছে। মানুষের সেই মৌল সত্তা হরণ করার কোনো অধিকারই সমাজের নেই। এই দাবি কোনো কাব্যিক ভাবাবেগ কিংবা অতীন্দ্রিয় আবেগ সম্ভূত নয়। তা হল সামাজিক ও জৈব বিবর্তন সম্পৃক্ত মানবমনের চরমোৎকর্ষের উপাদান। মানবতা এখন এক সংকটের সম্মুখীন; ব্যষ্টিকে সমষ্টিতন্ত্রের দানব গ্রাস করতে চলেছে; ব্যক্তিস্বাধীনতা অস্তমিত। আর্থিক সংকটমুক্তি মানবতার প্রয়োজনে অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক নিষ্পেষণে এখন ব্যক্তিমানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

নবমানবতাবাদ-এর আদর্শ যে বিশ্বজনীন সেকথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। জাতীয়তাবাদ সমাজ-বিবর্তনের একটি নিচের পর্যায়মাত্র—শেষ ও সর্বোন্নত পর্যায় নয়। মূলত জাতিবিদ্বেষে সৃষ্ট জাতীয়তাবাদ যে প্রতিক্রিয়াশীল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই; তার দীর্ঘস্থায়িত্ব ব্যক্তি ও সমাজকল্যাণের অন্তরায়। জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে চাই বিশ্বভ্রাতৃত্ব। মানুষে-মানুষে সাহচর্যপূর্ণ সৌহার্দের কথা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের মতো মানবেন্দ্রনাথের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়। তাঁর দৃষ্টিতে সংস্কারমুক্ত ব্যক্তিমানুষের মনই হল উন্নত সমাজ, বৈশ্বিক মৈত্রী ও মুক্ত বিশ্বের বনিয়াদ। এই আদর্শে পেঁছনোর জন্য সর্বাগ্রে চাই মুক্তির আদর্শ ও প্রগতির মন্ত্রে দীক্ষা। নবমানবতাবাদ এই মুক্ত ও মিত্রতাবদ্ধ বৈশ্বিক সংঘের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। মানবেন্দ্রনাথ ঐকান্তিকভাবে যে-বিশ্বসংঘ গঠনের প্রস্তাব করেন সেখানে দেশগত সীমানার প্রশ্ন গৌণ—পুঁজিবাদী, ফ্যাসিবাদী, সাম্রাজ্যবাদী, সাম্যবাদী প্রভৃতি সকল রাষ্ট্রই ক্রমে একদিন বিশ শতকের নবজাগ্রত মানুষের তাড়নায় লুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিকতাকে তিনি ভিন্নার্থে বিচার করেছেন। আন্তর্জাতিকতার প্রত্যয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বতন্ত্রই থাকে। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বরাষ্ট্র গঠন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিকে একত্রীকরণের মাধ্যমেই একমাত্র সম্ভব। তিনি চেয়েছেন বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে আত্মিক বন্ধনে সংযুক্ত মানবসমাজ।[৩১]

মানবেন্দ্রনাথের মতে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের একমাত্র উপায় হল মানুষের মননশীলতার নবজাগরণ, আর সেইসঙ্গে মানবতাবাদের মৌল আদর্শের রূপায়ণ।

রাষ্ট্রদর্শন

সমাজের উৎপত্তি প্রসঙ্গে চুক্তিতত্ত্বের পরিবর্তে জৈব প্রয়োজন ও স্বার্থের তাড়নায় এবং পারস্পরিক সুবিধা ও সহযোগিতার তাগিদে সমাজবন্ধনের উদ্ভব হয়েছিল বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৩২] সমাজ মানুষেরই সৃষ্টি; তার পিছনে কোনো ঐশ নির্দেশ নেই। ব্যক্তিমানুষই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উৎস। বিবর্তনধারার প্রথমাবস্থায় জৈব অস্তিত্বের জন্য মানুষ সংগ্রাম করে এসেছে; ক্রমে বুদ্ধি, চেতনা, সৃজনীশক্তি প্রভৃতি মানবিক সত্তার বিকাশে সেই সংগ্রামের মান ও ধারা বিকশিত ও উন্নত হয়। জৈব প্রয়োজন নিবৃত্তির পরে অপরের মানবিক সত্তার স্ফুরণ অব্যাহত রেখে ব্যক্তিমানুষ নিজ সত্তার পরিপূর্তির জন্য সমাজবন্ধনের তাগিদ অনুভব করে। ব্যক্তিমানুষের নিরঙ্কুশ স্বাধীন প্রয়াসের সঙ্গে সুষম সমাজব্যবস্থার কোনো বিরোধ নেই। যে-সমাজে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা অবর্তমান সেখানে সমাজবদ্ধতার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিকাশের তারতম্য হেতু বিরোধের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেজন্যে সর্ববিধ বৈষম্য দূর করে একের দ্বারা অপরের পীড়ন ও পদানত রাখার অবকাশ নির্মূল করাই রাষ্ট্রের কাজ।

মানুষের সহজাত যুক্তি ও নীতিপ্রবণতায় মানবেন্দ্রনাথ বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বলেছেন যে, শুভ ও সুন্দর সমাজ তার অধিবাসীদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যেক্ষেত্রে সেইবোধের অভাবে সমাজে মালিন্য ফুটে ওঠে সেখানে আইনের সাহায্যে সুরাহা হয় না। চাই মানুষের চেতনা ও শুভবুদ্ধির উন্মেষ।[৩৩]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক কী তা নিয়ে দুটি মত প্রচলিত। এই দুটি মতের ভিত্তিতেই রাষ্ট্রতত্ত্বের যা কিছু আলোচনা হয়ে থাকে। প্রথম মতানুসারে সমাজের অস্তিত্বকে ধরে নিয়ে তার সঙ্গে ব্যক্তিকে খাপ খাইয়ে নেওয়া হয়; তদনুযায়ী ব্যক্তি সমাজেরই একটি অংশ এবং সমাজে সে বাস করে মাত্র। সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার সঙ্গে ব্যক্তির সংগতি বজায় রাখা এবং তার জীবনাচার নিরূপণই এই মতানুসারীদের লক্ষ্য। যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর সব কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা এবং ঐশ ইচ্ছায় বিশ্বচরাচর ও মানুষের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁরাও সমাজকে ব্যক্তির উপর স্থান দিয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় মতানুসারে মানুষই সমাজের স্রষ্টা; সেজন্যে সমাজের উপরে অধিষ্ঠিত মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি। মানুষ নিজের সুখসুবিধার তাগিদে সমাজ সৃষ্টি করেছে; তাই সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সব কিছু

বিষয়কে ব্যক্তিমানুষের জীবন ও প্রয়োজনের দিক থেকে নিরূপণ করাই কাম্য। শেষোক্ত মতের সমর্থক মানবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে (Individualism) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সম্প্রসারিত করেছেন।

তাঁর মতে জৈব বিবর্তনধারায় উদ্ভূত ও বিকশিত আদিম মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে সমবায়ী সম্পর্কে সংঘবদ্ধ উপায়ে যাবতীয় প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সমাজবদ্ধ হয়। চুক্তি করে মানুষ সমাজ সৃষ্টি করে নি, করেছে জৈব তাড়নায়। প্রশ্ন হতে পারে যে সেই জৈব তাড়নার ভিত্তিভূমি বা প্রকৃতি কী ছিল? অর্থাৎ মানবজীবনের প্রাথমিক ও চরম লক্ষ্য কী? তদুত্তরে মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রথমাবস্থায় আদিম মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে প্রকৃতির সঙ্গে যান্ত্রিক সামঞ্জস্য ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (mechanical adjustment and natural selection) প্রক্রিয়ায় লিপ্ত ছিল;[২৪] ক্রমে উন্নত পর্যায়ে এসে ইচ্ছা ও বুদ্ধির অধিকারী হওয়ায় যান্ত্রিক সামঞ্জস্যের পরিবর্তে বুদ্ধির সাহায্যে জীবন-সংগ্রামের পথনির্বাচন করে। ক্রমে তার পিছনে বিচার ও বিবেকবোধ সৃষ্ট হওয়ায় মানুষের মনে নীতিবোধের উন্মেষ ঘটে। মানুষের পূর্বাপর জীবন-সংগ্রামের পিছনে আছে সর্ববিধ প্রতিকূলতা থেকে মুক্তির বাসনা। এই মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই সমাজসৃষ্টির প্রকৃত উৎস। জৈব বিবর্তনধারাতেই ক্রমে মানুষের মন বুদ্ধি, চেতনা এবং বহুবিধ সৃষ্টির সম্ভাবনায় ভরে ওঠে। সমাজ ও তার অঙ্গ রাষ্ট্রের কাজ হল প্রথমত মানুষেব জৈব অস্তিত্বকে যথোচিত বজায় রাখা এবং দ্বিতীয়ত মানুষের মননশীল বিকাশ ও বিচিত্র সৃষ্টিসত্তাকে যাবতীয় বাধাবিপত্তি থেকে রক্ষা করা। সমাজে পরস্পরবিরোধী নানা মত ও দ্বন্দ্বের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সেখানে রাষ্ট্রের ভূমিকা হল সামঞ্জস্য বিধান করা, কারো অবদমন নয়। জীবতত্ত্ব অনুসারে যদি একথা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নেওয়া হয় যে, মানুষ মূলত যুক্তিপ্রবণ তাহলে মুক্তির ধারক ও পরিপোষক সমাজের লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই প্রবণতার উন্মেষসাধন; সেই কারণে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেও কোনো বিরোধের প্রশ্ন ওঠে না।[৩৫]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তিনি গণতন্ত্রের বনিয়াদ বলে মনে করতেন। শুধু পরিবারেই নয়—সমাজে সবার আগে ব্যক্তির স্থান ও অধিকার বর্তায়। তিনি বলেন যে সমাজের উৎপত্তি ব্যক্তিমানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সংঘবদ্ধতার তাগিদেই ঘটে। তাই তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টিতে তাঁর রাজনৈতিক, সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন।

জাতীয়তাবাদ

মানবেন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে একটি "antiquated cult" হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে সামাজিক বিবর্তন-প্রক্রিয়ায় মানুষের গোষ্ঠীমন এক

সময়ে ঐ আবেগ অর্জন করে। গোষ্ঠীমন নিশ্চল নয়, তারও আছে বিকাশ ও পরিবর্তন। বিগত দু-শতক যাবৎ সামাজিক আবেগের আবর্তনকেন্দ্র ছিল জাতীয়তাবাদ। সেটা চিরন্তন নয়। মানবসমাজের বিবর্তনধারায় একটি স্তরে জাতীয়তাবাদ প্রগতিমূলক ছিল—কিন্তু এখন তা অচল ও নিষ্প্রয়োজন। নতুনতর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে জাতীয়তাবাদী মনোভাব ক্রমবিস্তৃত হয়ে সমগ্র মানবসমাজে লীন হয়ে গেছে।

জাতীয়তাবাদের উৎস হল হৃদয়াবেগ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিজ্ঞানসম্মত সমাজদর্শনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি। জাতীয় স্বাধীনতার তাগিদে মানুষের মনে অন্ধ দেশহিতৈষা ও জাতিবিদ্বেষ দেখা দেওয়ায় স্বাধীন চিন্তাশক্তিও লুপ্ত হয়ে গেছে। জাতীয় স্বাধীনতার প্রকৃত লক্ষ্য অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিসাধন উপেক্ষিত হয়েছে।

জাতীয়তাবাদ মূলত সমষ্টিবাদী। তাতে ব্যক্তিস্বাধীনতার স্থান নগণ্য। "জাতি" শব্দটিতে আধ্যাত্মিক পরমত্ব আরোপ করা হয়—যার বেদীমূলে নিজেকে আহুতি দেওয়া মনুষ্যজীবনের এক পরম আদর্শ। জাতীয়তাবাদেই ফ্যাসিবাদের বীজ নিহিত থাকে। জাতীয়তাবাদের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে মানবেন্দ্রনাথ বলেন—

> ...human being of flesh and blood, must sacrifice everything to make the nation great and glorious. That is the essence of Nationalism.... The nation could not claim an undivided loyalty unless Nationalism was of the order of monotheistic religion : there can be no other God, and nobody can claim any share in the sacrifice.[৩৬]

পরমত্বের ব্যঞ্জনায় দেশ ও জাতিকে মাতৃরূপে বন্দনা করা হয়। তার অধিবাসীদের একমাত্র আনুগত্য হল ধোঁয়াটে আবেগসর্বস্ব এই জাতি প্রত্যয়ের কাছে। ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট জাতি প্রত্যয় সমষ্টিবাদী হতে তাই বাধ্য। ভারতের জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় অসহিষ্ণুতা, একাধিপত্য ও একনায়কত্বের প্রবণতা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে।

বৈজ্ঞানিক রাজনীতি

প্রথম জীবনে মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন জাতীয়তাবাদী, তারপর হন মার্কসবাদী। এই সময় থেকেই তাঁর মনে র‍্যাডিক্যালিজমের চিন্তাধারা দেখা দেয়; সেই চিন্তা উত্তরচল্লিশে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। পরিশেষে তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সাহায্যে রচিত হয় বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ। *Scientific Politics* গ্রন্থের (১৯৪৭) ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

Seven years ago, I still spoke as an orthodox Marxist criticising deviations from, or faulty understanding of the pure creed. Nevertheless, the tendncy to look beyond Communism was already there in a germinal form. While still speaking in terms of class struggle, I laid emphasis on the cohesive factor in social organisation. Already then I appreciated Marxism as something greater than the ideology of a class. I understood it as the positive outcome of earlier intellectual efforts to evolve a philosophy which could harmonise the procesess of physical nature, social evolution and the will and emotions of individual man [৩৭]

ঐ গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, রাজনীতির পশ্চাতে একটা সুস্পষ্ট জীবনদর্শন থাকা আবশ্যক। রাজনীতিকে বিজ্ঞানাশ্রয়ী করাই ছিল তাঁর সাধনা। তবে হব্‌স, স্পিনোজা প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের বৈজ্ঞানিক রাজনীতি থেকে তাঁর চিন্তা ছিল স্বতন্ত্র। তাঁরা চাইতেন একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মাত্র; হব্‌সের মতে জাগতিক গতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের প্রতিক্রিয়া সঞ্জাত আচরণকে একটা জ্যামিতিক ছকে বিচার-বিশ্লেষণই হল রাজনীতির কাজ। মানুষের ক্রিয়াকলাপকে স্পিনোজাও জ্যামিতিক প্রণালীতে বিশ্লেষণের প্রয়াসী হন। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ সামাজিক দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক রাজনীতির প্রয়োগবিধি নির্ধারণ করেন। বৈজ্ঞানিক রাজনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

...it (philosophy is the sum total of the entire human knowledge which makes some sense out of politics and which induces noble and pure, detached and unselfish men and women to take to politics as a profession. Their political activity is motivated by the realisation that there are laws governing human life, as they govern the physical universe.[৩৮]

সেইসঙ্গে তিনি একথাও অনুভব করেছেন যে, রাজনীতিকে যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত করে তুলতে হলে কমিউনিজম ও ন্যাশন্যালিজমের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে হবে।[৩৯]

বিভিন্ন গ্রীক দার্শনিক এবং পরবর্তীকালের স্পেনসার, হোয়াইটহেড প্রমুখ দার্শনিকদের মতো মানবেন্দ্রনাথও এই মত পোষণ করতেন যে, দর্শন বিজ্ঞানেরই নিষ্কর্ষ। অধিবিদ্যা ও অধ্যাত্মবাদসাপেক্ষ অতীন্দ্রিয় ভাববাদের পরিবর্তে একমাত্র বিজ্ঞানের সমন্বয়েই তিনি আস্থাবান ছিলেন। বিশ্বতত্ত্বের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি রাজনীতিকে বিজ্ঞাননির্ভর আদর্শে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে দর্শনের কাজ যেমন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগকে সমন্বিত করা,

তেমনি রাষ্ট্রদর্শনের কাজ হওয়া উচিত বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করা।

ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করে তিনি বলেছেন যেহেতু কর্ম চিন্তার অনুগামী, সেজন্যে রাজনৈতিক কর্মের পিছনেও সুসংবদ্ধ চিন্তার প্রয়োজন আছে। কার্যত রাজনীতি স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী বাউণ্ডুলেদের মেঠো বক্তৃতা হিসেবে পরিগণিত। অনেকের দৃষ্টিতে রাজনীতি একটা নোংরা বিষয়। তিনি এই মনোভাবের দুটি কারণ দেখিয়েছেন: ১ যেহেতু সমাজের সমগ্র পরিবেশই কলুষিত, তাই তার অন্যতম অঙ্গ রাজনীতিও দূষিত হয়ে পড়েছে; ২. রাজনীতিকে একটি বিজ্ঞান হিসাবে না দেখার ত্রুটি।

অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রদর্শনের প্রয়োজন স্বীকৃত হলেও তা যথোচিত পালিত হয় না। কার্যকারিতার দিক থেকে বা সুবিধাবাদী আচরণের ফলে তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থেকে যায়।[৪০]

মানবেন্দ্রনাথ এই সুবিধাবাদী রাজনীতির নিন্দা করেছেন। তিনি চেয়েছেন তত্ত্ব ও প্রয়োগের সামঞ্জস্য; দর্শনকে অধিবিদ্যা ও অতীন্দ্রিয় চিন্তার কুক্ষি থেকে মুক্তি দিতে। তাহলেই তাঁর মতে বিজ্ঞান ও রাজনীতির মধ্যে সেতুবন্ধ রচিত হবে। তাঁর কাছে রাষ্ট্রবিদ একজন বিজ্ঞানী, যাঁর দৃঢ় প্রত্যয় থাকা দরকার যে জাগতিক প্রক্রিয়া অতিপ্রাকৃত কোনো সত্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়—সমাজ ও ইতিহাসের রূপকার হল মানুষই স্বয়ং। সামাজিক বিবর্তন-ধারায় বহু কিছু রীতিনীতি রচিত হয়েছে, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে বিমূর্ত (abstract) বলে মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা সমাজবদ্ধ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের তাগিদেই রচিত। সেগুলি যখন অচল প্রতিপন্ন হয় তখন স্বতঃই তার পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তার আগে এইটুকু আত্মপ্রত্যয় থাকা চাই যে ঈপ্সিত পরিবর্তনসাধনের ক্ষমতা আছে একমাত্র মানুষেরই—এবং সে-বিশ্বাস অর্জন একমাত্র বিজ্ঞাননির্ভর দর্শনেই সম্ভব। এই বিশ্বাস দৃঢ় হলে রাজনীতিতে মানুষের রুচি দেখা দেবে: রাজনীতি হবে হৃদয়গ্রাহী এবং স্বাধীন মনোভাবাপন্ন মানুষ নিঃস্বার্থ মনে রাজনীতিতে অংশ নেবে। রাজনীতিকেরা সুবিধাবাদ ত্যাগ করে কার্যকারিতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে তত্ত্ব ও তার সঠিক প্রয়োগে উৎসাহী হবে।[৪১]

ব্যবহারিক দিক থেকে রাজনীতির কাজ অনেকের মতে ক্ষমতা দখল করা, যার উদ্দেশ্য আদর্শ সমাজের প্রতিষ্ঠা; স্পষ্টতই এ-প্রত্যয় দুটি পরস্পর-বিরোধী। কার্যত ক্ষমতা দখল দুভাবে সম্ভব—একটি যেন-তেন প্রকারেণ এবং অপরটি জ্ঞানের হাতিয়ার অবলম্বন করে। মানবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পন্থার অনুরাগী ছিলেন।[৪২]

তাঁর মতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ বিশ্বপরিবেশকে যেমন জয় করেছে তেমনি সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যে সে সমাজের গঠন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয়েছে; সত্য সদাই জ্ঞানবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। সত্যানুসন্ধান

প্রকারান্তরে কর্মক্ষেত্রে সার্থক পরিণতি লাভ করে। রাজনীতির ক্ষেত্রে কথাটির উপযোগিতা এই যে সত্যের খাতিরে রাজনৈতিক কাজে ফলাফল উপেক্ষা করে মানুষ নির্ভয়চিত্তে সত্যের উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হয়। সত্য নিশ্ছিদ্র ও অখণ্ডনীয়। প্রাত্যহিক জীবনে চিন্তা ও কাজের মধ্যে চাই সত্যের প্রতিষ্ঠা। এই আদর্শকেই মানবেন্দ্রনাথ প্রবর্তন করতে চেয়েছেন।

নীতিগত দৃষ্টিতে জ্ঞান নিরপেক্ষ—অর্থাৎ জ্ঞানের সৎ ও অসৎ দুরকম ব্যবহারই হতে পারে। রাজনীতিকে সুখবহ করে তুলতে হলে তাই শুধু জ্ঞান-নির্ভর সত্য নয়—তাতে নীতিরও সংযোগ চাই। আবার রাজনীতির লক্ষ্য (end) কেবল শুভ হলেই চলবে না—পদ্ধতির (means) সঙ্গেও তার সামঞ্জস্য থাকা চাই। এখানে মার্কসের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের পার্থক্য সুস্পষ্ট। মার্কস মনে করতেন সামাজিক বিবর্তনধারা নিয়মনির্দিষ্ট এবং স্বভাবতই তা প্রগতিশীল; সেই প্রগতিকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে-কোনো পন্থার অবলম্বন নীতিসঙ্গত (end justifies the means)। মার্কস শ্রেণীহীন সুস্থ সমাজ গড়তে চেয়েছেন—এটা যে শুভ তাতে দ্বিমত নেই। কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনে তিনি নীতিকে করেছেন আপেক্ষিক; ফলে লক্ষ্য ও লক্ষ্যাভিমুখী পথের মধ্যে অসংগতি থেকে গিয়েছে।[৮৩]

মানবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক লক্ষ্য ও পদ্ধতির মধ্যে সঙ্গতি সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষমতা দখলের পরিবর্তে তিনি যথার্থ মানবিক মঙ্গলবিধানে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর সঙ্গে গান্ধীর পার্থক্য এই যে, তিনি গান্ধীর মতো বিশ্বাতীত অতীন্দ্রিয় উৎসে নীতিতত্ত্বের সন্ধান করেন নি; বিজ্ঞাননির্ভর দৃষ্টিতে জৈব যুক্তিপ্রবণতার উপর মানবেন্দ্রনাথ তাঁর নীতিতত্ত্বকে স্থাপন করেছেন।

তাঁর মতে সামাজিক সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সহযোগিতা ও সমবায়ী সম্পর্কের কার্যকারিতা স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। রাজনীতিকে মানবেন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক শ্রেণী-সম্পর্কিত কাঠামোর ছায়ারূপে দেখেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে রাজনীতি সমাজের সুসংবদ্ধতা ও সৌষ্ঠবসাধনের একটি বিজ্ঞানবিশেষ।

গণতন্ত্র

বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত ধারায় যেমন নবমানবতা দর্শনের উদ্ভব হয়েছে, তেমনি সুগঠিত গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রিত প্রশাসন ও পার্টিবিহীন রাজনীতি উক্ত দর্শনের সামাজিক বিষয়রূপে প্রাধান্য লাভ করেছে।

মানবেন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই সুগঠিত গণতন্ত্রের (organised democracy) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। গণতন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন

যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে ইউরোপে পনের ও ষোল শতকে মানুষের মননশীলতার উন্নয়নসূত্রে। আঠার ও উনিশ শতকে সেই মানসিকতা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। গণতান্ত্রিক এই বোধের উৎস ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার চেতনা। একথা আজ সর্বস্বীকৃত যে গণতন্ত্রী সরকার বা গণতন্ত্রী সমাজ-ব্যবস্থা ব্যক্তিমানুষকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে স্বাধীনতার সুযোগ দেয়।

সেই দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক রাষ্টতন্ত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ স্বাধীনতার অবকাশ মেলে। তবুও অস্বীকার করা যায় না যে দেড়শ বছর ধরে রূপায়ণের পরেও গণতন্ত্র আশানুরূপ ফলদায়ক হয় নি। তাই থেকে লোকে ধরে নেয় যে গণতন্ত্রের কোনো সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ নেই। অর্থাৎ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে আদর্শ ও উত্তম সরকার গড়া বুঝি সম্ভব নয়। বাস্তবিকই অভিজ্ঞতায় অনুভূত এইসব সন্দেহ হাল্কাভাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কয়েক প্রজন্মের এইসব সন্দেহ খতিয়ে দেখা দরকার।

মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, গণতন্ত্র সম্পর্কে উল্লিখিত সন্দেহ যুক্তির সাহায্যে ও বিনা বিতর্কে মেনে নেওয়া যেতে পারে এই কারণে যে কোনো সমাজব্যবস্থাই কোনো কিছুকে শেষ কথার মতো চূড়ান্ত বলে দাবি করতে পারে না। মানুষের সৃজনসত্তা ও সম্ভাবনার নিরন্তর উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রগতির পথে এগিয়ে চলে। কাজেই কোন্ সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে ভাল সেই শেষ কথাটা কেউ কোনোদিন বলতে পারে না। বলা যায় যে আজকের অবস্থায় এর চেয়ে ভাল কেউ কিছু ভাবে নি বা ভাবতে পারে না।

ব্যুৎপত্তিগত কিংবা ইতিহাসগত অর্থে গণতন্ত্র বলতে বোঝায় জনগণের (of the people) এবং জনগণের দ্বারা (by the people) পরিচালিত সরকার। মূল কথা দাঁড়াচ্ছে যে, সার্বভৌমত্বের অধিকারী হল জনগণ। যেহেতু সার্বভৌম শক্তি হল জনগণের, সেহেতু "জনগণের" এবং "জনগণের দ্বারা" সরকারই সবচেয়ে ভাল। তত্ত্বগত দিক থেকে একথা কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে না—অবশ্য যদি সার্বভৌম শক্তির অধিকার রাজা দৈব প্রতিনিধি বা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কুক্ষিগত না হয়।

তিনি দেখিয়েছেন যে, অন্যদিকে গণতন্ত্রের বিকল্প হল নানা ধরনের একনায়কতন্ত্র। তাতে বলা হয় যে নিজেদের কার্যনির্বাহের যোগ্যতা জনগণের নেই—তাই জনগণকে শাসনের জন্যে দায়িত্ব নিতে হয় বিশেষ গুণসম্পন্ন কিছু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে। তুলনামূলকভাবে জনগণের যথার্থ সার্বভৌম ক্ষমতা উল্লিখিত স্বৈরশাসনের চেয়ে ভাল, তাতে জনগণ তাদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুযায়ী নিজেরাই নিজেদের ভালমন্দ বিচারে সক্ষম ও অধিকারীও বটে। সেজন্যে মানবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তত্ত্বগতভাবে অন্তত বলা যায় যে গণতান্ত্রিক সরকারই সবচেয়ে ভাল ধরনের ব্যবস্থা। তাতে কালক্রমে লোকে উন্নততর ব্যবস্থার দিকে এগোতে পারে।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও নীতিগত প্রয়োগের উল্লিখিত মূল্যায়নের পর মানবেন্দ্রনাথ অভিজ্ঞতার আলোকে গণতন্ত্রের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, সে-ইতিহাস বিশেষ উজ্জ্বল নয়। ভালভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে অনেক অমিল রয়ে গেছে। বর্তমান বিশ্বের পরিস্থিতি হল সেই স্ববিরোধের পরিণাম। তিনি বলেন যে পরীক্ষা করে দেখে সেই স্ববিরোধ মেটাবার পথ খোঁজা দরকার, যাতে গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে সঙ্গতি বজায় থাকে।

তাঁর দৃষ্টিতে গণতন্ত্র দুটি মূল নীতি থেকে উৎসারিত: এক, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং দুই, জনগণের সার্বভৌমত্ব। কার্যত গণতন্ত্র ঐ দুটি নীতি থেকে সরে গেছে। শুধু উনিশ শতকের সংসদীয় গণতন্ত্রই নয়, ইতিহাসের আরো পিছনে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে গণতন্ত্রের ঋত্বিক রুশো প্রমুখ ফরাসি বিপ্লবের পূর্বসূরীদের চিন্তায় কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। একটা আদর্শ হিসেবে গণতন্ত্রকে সবাই নিয়েছিলেন গ্রীস থেকে। প্রাচীন গ্রীসে বিরাজ করত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (direct democracy)। সেখানে গণতন্ত্রের প্রয়োগ হত দশ-বিশ হাজর অধিবাসী অধ্যুষিত ছোট ছোট নগরের সাধারণতন্ত্রে (city republic)। আঠার শতকের ইউরোপে এক একটি বিরাট দেশে যেহেতু লক্ষ লক্ষ লোকের বাস সেজন্যে রুশো গ্রীসের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শ বর্জন করেন। রুশো যত না রাজনীতিক ছিলেন, তার চেয়ে বেশি ছিলেন একজন কবি ও স্বপ্নবিলাসী ভাবুক হিসেবে। তিনি সাধারণ অভীপ্সার (general will) পথ বের করেন। রুশোর দৃষ্টিতে মানুষ যেহেতু চুক্তির (contract) মাধ্যমে সমাজ গঠন করেছে, সেজন্যে সমাজে পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে সবাইকে সাধারণ অভীপ্সা মেনে নিতে হবে। সাধারণ অভীপ্সার অধিকারী বলে নিজেকে জাহির করে ফরাসি বিপ্লবের পর একনায়কত্ব গড়ে ওঠে। সাধারণ অভীপ্সার সুযোগ নিয়ে উত্তরকালে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে বলে মানবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন।

তিনি দেখিয়েছেন যে, ফরাসি বিপ্লবের পর উনিশ শতক থেকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের রূপায়ণের সমস্যা সরল সমাধানের পথ খুঁজে পায় ক্ষমতা অর্পণ (delegation) করে প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে। কারণ আগেই বলা হয়েছে যে বৃহৎ একটি দেশে সবাইকার পক্ষে সরাসরি প্রশাসনে অংশ নেওয়া সম্ভব নয়। তাই দেখা দেয় কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি। নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের কাছে জনগণের সার্বভৌমত্ব গচ্ছিত রাখার যে ব্যবস্থা, তাঁর মতে সেটারই নাম হল পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় গণতন্ত্র।

আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের সরকার গঠনে অধিকার থাকে। সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নির্বাচনের সময় লোকে তাদের সেই অধিকার প্রয়োগ করে। কিছু ব্যক্তির কাছে অথবা নির্বাচনের

উদ্দেশ্যে তৈরি, যাকে বলা হয় পার্টি, তার প্রতিনিধিদের কাছে লোকে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এর পরিণাম হয়ে দাঁড়ায় যে দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী কালে সার্বভৌম ক্ষমতার যথার্থ অধিকারী জনগণ হয়ে পড়ে অসহায়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্রিয়াকলাপে জনগণের কিছু করার থাকে না। কার্যত জনগণের সার্বভৌমত্ব হাতছাড়া হয়ে যায়। সার্বভৌম এই ক্ষমতা গচ্ছিত রাখার নাটক নির্দিষ্ট সময়ান্তরে অভিনীত হয় এক একটি নির্বাচনে। তাঁর মতে গণতন্ত্রের তত্ত্ব ও প্রয়োগের এটাই হল মস্ত স্ববিরোধ। গণতন্ত্রের হয় দুর্নাম। এই অবস্থার সুযোগে নানা ধরনের স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কত্ব মাথা চাড়া দেয়।

উল্লিখিত আলোচনাসূত্রে মানবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যতদিন না গণতন্ত্রের মূল আদর্শের পরিপন্থী এই পরোক্ষ গণতন্ত্রের অবসান হচ্ছে ততদিন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কোনো সম্ভাবনা নেই। পরোক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তিতে বহু ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে, যেসব রাষ্ট্র জনগণের অভীপ্সাকেই শুধু নয়, ব্যক্তির অস্তিত্বকেই অবজ্ঞা করে। এমনকি সাধারণ নির্বাচনের সময়েও ব্যক্তিমানুষ তার স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও ইচ্ছা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ, কোনো না কোনো পার্টির নির্দেশে তারা ভোট দেয় এমন কোনো ব্যক্তিকে যাকে তারা চেনে না বা কখনও দেখে নি। কাজেই কে বা কারা তাকে শাসন করবে সেব্যাপারে বিচার ও বাছাইয়ের কোনো অবকাশ থাকে না।[৪৪]

যখন প্রার্থীরা নিজেরাই এগিয়ে এসে ভোট চায় তখনও সামান্য কিছু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের লক্ষণ থাকে। সেখানে একজনের সঙ্গে একটি নির্বাচকমণ্ডলীর সম্পর্ক ফুটে ওঠে। কালক্রমে সংসদীয় রীতির মধ্যে পার্টিপ্রথা ঢুকে পড়েছে। সে-প্রথায় ভোটার কিংবা ভোটপ্রার্থীর কোনো ব্যক্তিসত্তা নেই। একদিকে ভোটারদের বিশাল জনসমষ্টি, অন্যদিকে পার্টির ভিড়। ব্যক্তির ইচ্ছা বা বুদ্ধি প্রয়োগের কোনো অবকাশ নেই; লোকের বিচারবুদ্ধির প্রতি আর ভোটের আবেদন না জানিয়ে জানানো হয় জনসমষ্টির আবেগের কাছে। নির্বাচনের প্রচারপদ্ধতি হল একটি গণ-হিস্টিরিয়ার মধ্যে দিয়ে কারো প্রতি ঘৃণা এবং পার্টি বিশেষের প্রতি আনুকূল্য সৃষ্টি করা। নির্বাচনে জয়ী প্রতিনিধির নির্বাচকদের কাছে আর কোনো দায়িত্ব বা আনুগত্যের প্রশ্ন থাকে না, কারণ তিনি তখন সম্পূর্ণ তাঁর পার্টির নির্দেশে চলেন, কারণ পার্টিই তাঁকে মনোনয়ন, টাকাকড়ি ও লোকলস্কর দিয়ে জয়ী করেছে।

দীর্ঘকাল ধরে এই ধারায় সংসদীয় গণতন্ত্র এখন বিভিন্ন পার্টির মধ্যে ক্ষমতার কাড়াকাড়িতে পর্যবসিত। পার্টি সমূহ লোককে ভোটের জন্যে নানা প্রতিশ্রুতি দেয়। শাসনক্ষতায় সময়ান্তরে এক একটি পার্টি আসে, সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করে। জনগণের সরকার কিংবা জনগণের

দ্বারা সরকারের পরিবর্তে বিরাজ করে জনগণের জন্যে (for the people) সরকার। মানবেন্দ্রনাথের মতে সেটা যথার্থ গণতান্ত্রিক সরকার নয়। সংসদীয় গণতন্ত্র তথা উদারনৈতিক রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্ব হল একটি ক্ষুদ্র অনুর (atom) মতো। তাতে ব্যক্তিবিশেষ স্বাধীন থাকে বটে, কিন্তু সেটা অর্থহীন যদি সেই স্বাধীনতা কার্যকর না হয়। অর্থাৎ সমাজে বিভিন্ন অনুর মতো অস্তিত্ববিশিষ্ট মানুষ খুবই অসহায়। তাতে জনগণের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, কারণ জটিল সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষ তার সার্বভৌমত্ব প্রয়োগে অক্ষম। ফলে লোকে আবার সেই যূথবন্ধ জনারণ্যে নিজের নিরাপত্তা খোঁজে।

তিনি একথাও বলেন যে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে মার্ক্সীয় মতাদর্শে বলা হয় যে, বিশেষ কোনো বিত্তশালী শোষক শ্রেণী ক্ষমতায় এসে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেছে। তার বিকল্প হিসেবে মার্ক্সীয় মতাদর্শে শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যৌক্তিকতা দেখানো হয়। মার্ক্সবাদীরা গণতন্ত্রকে নাকচ করেন নি; তাঁরা তার দোষত্রুটি দর্শিয়ে সর্বহারার একনায়কতন্ত্রের বিকল্প ব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। মানবেন্দ্রনাথের মতে ত্রুটিবহুল গণতন্ত্রের বিকল্প একনায়কতন্ত্র নয়।

অন্য একটি গণতন্ত্রবিরোধী রীতি হল যে, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রয়োজন পড়ে; তারপর বিভিন্ন দলের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ লেগে যায়। এক একটি সরকার গড়ে ওঠে আর ভেঙে যায়। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। লোকের মনোবলেও চিড় ধরে। অনেকে মনে করে যে বিশৃঙ্খল ও দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবেশ থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায় হল একনায়কতন্ত্রের প্রবর্তন। অতএব সে-দৃষ্টিতে একদলীয় একনায়কতন্ত্রই ভাল। সে-দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতার অন্তরায় হল গণতন্ত্র! সেজন্যে তথাকথিত যারা মানবজাতির পুনরুজ্জীবন চায় তারা গণতন্ত্র ছেড়ে মহান ব্যক্তি, মহান নায়ক, অতিমানব প্রভৃতির মধ্যে জাতীয় অভীপ্সা খুঁজে পায়; মনে করে যে ঐসব মহান ব্যক্তিরা জনগণের হয়ে প্রশাসন চালাবার পক্ষে সবচেয়ে উত্তম ও কর্মকুশল। মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই প্রবণতার পরিণাম ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্র। তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে বিশ শতকে দুটি বিশ্ব মহাযুদ্ধের মধ্যকালে দুধরনের একনায়কতন্ত্রের চাপে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব ক্রমে ক্ষীণ হতে শুরু করে। ইউরোপের বেশির ভাগ দেশেই কোনো-না-কোনো ধরনের একনায়কতন্ত্র কায়েম হয়ে যায়।

তাই পরিতাপের সঙ্গে তিনি বলেন যে গণতন্ত্রের যাঁরা সমর্থক অর্থাৎ যাঁরা গণতন্ত্রের সংকটকালে কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম—এই উভয় ধরনের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও গণতন্ত্র সম্পর্কে

নিজেদের মনোভঙ্গি প্রসারিত ও পরিবর্তিত করে গণতন্ত্রকে ত্রুটিমুক্ত করতে পারেন নি, যাতে গণতন্ত্র সমকালীন বিশ্বে বিরুদ্ধশক্তির চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে বেঁচে উঠতে সক্ষম হয়।

বিকল্প ব্যবস্থাসূত্রে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, একদিকে একনায়কতন্ত্রের বিরোধিতা এবং অন্যদিকে গণতন্ত্রের প্রচলিত সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করা দরকার। সেজন্যে চাই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গণতন্ত্রের রীতিনীতিগুলির নবোজ্জীবনসাধন। নির্বাচিত প্রতিনিধিকে ক্ষমতাপ্রদান (delegation of power) ব্যবস্থা তাঁর দৃষ্টিতে যে গণতন্ত্রের প্রকৃত অন্তরায় সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে বড় জোর জনগণের জন্য (for the people) সরকার হিসেবে সদাশয় একনায়কতন্ত্রী (benevolent dictatorship) সরকার হতে পারে। তাতে যথার্থ গণতন্ত্র গড়ে ওঠে না। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে একটা বিশাল দেশে যেখানে সমস্ত ক্ষমতা সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূতভাবে আবদ্ধ সেখানে জনগণের (of the people) এবং জনগণের দ্বারা (by the people) সরকার সম্ভব নয়। কাজেই ভাবতে হবে বিকেন্দ্রিত (decentralised) সরকারের কথা, যেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রী (direct democracy) সরকার কায়েম করা একটি বাস্তব ও কার্যকর চিন্তা হিসেবে গৃহীত হবে।

যথার্থ গণতন্ত্র প্রবর্তনের জন্যে মানবেন্দ্রনাথ যে-দুটি শর্তের প্রস্তাবনা করেন তার একটি হল, উল্লিখিত বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা এবং অপরটি হল, মানুষের আত্মনির্ভরশীলতা। সমাজে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় বিধিব্যবস্থার স্রষ্টা হল মানুষ। কালক্রমে মানুষই সেগুলির অধীনস্থ হয়ে পড়ে। মানুষের গণতান্ত্রিক সত্তা সে-অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়। উন্নত ধরনের রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্ভাবনা ও রূপায়ণের জন্যে চাই বিধিব্যবস্থার কর্তৃত্বে ব্যক্তি-মানুষের সার্বভৌমত্ব এবং প্রাধান্যের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মুশকিল হয়ে দাঁড়ায় যখন ব্যক্তিমানুষ থাকে অনুন্নত ও নিশ্চেতন। তিনি তাই বলেন যে, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে চাই লোকের মানসিকতার উন্নয়ন। তা নাহলে সেসবে দুর্নীতি বাসা বাঁধে, ত্রুটিবহুল বিধিব্যবস্থাকে দোষ দিয়ে কোনো লাভ নেই, যদি ব্যক্তিমানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা উন্নত না হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে বিধিব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে নিয়ে তারপর মানুষের কল্যাণচিন্তার প্রস্তাব কার্যকর নয়। কারণ মানুষই হল যাবতীয় বিধিব্যবস্থার প্রকৃত স্রষ্টা।

অনেক সময় মনে করা হয় যে, সাধারণ মানুষ নিজের সম্বন্ধেই চিন্তা করতে পারে না, নিজের ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা তার থাকে না—অতএব তাদের তথা দেশকে চালনার জন্যে চাই উপযুক্ত নেতা কিংবা দল। সাধারণ লোককে বড়জোর ভোটাধিকার দেওয়া যায়। ধরেই নেওয়া হয় যে ঐসব সাধারণ লোক নিজেদের চালাতে অক্ষম।

মানবেন্দ্রনাথ উল্লিখিত মনোভঙ্গির বিরোধিতা করে বলেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের মতে জড়বুদ্ধি মানুষ ছাড়া সকলেরই সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনা সমান। গুণাগুণের হেরফের থাকলেও সুযোগ সাপেক্ষ প্রতিটি মানুষের বিকাশের সম্ভাবনা সমান। প্রতিটি মানুষকে তার সুপ্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন ও যত্নবান করা প্রয়োজন।

গ্রীসের নগররাষ্ট্রের (city-state) অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রথম তাত্ত্বিক ও প্রবক্তা প্লেটো উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিক্ষা হল গণতন্ত্রের প্রাক-শর্ত। তার উল্লেখ করে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, "শিক্ষা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র সম্ভব নয়।" তবে শিক্ষা বলতে কেবল সাক্ষরতা ও পুঁথিগত বিদ্যামাত্র নয়। যাবতীয় বিষয় ও সমস্যার সমাধানে বিচারবুদ্ধি ও মননশীলতার বিকাশ এবং যুক্তিবোধের উন্মেষ হল যথার্থ শিক্ষা।

যখনই প্রতিটি নাগরিক তথা ভোটদাতার নিজের সম্পর্কে নতুনতম একটা বিচারশক্তি গড়ে উঠবে, তখন তাঁর নৈরাশ্য ও অসহায়তার ভাব কেটে যাবে। তাঁরা নিজেরাই তখন গণতন্ত্রের স্থানিক সংগঠন তৈরি করতে সক্ষম হবেন। তাঁরা বিচ্ছিন্ন অনুর মত আর অসংবদ্ধ থাকবেন না। মানবেন্দ্রনাথের মতে তাঁরা স্থানীয়ভাবে গণসমিতির (people's committee) মধ্যে দিয়ে সংগঠিত হবেন; তখন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (direct democracy) সম্ভব হবে। সাধারণ নির্বাচনের সময় তাঁরা বাইরে থেকে মনোনীত দলীয় কোনো ভুঁইফোড় প্রতিনিধিকে নির্বাচন না করে নিজেদের মধ্যে থেকে কোনো এক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করবেন। বিভিন্ন দল যখন তাদের প্রার্থী দাঁড় করাবে, স্থানীয় গণসমিতি তখন দলীয় প্রার্থীকে বাছাই না করে নিজেদের প্রতিনিধিকে দাঁড় করাবে। যিনি নির্বাচিত হবেন তাঁর প্রাথমিক দায়িত্ব হবে দলের পরিবর্তে তাঁর নিজস্ব নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন।

উল্লিখিত নির্বাচনপদ্ধতির সম্প্রসারণ করে মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, ঐ ব্যবস্থাকে ক্রমে রাষ্ট্রের একটি সংবিধানগত আইনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সাংবিধানিক অধিকারসহ স্থানীয় গণসমিতিগুলিকে রাষ্ট্রকাঠামোর প্রাথমিক ইউনিটে পরিণত করা সম্ভব। পিপ্‌ল্‌স্‌ কমিটি বা গণসমিতির মাধ্যমে জনসাধারণ স্থানীয় প্রশাসনের চিন্তাভাবনা ও উন্নয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হবে। স্বভাবতই তাঁদের দায়িত্ববোধও গড়ে উঠবে। বিভিন্ন আঞ্চলিক গণসমিতির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সুসংবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে জনসাধারণ রাষ্ট্রের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাবে। রাষ্ট্র আর তখন একটা সর্বশক্তিময় পীড়নযন্ত্র হিসেবে বিরাজ করবে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক হবে তখন পরস্পর সুসংবদ্ধ। বস্তুত রাষ্ট্র হল সমাজের কার্যনির্বাহী অঙ্গ। আদি মানবসমাজ যখন ক্রমে বৃহদায়তন ও প্রশাসনে জটিল হয়ে ওঠে তখনই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু রাষ্ট্র ক্রমে সমাজ থেকে স্বতন্ত্র সত্তা পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রের

মাধ্যমে সমাজের রাজনৈতিক প্রশাসনে ব্যক্তিমানুষের কোনো ভূমিকা নেই। সমাজের অধিবাসীদের নাগালের বাইরে সুদূর এক কেন্দ্রে রাষ্ট্রের যা কিছু ক্রিয়াকর্ম ও অবস্থান।

মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত বিকেন্দ্রিত গণতন্ত্রে সমাজ ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক বন্ধনের ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমাজ তথা রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে উঠবে সর্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ সংযোগ ও সুবাদ। স্পষ্টতই এর জন্যে চাই নাগরিকদের যথার্থ শিক্ষা। সেজন্যে নতুন কোনো ব্যবস্থা বা কারো নির্বাচিত হয়ে আসার অপেক্ষায় থাকলে চলবে না। তিনি তাই বলেন যে, কাজটা শুরু করলে এবং তার মূল্য প্রমাণিত হলে ক্রমে তা অন্যত্র বিস্তার লাভ করবে এবং এক সময়ে দেশের সমগ্র ব্যবস্থায় সেটা প্রতিফলিত হবে। প্রতিষ্ঠিত হবে যথার্থ গণতন্ত্র।

আপত্তিটা উঠবে সময়সীমা নিয়ে। কাজটা কতদিন সময় নেবে—পঞ্চাশ কেন একশ বছরও লেগে যেতে পারে। সে-প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন; নইলে এর বিকল্প কি আছে? মানবেন্দ্রনাথের মতে সেটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। বিকল্প বাকি যাবতীয় পথ সব দীর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র কিংবা স্বৈরতন্ত্র। যাঁরা ও-দুটি পথের কোনোটিতে আস্থাবান তাঁদের নতুন পথের প্রয়োজন নেই। যাঁরা উন্নত নতুন পথের সন্ধানী, তাঁদের কাছে তাঁর প্রদর্শিত পথই একমাত্র যুক্তিবহ বিকল্প পথ বলে তিনি দাবি করেন।

তাহলেও সময়সীমার প্রশ্নটাকে মানবেন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নি। কারণ সমস্যাগুলি সব জরুরি। স্থির সংকল্প নিয়ে শুরু করলে সময় বেশি লাগার কারণ নেই। তাঁর মতে ভারতে গণতন্ত্রের যাত্রাতো সবেমাত্র শুরু হয়েছে। সেজন্যে তলা থেকে (from below) গড়ে ওঠার সুযোগ এখানে দেওয়া সমীচীন। অন্যান্য দেশে গণতন্ত্র উপর থেকে (from above) চাপিয়ে দেওয়া হয় বলে সেটা সফল হয় নি, তাতে কোনো মৌল পরিবর্তন সম্ভব নয়। কোথাও যা হয় নি, অর্থাৎ ডগার বদলে গোড়া বা নিম্নস্তর থেকে গণতন্ত্রকে গড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া ভাল।

মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, ক্ষমতা অর্জনই যে রাজনীতির অভীষ্ট বস্তু—সে-ধারণাটা ভেঙে ফেলা দরকার। লোকের চিরাচরিত ধারণা যে ক্ষমতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। দলীয় রাজনীতিরও উদ্ভব ঘটে সেই একই ধারণার বশে। সহিংস অথবা নিয়মতান্ত্রিক—যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক ক্ষমতা দখলই হল চূড়ান্ত লক্ষ্য। সব দল চায় ক্ষমতা দখল করতে—এই যুক্তিতে মুষ্টিমেয় কিছু লোকই কেবল নাকি জানে সমাজকে কিভাবে চালাতে হয় এবং ভোটারদের উচিত তাদের ভোট দেওয়া যাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা তাদের অভীষ্ট চিন্তাভাবনা উপর থেকে চাপিয়ে দিতে পারে, যেসব চিন্তা সাধারণ লোকের পক্ষে করা নাকি সম্ভব নয়।

উল্লিখিত দলীয় রাজনীতি তাঁর মতে গণতন্ত্রের পরিপন্থী। তাতে

মানুষের সহজাত বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা তথা সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা হয়। তাতে গণতন্ত্র একটা ফাঁকা বুলি হয়ে দাঁড়ায়, যদি সার্বভৌমত্বে লোকের কিছু করার না থাকে।

কেন্দ্রাভিগ রাষ্ট্রশক্তির বিরোধী মানবেন্দ্রনাথ চাইতেন সর্বাত্মক বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থা। তাঁর মতে কেন্দ্রাভিগতায় মানুষের কর্মোদ্যম ও স্বাধিকার খর্ব হয়। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের দেশব্যাপী সংগঠন ও আর্থিক শক্তির সাহায্যে দেশকে কেন্দ্রাভিগতার পথেই ঠেলে দেয়। সোভিয়েতে এই প্রথা প্রবর্তিত হলেও সেখানকার monolithic কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রাভিগ আধিপত্যে ঐ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো বজ্রকঠিন ব্যবস্থায় আবদ্ধ। সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক অধিকার থাকলেও পার্টিশক্তিই সে-দেশকে কেন্দ্রাধীনে একই সুর ও ছন্দে চলতে বাধ্য করে।[৫]

দলহীন রাজনীতি

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে গৌণ ও নিষ্প্রয়োজন। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনকল্পে রাষ্ট্রশক্তি দখল ছাড়া গত্যন্তর নেই এই মনোভাব থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেন। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় প্রতিশ্রুত সামাজিক বিপ্লব রাষ্ট্রশক্তি দখল করা সত্ত্বেও অসাধিত থেকেছে। কাজেই সেটা লক্ষ্যে পেঁছনোর একমাত্র পথ নয়। তিনি মনে করতেন যে, কলকারখানা বা ক্ষেত-খামারে যথার্থ সমাজ-বিপ্লবের কার্যক্রম পার্টিবাজী ও ক্ষমতাদখল প্রচেষ্টা অপেক্ষা অধিক ফলপ্রসূ।

মানবেন্দ্রনাথের সুগঠিত গণতন্ত্রের আদর্শ পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করেছে পার্টিবিহীন রাজনৈতিক প্রত্যয়ে। তাঁর মতে পার্টি-প্রথায় গণতন্ত্রী আদর্শ স্ববিরোধী হতে বাধ্য। কারণ পার্টি বলতে জনসাধারণের একটি অংশকেই মাত্র বোঝায়; অথচ গণতন্ত্র সমগ্র জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা। কাজেই অংশ যেমন সমগ্রের সমতুল্য হতে পারে না, তেমনি পার্টি-গণতন্ত্রও অসম ও স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। পার্টি-সরকারের পরিচালনা জনসাধারণের জন্য হতে পারে, জনসাধারণের দ্বারা নয়। পার্টি-সরকার যদি গণতান্ত্রিক আখ্যা পায় তাহলে সহৃদয় স্বেচ্ছাচারিতাও (benevolent despotism) সেই গণতন্ত্রের নামান্তর।[৪৬]

উপরন্তু পার্টি-রাজনীতি ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়, পার্টি-গুলি চায় ক্ষমতা দখল। তাই তারা নির্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। যে-কোনো দ্বন্দ্বেরই একটা নিজস্ব ধারা থাকে—যেখানে নীতির স্থান শূন্য। সেই দ্বন্দ্বমুখর পথে যেতে গিয়ে পার্টিগুলিকে ধাপ্পাবাজি, ঘুষ, দুর্নীতি, জোচ্চুরি, গুণ্ডামি ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়। জনসাধারণের পশ্চাৎপদতা ও অশিক্ষাই

রাজনীতিকদের শ্রেষ্ঠ মূলধন। পার্টির আদর্শ ও পার্টির নেতারা সর্বক্ষেত্রে মন্দ না হলেও মূলত পার্টি-রাজনীতি এবং তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত প্রশাসন ব্যবস্থার গলদ এই অনভিপ্রেত পথকে প্রশস্ত করে তোলে। তাই মানবেন্দ্রনাথ পার্টিবিহীন রাজনীতির পথ উদ্ভাবন করেছেন।[৪৭]

তাঁর দৃষ্টিতে পার্টি মাত্রেই মূলত সমষ্টিবাদী; পার্টির কার্যক্রমে শ্রেণী, জাতি, দেশ, ধর্ম ইত্যাদি যূথবাদী আদর্শ প্রাধান্য লাভ করে; সেখানে ব্যষ্টির স্থান নগণ্য। পার্টি-রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে ঘূর্ণয়িমান মানুষকে উদ্ধারের উপায়স্বরূপ তিনি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন—যে-শিক্ষা দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, যথোচিত সমাজচেতনা এবং মানবিক বিকাশসাধনে সক্ষম।

পার্টি-প্রথায় উপর থেকে সবকিছু আরোপ করা হয়। জনসাধারণ পার্টির হাতে পুতুল হয়ে থাকে। মানবেন্দ্রনাথ স্থানিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত গণসমিতির (People's Committee) ভিত্তিতে নীচে থেকে উপরে বিন্যস্ত কাঠামোর সাহায্যে যাবতীয় নীতি-নির্ধারণ ও প্রশাসনের প্রস্তাব করেছেন। স্থানিক গণতন্ত্রের আদর্শেই তিনি রাষ্ট্রকাঠামোর এক সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরেছেন: স্থানিক সংগঠনের অন্যতম কাজ হবে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের চিত্ত-বৃত্তিকে পরিশীলিত করা এবং জনজীবনকে যথোচিত পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করা। অন্যান্য কাজের সঙ্গে স্থানীয় নাগরিকদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সক্রিয় চেতনার চাই উন্মেষ সাধন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রশাসন-কর্মে যাতে নির্বাচকদের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সজাগ দৃষ্টি থাকে তার অনুকূল ব্যবস্থা রাখা চাই। প্রয়োজনে প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনা (recall) ও গণভোটের (referendum) সুযোগ থাকা চাই। নির্বাচনে স্থানিক গণসমিতিই প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন। উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া অথবা পার্টিবিশেষের প্রার্থী মনোনয়ন-প্রথা নির্বাচনের মানদণ্ড হবে না। জনসাধারণ দলীয় রাজনীতির সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ইচ্ছা ও আত্মনির্ভতায় সৎ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রার্থীদের সরাসরি নির্বাচিত করার সুযোগ পাবে। স্থানিক কর্মপদ্ধতি ন্যায়নিষ্ঠ ও মানবিক মূল্যে নিরূপিত হবে; পার্টি-প্রথার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুফল হল নির্বাচকমণ্ডলীর চেতনা ও মননশক্তির বিকাশ। প্রস্তাবিত এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বয়স্ক প্রতিটি ব্যক্তিরই থাকবে প্রত্যক্ষ সংযোগ। এই প্রণালীর সঠিক রূপায়ণ ও সাফল্য নীতিনিষ্ঠ ও উন্নত মননশীল ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগের উপর নির্ভর করে। স্থানিক সমিতির কাজ হবে মানুষের যুক্তি ও নীতিবোধকে জাগিয়ে তুলে জনকল্যাণকর কাজে নিরন্তর নিযুক্ত থাকা। মুক্ত ও মননশীল মানুষের এই সংগঠন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে।[৪৮]

সুগঠিত গণতন্ত্রের আশু রূপায়ণের সম্ভাবনা যে নেই সে-সম্পর্কে মানবেন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি অন্তবর্তীকালীন এক সহজসাধ্য

পন্থা দর্শিয়েছেন—যেসময়ে বর্তমান ব্যবস্থাই বলবৎ থাকবে। তখন একটি রাজ্য পর্ষদের উপর অর্থনৈতিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সুস্থ সমাজ-গঠনের সর্ববিধ বিধিব্যবস্থা রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে। চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক অর্থনীতিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশাদার গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান উক্ত পর্ষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। পর্ষদের অধ্যক্ষ তদতিরিক্ত আরও কিছু কর্মকুশল নির্দলীয় ব্যক্তিকে পর্ষদে অন্তর্ভুক্ত করবেন।[৪৯]

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে মনোভাব

ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কাজে ও কথায় মানবেন্দ্রনাথই সর্বাপেক্ষা অধিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। ইউরোপের একদল রাষ্ট্রদার্শনিক মনে করেন যে ফ্যাসিবাদের কোনো দার্শনিক বনিয়াদ নেই। ম্যাকাইভার, মেয়ার, ল্যাস্কি, নিউম্যান প্রমুখ দার্শনিকেরা ফ্যাসিবাদের দর্শনগত অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে হেগেলের "machpolitic" প্রত্যয় ও রাষ্ট্রের আধিপত্য, নীট্শের অতিমানব প্রত্যয় ও কাণ্টের নীতিতত্ত্ব থেকে ফ্যাসিবাদ তাত্ত্বিক উপকরণ সংগ্রহ করেছে মাত্র। এবং মার্টিন লুথারের রাষ্ট্রের কাছে আত্মসমর্পণ প্রত্যয় এই মতবাদকে পুষ্ট করেছে।

মানবেন্দ্রনাথের মতে ফ্যাসিবাদের একটা সুস্পষ্ট দার্শনিক বনিয়াদ আছে। কমিউনিজমের নিছক বিরোধী শক্তি হিসেবে তার উৎপত্তি ঘটে নি। এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর *Fascism* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ফ্যাসিবাদের অভ্যুদয় আকস্মিক নয়। দীর্ঘকাল পূর্বেই তার দার্শনিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল। জাগতিক ন্যায়নীতি, বিচারবিবেক ও মুক্তির আবেগকে বর্জন করে ফ্যাসিবাদ দিব্য প্রেরণার আশ্রয় নেয়। রেনেসাঁসের আমলে মানুষ যে-রাজনৈতিক মুক্তি ও চিন্তার অবাধ স্বাধীনতার আস্বাদ পায় তা হরণ করার জন্যেই এই দর্শনের উদ্ভব ঘটে। যুক্তিবোধ ও স্বাধীন চিন্তা থেকে মানুষকে প্রতিনিবৃত্ত করে ঐশ্বরিক অছিলায় আত্মত্যাগে ও সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের ক্রীড়নকরূপে বিশেষ অভিসন্ধিমূলক কাজে মানুষকে প্রবৃত্ত করানোই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরের অভীপ্সা ও আদেশরূপেই (Contemplation of God) হিংসা ও বর্বরতা ঘটে চলে। ফ্যাসিবাদী অধিনায়কের দৃষ্টিতে 'জনগণ রাষ্ট্রের কাছে অনুগত, রাষ্ট্রের আনুগত্য আমার কাছে এবং আমিই ঈশ্বরের প্রতিভূ'। এখানে হিন্দু অবতারবাদের সঙ্গে তার সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সকলকে বঞ্চিত করে মৌরসিস্বত্ব ভোগ করেন যে, ফ্যাসিস্ট নেতা তিনি ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি এবং এক মহামানব বিশেষ।

হেগেলের দ্বান্দ্বিক দার্শনিক পদ্ধতিকে বিকৃতরূপে প্রয়োগ করে ইতালির

ফ্যাসিবাদী মতবাদের দর্শনগুরু যোভানি জেন্তিলে বলেন—

God and thought (respectively) represent the two opposite poles of life, both necessary and both essential, yet opposed to and contradictory to each other.[৫০]

তাঁর মতে ঈশ্বর ও মানুষ হল : "Flexible unity in the eternal movement of self-realisation—a living and therefore restless unity, always dissatisfied with itself."[৫১]

মানবেন্দ্রনাথের মতে এই চিন্তাধারার সঙ্গে হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদের মিল সুস্পষ্ট। তিনি বলেন—

What is mysticism after all, but mental confusion which takes refuge in obscurantism to reject experimentally demonstrated scientific truths and rationally established philsophical concepts ? Fascist philosophy as expounded by Gentile is a classical specimen of mysticism.[৫২]

অতীন্দ্রিয়বাদীরা মনে করেন ঐশ ইচ্ছায় মানুষ চিন্তা করে, এবং কাজ করে ; তার স্বাধীন সত্তা বলে কিছু নেই। হেগেলীয় প্রভাবে অংকুরিত ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র ধর্ম ও আধ্যাত্মিক মূল্যবত্তার আশ্রয় নেয়। তদনুযায়ী অন্যের সার্বভৌমতার স্বীকৃতি আত্মহত্যার সামিল। যাকিছু আধ্যাত্মিক তার অস্তিত্ব স্বাধীন, কিন্তু সবকিছুই আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রের অধীন।

ফ্যাসিবাদী চিন্তার অন্যতম প্রবর্তক নীটশের গুরু ছিলেন শোপেনহাওয়ার, যিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন ভারতের সনাতন ভাবধারায়। মানবেন্দ্রনাথের মতে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ফ্যাসিবাদের পক্ষে যথেষ্ট উর্বর। ভারতীয় অধিবিদ্যার ও ফ্যাসিবাদের উৎস একই স্থানে, যেখানে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির অগম্য অতীন্দ্রিয় সত্তা চরম ও পরম জ্ঞানরূপে বিবেচিত। জীবনবিমুখ আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে স্থূল বস্তুবাদ ফ্যাসিবাদে সমন্বিত হয়েছে। এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ অবদান বের্গস-র এবং তাঁর শিষ্য জর্জ সোরেলের। ফ্যাসিবাদী দর্শনের দ্বৈত প্রক্রিয়ায় একদিকে বিরাজ করেন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর স্বয়ং এবং অপরদিকে তাঁরই একমাত্র প্রতিভূ এক মহামানব ; তিনি রাষ্ট্রের রক্ষক ও পালনকর্তা এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ; তাঁর সকল কাজের পিছনে থাকে দিব্য আদেশ ও অনুমোদন। মহামানব-তত্ত্বের মূর্ত প্রতীক ছিলেন মুসোলিনি, হিটলার প্রমুখ রাষ্ট্রীয় কর্ণধারেরা। বিগত দিনের দেব দ্বিজ ও রাজার স্থান নিয়েছেন আধুনিক যুগের বিপ্লবী বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐসব ডিক্টেটরেরা। ফ্যাসিবাদী দর্শনের প্রেরণায় তাঁদের আচরণে হিংসা, বর্বরতা, নিপীড়ন, অত্যাচার প্রভৃতি যাবতীয় অমানুষিক সত্তা পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে। এঁদের আদর্শে রাষ্ট্রই হল সব, মানুষ কেবল তার খেলার পুতুল। ভন প্যাপেনের ভাষায় : "The

function of woman is to bear children to be soldiers. There is no more glorious ideal life than to die on the field of battle." রণাঙ্গণে বীরের মৃত্যুতেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। ফ্যাসিবাদীরা ধনতন্ত্রবাদের সমালোচনা করে—শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার জন্যে নয়; ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও উদারনৈতিকার বিরুদ্ধার্থে। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যে ফ্যাসিস্টরা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রেরও বিরোধী। তাদের জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের জিগির সোনার পাথর বাটির মতো।

ভারতের বহু রাষ্ট্রনেতার আদর্শ ইতালির জাতীয়তাবাদী দার্শনিক মাৎসিনিকেও মানবেন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের পুরোধারূপে দেখিয়েছেন। মাৎসিনি ধর্মের যূপকাষ্ঠে নীতিকে উৎসর্গ করার পক্ষপাতী ছিলেন; স্বাধীনতার নামে তিনি চেয়েছেন দাসত্বেরই পুনর্বহাল; সেখানে মানুষের দায়দায়িত্ব আছে অনেক, নেই কেবল অধিকার।[৫৩] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও ফ্যাসিবাদী চিন্তা ও আচরণ প্রবল বলে তিনি ঐদলের তীব্র সমালোচনা করেন।

অধুনা কমিউনিজমের সঙ্গে ফ্যাসিজমের আংশিক সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথের মতো মানবেন্দ্রনাথও প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর মতে বস্তুবাদী যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বহুলাংশে অচল মার্কসীয় তত্ত্বের প্রতি কমিউনিস্টদের অন্ধ আবেগ ও আনুগত্য শাস্ত্রে অনুরক্তির সামিল; ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদ, সর্বহারাদের একচেটিয়া বিপ্লবী চেতনা ও একনায়কত্ব ছাড়াও কমিউনিস্টদের উদারতন্ত্রে ও গণতন্ত্রে অনাস্থা ফ্যাসিস্টদেরই সমগোত্রে তাদের নিয়ে গেছে; শ্রেণী ও দলের একনায়কত্বে বিশ্বাসী কমিউনিস্টদের চিন্তায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্থান নেই; ফ্যাসিস্টদের মতো যূথবদ্ধ, রাষ্ট্রসর্বস্ব ও ফৌজি (collective, totalitarian and regimented) সমাজব্যবস্থায় মানুষের সহজাত মৌলিক সত্তা—মুক্তির আবেগ, সৃষ্টির প্রয়াস এবং যুক্তির প্রতি নিষ্ঠাকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে।[৫৪]

মানবেন্দ্রনাথ ও ল্যাস্কি ফ্যাসিবাদকে প্রতিবিপ্লবের আধার এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী এক শক্তিরূপেও প্রত্যক্ষ করেন। মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামো বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় সেখানকার মুমূর্ষু পুঁজিপতিরা আত্মরক্ষার জন্যে ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নেয়। ক্ষয়িষ্ণু ধনতন্ত্রবাদকে বাঁচিয়ে তোলার তাগিদে জার্মানিকে মধ্যযুগে ফিরে যেতে হয়। প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীলদের হরগৌরী মিলন ঘটে ফ্যাসিবাদের রঙ্গমঞ্চে। মধ্যযুগীয় চিন্তা ও পূর্বের লুপ্ত সাংস্কৃতিক ধারাকে ফ্যাসিবাদ পুনরুজ্জীবিত করে। মানবেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, ধনতন্ত্রবাদের চূড়ান্ত বিকাশ ও পরিণতি সাম্রাজ্যবাদী পথে যখন নিঃশেষ হয়ে পড়ে তখন তা ফ্যাসিবাদের আশ্রয় নেয়।[৫৫] ধনতন্ত্রবাদের শিল্পোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সমাজোন্নতি শিথিল হয়ে যায়।

মানুষ হয়ে পড়ে নিঃস্ব ও নিঃসহায়। দুর্বল হীনবীর্য মানুষের কাছে ফ্যাসিবাদ টোটালিটারিয়ান জাতি-প্রত্যয়ের সাহায্যে ভাবাবেগ সৃষ্টি করে; এবং এমন এক রঙীন স্বপ্ন দেখায় যেটা সাধারণত তাদের আয়ত্তের অতীত। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দাপটে লোকে যতই নিরাপত্তার অভাব বোধ করে ফ্যাসিবাদী শাসনতন্ত্র ততই ধোঁয়াটে ভাবাবেগ ও উন্মাদনার সাহায্যে নিজ শক্তি বর্ধন করে; struggle for existence তত্ত্বের সাহায্যে উগ্র জাত্যভিমানকে খুঁচিয়ে তোলা হয়; জাতির আধিপত্য ও অগ্রাধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে হিটলারী প্রণালীতে নৃতত্ত্বকে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা দান করা হয়।[৫৬]

আর্থনীতিক চিন্তা

মানবেন্দ্রনাথের নবমানবতাবাদী দর্শন সম্পৃক্ত আর্থনীতিক চিন্তাও যথেষ্ট অভিনব। দর্শন ও রাজনীতির মতো অর্থনৈতিক বিষয়েও তিনি এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর চিন্তা প্রধানত সমসাময়িক ভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত। অর্থনীতি সম্পর্কে মৌল চিন্তা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় তাঁর অনেক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি যেমন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে তৃতীয় পথস্বরূপ সুগঠিত গণতন্ত্রের পথ উদ্ভাবন করেছেন, অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের কোনোটিকেই না নিয়ে তৃতীয় বিকল্পস্বরূপ সমবায় অর্থনীতির পথ রচনা করেছেন। দর্শন ও রাজনীতির মতো অর্থনৈতিক বিষয়েও তাঁর মুক্তির আদর্শ প্রাধান্য লাভ করেছে। তিনি বলেন—

> The economy of the new society also requires to be clearly defined. It will be planned with the purpose of promoting the freedom and well-being of the individual. It will, on the one hand, eliminate production for profit and, on the other hand, avoid unnecessary concentration of control It will not allow individual freedom to be jeopardised by considerations of technical efficiency. As such, the economy will be neither capitalist nor socialist, but co-operative.[৫৭]

তাঁর আর্থনীতিক চিন্তাভাবনার আনুপূর্বিক একটি রেখাচিত্র আঁকা যাক। দেশের প্রাক-স্বাধীন কালে গঠিত তাঁর আর্থনীতিক চিন্তা স্বভাবতই কার্যকারিতার দিক থেকে দানা বাঁধে। মার্কসবাদী জীবনে মার্কসীয় অর্থনৈতিক

তত্ত্বের প্রভাবাধীনে থাকলেও ঐ-সময়কার চিন্তায় তাঁর স্বাধীন মনের পরিচয় বহু সূত্রে ফুটে ওঠে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে কৃষি, শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তিনি যে ভিন্ন দিকের নিশানা দেন তা আজো অনুসরণীয়।

তাঁর মতে ভারতের শিল্পোন্নয়নকে যথার্থ কার্যকর করে তুলতে হলে কৃষিরই উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া চাই। কৃষিনির্ভর দেশের গরিষ্ঠ জনসংখ্যা অনুন্নত থাকলে সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রারম্ভিক পদক্ষেপস্বরূপ তিনি দুটি পন্থার উল্লেখ করেন—

Firstly, labour must be released from the primitive social function of producing food for a bare existence. For that purpose, it must be freed from the bondage of decayed feudal relations. And secondly, it must be more fruitfully employed through the introduction of modern means of production both in agriculture and industry.[২৮]

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পুনর্গঠনকল্পে মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কয়েকজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কর্তৃক রচিত *People's Plan* (১৯৪৪) গ্রন্থে এই কথাটিকে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়। ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক যোজনা এই চিন্তার প্রভাবে অনেকাংশে ফলদায়ক হয়েছিল। প্রাক-স্বাধীন কালে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন যে, ভারতের দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটলেই তার অর্থনৈতিক সমস্যার সুরাহা হবে। তাই তাঁরা জাতীয় শিল্পকে বিদেশী আমদানির হাত থেকে সংরক্ষণের জন্য উপযোগী বিধিব্যবস্থা চাইতেন। তাতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের কায়েমী স্বার্থে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে বলে মানবেন্দ্রনাথ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি গঠনের সময়ে দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ও ভারী শিল্পকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। তারই রেশ টেনে পরবর্তীকালে ভারতীয় পুঁজিপতিরা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' রচনা করে।

মানবেন্দ্রনাথ কৃষিকে অগ্রাধিকার দিলেও শিল্পোন্নয়নকে উপেক্ষা করেন নি। তবে তাঁর শিল্পনীতির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন; প্রশ্নটিকে তিনি নিছক মূলধনের বিনিয়োগ ও মুনাফার দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁর মতে জনসাধারণের ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন ও অধিক কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে শিল্পোন্নয়ন হওয়া উচিত; শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক উপাদান তিনটি—

Firstly, an abundant supply of labour; secondly, accumulated wealth could be converted into productive capital; and thirdly, a sufficiently large internal market.[২৯]

ভারতে প্রথম দুটির অভাব নেই। তৃতীয়টি আছে সুপ্ত অবস্থায়।

দেশবাসীর জীবনমানের উন্নতিসাধন প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ; তাই দেশের চাহিদা মিটিয়ে বহির্বাজারে পণ্য রপ্তানি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেজন্যে দরকার উৎপাদনকে আশু ভোগ্যবস্তুর চাহিদার সঙ্গে যুক্ত করা এবং সেইসঙ্গে মুনাফার নিয়ন্ত্রণ। *People's Plan*-এ ভোগ্যবস্তুর উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

কৃষি ও শিল্পোৎপাদনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য থাকা চাই। চাহিদার পশ্চাদ্‌ভূমি হল দেশের বৃহত্তর গ্রামীণ জনসংখ্যা। গরিষ্ঠ জনসংখ্যা পশ্চাৎপদ থাকলে শিল্পোন্নয়ন হবে নিষ্ফল। ভারতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক যোজনা থেকে কৃষিকে অবহেলা করে শিল্পকে অনর্থক প্রাধান্য দেওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক সংকট ঘটেছে।

অন্যদেশের অনুকরণে ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিবর্তে মানবেন্দ্রনাথ ভারতের প্রকৃত সমস্যা ও প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে স্বতন্ত্র নীতি-নির্ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উভয় গোষ্ঠীই মনে করে যে, ভারতের অর্থনৈতিক দুর্গতি নির্মূল করার একমাত্র উপায় বুঝি দ্রুত শিল্পোন্নয়ন। প্রভেদ এই যে প্রথম গোষ্ঠী চায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও মোটা মুনাফার অঙ্ক ; পক্ষান্তরে রাষ্ট্র বা সমাজের মালিকানায় শিল্পোন্নয়ন হল দ্বিতীয় গোষ্ঠীর কাম্য।

মানবেন্দ্রনাথ দেশের দ্রুত বর্ধমান জনসমস্যাকে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতেন। প্রস্তাবিত ভারী শিল্পের বিস্তারে কৃষি থেকে বড় জোর কোটি খানেক উদ্বৃত্ত মানুষের কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব। কিন্তু কৃষিকে অবহেলা করার ফলে খাদ্যের অনটন ও মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে শিল্পের উৎপন্ন বস্তু লোকের ক্রয়ক্ষমতা ও চাহিদার অভাবে জমে থাকবে। মুনাফার হ্রাস ঘটলে পুঁজিপতিরা উৎপাদন কমাবে। সেই অবস্থাই ভারতে এখন দেখা দিয়েছে। দেশীয় শিল্পকে বাঁচানোর জন্যে সরকার এগিয়ে আসে ; সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা বাড়ে। সীমিত মুনাফা, মালের কাটতি না হওয়া ইত্যাদি অছিলায় ভারতীয় মূলধন সংকুচিত হয়েছে ; তাই প্রস্তাব উঠেছে আরো বিদেশী মূলধন আমদানি করার। বলা বাহুল্য বিদেশী মূলধন মানে মার্কিন মূলধন ও সেইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাব-বিস্তারের সম্ভাবনা।[৬০]

অপরদিকে সমাজতন্ত্রীরা চাইছেন শিল্পের জাতীয়করণ। শিল্পে অনুন্নত দেশে এই নীতি বিপজ্জনক। মার্কস ধনতন্ত্রবাদের সংকট সীমানায় সমাজ-তন্ত্রের উদ্ভব ঘটবে বলেছিলেন ; তার প্রধান পরিপূরক হল উন্নত শিল্প ও পরিণত শ্রমিক শ্রেণী। অনুন্নত দেশের শ্রমিক শ্রেণী জীবিকায় অর্ধ-কৃষক। কাজেই অধুনা সমাজতন্ত্রীদের মনোভাবের সঙ্গে মার্কসের বৈজ্ঞানিক চিন্তার মিল নেই।[৬১]

ভারী শিল্পের আশু প্রবর্তনের মতো প্রচলিত আর একটি ধারণা এই যে, কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক আধুনিকীকরণ কৃষিসমস্যার সমাধান করবে। এবিষয়েও

মানবেন্দ্রনাথ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে এদেশে কৃষিক্ষেত্রে বৃহৎ যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। তাতে বেকার সমস্যাকে অনর্থক বাড়িয়ে তোলা হবে। যেদেশে জনসংখ্যা অল্প অথচ কর্ষণীয় জমি বিশাল সেখানেই যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ভারতে জমির অনুপাতে চাষীর সংখ্যা অধিক। যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন ঘটলে বর্তমান কৃষিজীবী জনসংখ্যার শতকরা দশ জনকে দিয়ে সমগ্র কাজ করানো যাবে। ফলে উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে তখন সর্বোন্নত শিল্পেও নিয়োগ করা যাবে না। তাছাড়া কৃষিতে বৃহৎ যন্ত্রের ব্যবহারসূত্রে বিদেশী সাহায্য বা মূলধনেরও প্রয়োজন হবে অনিবার্য।[৬২]

মানবেন্দ্রনাথের মতে অত্যধিক জনসংখ্যা ও খণ্ড-খণ্ড কৃষিক্ষেত্র এদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে টুকরো-টুকরো জমিগুলিকে একত্র করা, সার হিসাবে গোময় ব্যবহার ও পুকুর, ইঁদারা ইত্যাদির সাহায্যে সেচব্যবস্থার কার্যকারিতায় তিনি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে যন্ত্রের চেয়েও বেশি প্রয়োজন সংগঠিত প্রয়াস ও উন্নত পদ্ধতির। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগের সুবিধার্থে রাস্তাঘাটেরও উন্নতি হওয়া দরকার। স্থানীয় চাহিদা ও বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যে ছোট ছোট শিল্প, পশুপালনের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির বিস্তার হওয়া উচিত।[৬৩]

মোটের উপর কৃষিনির্ভর ভারতের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জীবনমান উন্নয়নের প্রধান উপায় কৃষির যথোচিত উন্নতি সাধন। তাতে মানুষের ভাত-কাপড়ের সমস্যা যেমন একদিকে মিটবে, অপরদিকে তেমনি শিল্পে উৎপন্ন মালের সম্ভাব্য বাজারও প্রসারিত হবে।

নবমানবতাবাদী অর্থনীতিতে পরিকল্পিত উদ্যমকে বর্জন করা হয় নি। কিন্তু সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সরকারি আধিপত্য, কেন্দ্রাভিগ আমলাতন্ত্র ও শোষণে আবদ্ধ থাকে। অথচ তারই বিনিময়ে মানুষকে দিতে হয় এক মস্ত মূল্য—তা হল ব্যক্তিস্বাধীনতা। সেজন্যে মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন—

> State ownership and planned economy do not by themselves end exploitation of labour; nor do they necessarily lead to an equal distribution of wealth...planned economy under political dictatorship disregards individual freedom on the pleas of efficiency, collective effort and social progress. Consequently a higher form of democracy in the socialist society, as it is conceived at present becomes an impossibility. Dictatorship defeats its professed end.[৬৪]

নবমানবতাবাদী অর্থনীতিতে উৎপাদনের লক্ষ্য মানুষের ব্যবহার, মুনাফা নয়। তেমনি অর্থনৈতিক সাম্যের প্রলোভন দেখিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণও

তার অভিপ্রায় নয়। এই ব্যবস্থায় সমবায় সংগঠনের ব্যাপক বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে যৌথ কৃষিকর্ম, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি কাজ চলবে। বিভিন্ন অঞ্চলের সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতার সম্পর্ক থাকবে এবং সেগুলি নীচে থেকে উপরে ক্রমান্বয়ে পিরামিড আকারে বিন্যস্ত হবে। উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার পরিচালক হবে এই সমিতিগুলি—

> It will consist of a network of consumers' and producers' co-operatives and the economic activities of the society shall be conducted and co-ordinated by the people through these institutions. The co-operative economy shall take full advantage of modern science and technology and effect equitable distribution of social surplus through universal social utility services.[৩৫]

অর্থনৈতিক মুক্তি না ঘটলে মানুষের গণতান্ত্রিক আচরণতো দূরের কথা তার মনুষ্যত্বের উন্মেষও যে অসম্ভব তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। তাঁর মতে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের নিষ্কর্ষে রচিত সমবায়ী পদ্ধতিতে মানুষের বৈষয়িক উন্নয়ন সাধিত হবে। Managerial Socialism-এর মতো Managerial Democracy-ও তাঁর আদর্শের পরিপন্থী। তিনি চেয়েছেন গাছের ডগার পরিবর্তে গোড়ায় বারি সিঞ্চন করতে। তাই রাজনৈতিক প্রশাসনের মতো অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থাকেও তলা থেকে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সমবায়ী অর্থনীতির যে-চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন তার রূপায়ণ ও পরিচালনার দায়িত্ব দেশব্যাপী স্থানিক গণসমিতিগুলির উপর নির্ভর করবে। স্থানিক গণসমিতির অবর্তমানে সমবায় সমিতিই তার কর্মভার বহন করবে।

ডি ক লো নি জে শ ন থি ও রি

মানবেন্দ্রনাথের বহু কিছু মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিপ্রসূত চিন্তার মধ্যে তাঁর যুগান্তকারী ডিকলোনিজেশন থিওরি তাঁকে বিশ্বের রাজনীতির ইতিহাসে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ১৯২০ সালে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক নীতি সম্পর্কিত মতভেদ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির অনিবার্যতা সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অবধি এই তত্ত্বের সূত্র বিস্তারিত।

লেনিনের সঙ্গে ঐ বিতর্কে মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে বুর্জোয়া শ্রেণী কোনো বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে না। লেনিন ও মানবেন্দ্রননাথ উভয়ের ভিন্ন দুটি থিসিস সেই কংগ্রেসে গৃহীত

হয়েছিল। তখন থেকে মানবেন্দ্রনাথের চিন্তায় এই তত্ত্বটি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে।

ডিকলোনিজেশন কথাটি প্রথমে নিকোলাই আইভানোভিচ বুখারিন (১৮৮৮-১৯৩৮) ব্যবহার করেছিলেন এবং বহু বিতর্কিত এই বিষয়ে একটি কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব তোলেন। প্রবন্ধাকারে লিখিত একটি খসড়া প্রস্তাব রচনার দায়িত্ব চীন থেকে ফেরার পর মানবেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হয়। পরে উৎসাহ থিতিয়ে যাওয়ায় সে-প্রস্তাব কমিন্টার্নে উত্থাপিত ও গৃহীত হয় নি।

তত্ত্বটি আলোচনার পূর্বে সাম্রাজ্যবাদ বলতে কি বোঝায় তার সামান্য উল্লেখ প্রয়োজন। লেনিন তাঁর *Imperialism : the highest stage of capitalism* গ্রন্থে বলেছেন যে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর শিল্পে উন্নত দেশগুলি উদ্বৃত্ত মূলধন অধিক মুনাফার জন্যে উপনিবেশে বিনিয়োগ করে, যেখানে মূলধন অপ্রতুল, জমির দাম সস্তা, শ্রমমূল্য নিম্ন এবং কাঁচামাল সুলভ।[৬৬] সেদিক থেকে দেখলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, অর্থনৈতিক মুনাফার জন্যেই সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশগুলিতে শাসনাধিকার বজায় রাখে—রাজনৈতিক আধিপত্যের জন্যে নয়।

ডিকলোনিজেশন তত্ত্বের সারাংশ এই যে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের পর ব্রিটেনের উদ্বৃত্ত মূলধনের রপ্তানি দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে ; যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও দায়দেনার ফলে ব্রিটেনের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন-শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে ; পণ্যের বহির্বাজার ক্রমেই বেহাত হতে শুরু করে ; আভ্যন্তরীণ শিল্পবাণিজ্যকে গুছিয়ে তোলাই তখন এক মস্ত দায় হয়ে দাঁড়ায় ; যুদ্ধের দরুন দেনাও তখন বিপুল ; বাণিজ্যিক এই শূন্যতা অর্থাৎ রপ্তানিযোগ্য মূলধনের অভাব মেটাবার জন্যে ব্রিটেন ভারতীয় পুঁজিপতিদের নানাবিধ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা দিতে শুরু করে—যাতে ভারতীয়দের মূলধনে সাম্রাজ্যবাদের ক্ষয় রোধ করা যায়। সেজন্যে ক্রমে ভারতে অবাধ বাণিজ্যের পরিবর্তে শিল্পের সংরক্ষণ, আমদানি শুল্কের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ক্রমে ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের স্থান পূরণ করে ভারতীয় পুঁজিপতিরা। মানবেন্দ্রনাথের *Our Differences* গ্রন্থে এই তত্ত্বের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে ভারতে ইংরেজের তদানীন্তন রাজনৈতিক নীতি ও মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষণীয়। মানবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, রপ্তানিযোগ্য মূলধনের অভাবে মুমূর্ষু সাম্রাজ্যবাদ পরাধীন ভারতকে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, যেখানে শাসন-ক্ষমতা দখল করবে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী। তাই তিনি মনে করেছিলেন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর বৈপ্লবিক ভূমিকার কোনো সম্ভাবনা নেই, একদিন যেটা ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রবল ছিল। তিনি লিখেছেন—

No compromise (however far-reaching) between the Indian

bourgeoisie and the British Imperialists will give real freedom to the Indian people. [৬৭]

ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয়দের সঙ্গে একটা রফা করার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালে মন্টফোর্ড শাসনসংস্কার এবং ১৯২২ সালের পর থেকে ফিসক্যাল, কারেন্সি, ইন্ডাষ্ট্রি, এগ্রিকালচার প্রভৃতি বিষয়ক কমিশন নিয়োগ, সাইমন কমিশন প্রেরণ (১৯২৭), রাউন্ড টেবল বৈঠকের ব্যবস্থা ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করে। অন্যদিকে তেমনি ভারতে ১৯২০-২১ সালের পর থেকে বৈপ্লবিক গণসংগ্রাম বানচাল হয়ে যাওয়া, বয়কট নীতির ক্রমিক বর্জন, স্বাধীনতার পরিবর্তে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবি প্রভৃতি বিষয় তখনকার ক্রমবর্ধমান ভারতীয় পুঁজিপতিদের ক্ষমতালিপ্সু ও জনবিরোধী মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। ব্রিটিশ ও ভারতীয় পুঁজিবাদের মধ্যে এই বোঝাপড়ার সময়ে কোনো সংঘাত যে ছিল না তা নয়—তবে সেটা ভারতীয় পুঁজিপতিদের স্বার্থে অধিক সুযোগসুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যেই প্রণোদিত ছিল। ক্রমিক পর্যায়ে এভাবে সুযোগসুবিধা পাওয়ায় ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী বৈপ্লবিক কর্মপন্থার বিরোধিতা করে। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগঠনের আদর্শে মানবেন্দ্রনাথ সে-সময়ে দেশীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর চরিত্র উদ্ঘাটিত করে দেন এবং চাষী-মজুর-মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসকে গণআন্দোলনের উপযোগী করে তোলার প্রয়াসী হন। মানবেন্দ্রনাথের এ-তত্ত্ব ভারতীয় অবস্থার পটভূমিকায় রচিত হলেও অনুরূপ সকল দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মানবেন্দ্রনাথ এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বলেছিলেন যে, ঐ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়—ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ; ফ্যাসিবাদ বনাম গণতন্ত্র তথা মানবসভ্যতার আত্মরক্ষার যুদ্ধ। যুদ্ধে ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তি জয়ী হলে মানবসভ্যতার হবে চরম বিনাশ; অপরদিকে ফ্যাসিবাদের পরাজয় শুধু যে তার সমাধি রচনা করবে তাই নয়—উপরন্তু দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীলতা অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরও সমাধি রচিত হবে। তার অর্থনৈতিক শক্তি হবে খর্ব এবং রপ্তানিযোগ্য উদ্বৃত্ত মূলধন থাকবে না। ফলে ব্রিটেনকে তার উপনিবেশগুলি ছেড়ে চলে যেতে হবে। ফ্যাসিবিরোধী সেই মহাযুদ্ধে তিনি মিত্রশক্তিকে সমর্থনের জন্যে কংগ্রেস ও দেশবাসীকে আহ্বান জানান। মানবেন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী গণিতের মত নির্ভুল প্রমাণিত হয়। যুদ্ধনীতিসূত্রেই তাঁকে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। তাঁকে উপহাস করেছিল তখনকার বামপন্থী দলগুলি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে প্রদত্ত মানবেন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা তাই স্মরণীয়—

The British are quitting India neither under the pressure of the Congress resolution nor for any particular goodness of heart. They simply do no longer possess the power, financial

as well as military, to hold this country. Since they can no longer rule, they have no other alternative than to quit. The already shaken foundation of British Imperialism has been blasted by the war.[৬৮]

শি ক্ষা চি ন্তা

সাধারণ অর্থে মানবেন্দ্রনাথ শিক্ষাবিদ ছিলেন না এবং কোনো শিক্ষালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকেন নি। সেই দিক থেকে কোনো শিক্ষাতত্ত্বও উপস্থাপিত করেন নি। কিন্তু তাঁর চিন্তায় শিক্ষা সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। প্লেটোর আদর্শে শিক্ষাকেই তিনি গণতন্ত্রের বনিয়াদ বলে মনে করতেন। তিনি চাইতেন শিক্ষকদের শিক্ষিত করে তুলতে। কারণ শিক্ষকদের উপরেই আজকের অপরিণত তরুণ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কিন্তু শিক্ষকেরা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার ফলে তাঁদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত ও যত্নবান নন। আত্মশক্তি ও সামর্থেও তাঁদের বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। গতানুগতিক ধারায় তাঁরা ছোটদের কলের পুতুলে পরিণত করেন; ফলে তাদের সহজাত অনুসন্ধিৎসা, স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনসত্তা বিকশিত হয় না। মানুষ গড়ার এই মহান কারিগর সম্প্রদায়কে তাঁদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ও সচেষ্ট করে তোলাই ছিল মানবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য। কার্যত সারা জীবনে তিনি তাই করেও এসেছেন। কমিন্টার্নের অধীনে তাসখন্দে প্রাচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা, দেরাদুনে বার্ষিক রাজনৈতিক শিবিরের আয়োজন, রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি তার পরিচয়। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় জীবন অতিবাহিত করলেও শিক্ষকতার প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ও প্রবণতা ছিল।

ব্যক্তিত্বের যথোচিত উন্মেষসাধনই তাঁর মানবতন্ত্রী শিক্ষার আদর্শ—নিছক অক্ষরাশ্রয়ী লেখাপড়া নয়। স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে মানুষের সৃজনসত্তার নিরঙ্কুশ বিকাশ ও গণতান্ত্রিক চেতনার জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা। তাঁর ভাষায়—

Education for democracy does not consist in teaching just reading and writing, but in making the people conscious of their humanness, to make them conscious of their right to exist as human beings, in decency and dignity. Education means to help them to think, to apply their reason.[৬৯]

মানবতন্ত্রী জীবনাচারের বনিয়াদ হল শিক্ষা। বিজ্ঞানের আলোয় একথা

প্রমাণিত যে মানুষ মাত্রেই যুক্তিপ্রবণ ও মননশীল চিন্তাশক্তির অধিকারী। দীর্ঘ অনভ্যাস এবং সামাজিক ধারায় ও প্রথায় মানুষকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারও বিচারক্ষমতা আছে; জ্ঞানবিদ্যার একচেটিয়া অধিকারীদের সাহায্য ছাড়াও সাধারণ মানুষ ভালমন্দ, উচিতানুচিতের তারতম্য নিরূপণে সক্ষম। সমান সুযোগ পেলে রুগ্ন ও পঙ্গু মানুষ ছাড়া সবাই একই সম্ভাবনার অধিকারী। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও গুণগত তারতম্য যাই থাকুক না কেন সকলেরই মধ্যে আছে মৌল মানবিক সত্তা যার সাহায্যে সকলেই আত্মমর্যাদা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মস্বাতন্ত্র্যের গৌরব অর্জন করতে পারে। কিন্তু প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় তার সুযোগ যে অবর্তমান সে-কথারও তিনি উল্লেখ করেছেন—

Education as a precondition of democracy is not just primary education , it is not even the conventional higher or scientific education. It is the process of raising the intellectual and cultural level of a people. So long as it cannot be maintained on the strength of scientific knowledge that every man, by virtue of being a human being, is capable of rising to the highest heights of hnman attainments, a humanist philosophy cannot be propounded. a humanist social doctrine cannot be advanced, a humanist political practice will not be possible.[১০]

ছাত্ররা স্কুলকলেজে যায় প্রধানত অর্থকরী শিক্ষার তাগিদে। তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু সেই সঙ্গেই নাগরিক দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যপালনে তাদের অবহিত করা যায়; তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভরতা ও আত্ম-সম্ভাবনার চেতনা জাগিয়ে তোলার সেটাই প্রকৃষ্ট সময়।

পূর্বতন মানবতাবাদী শিক্ষায় কাব্যিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে। পক্ষান্তরে মনুষ্য-প্রকৃতি ও বিশ্বতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে রচিত নবমানবতা দর্শন সঠিক বিজ্ঞানচর্চার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে; বলা বাহুল্য প্রচলিত অর্থে নয়। মানবেন্দ্রনাথের মতে—

Scientific knowledge as learned in schools and colleges is not enough to make a Humanist, You may learn something about physics and yet not be a scientist. There may be even recognised scientists who have not necessarily imbibed the scientific spirit. Knowledge in our days has become departmentalised. But true scientific knowledge presupposes an understanding, and co-ordination of all the departments of science.[১১]

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে অক্ষরজ্ঞান ও তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় উন্নত দেশেও গণতন্ত্র নিরাপদ হয় নি। তার কারণ সরকারি কর্তৃপক্ষের প্রতিবন্ধকতা। কোনো সরকারই চায় না যে জনসাধারণ নিজ সম্ভাবনায় ও চেতনায় স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবোধে বিকশিত হয়ে উঠুক। সরকারি রীতিনীতি ও ক্রিয়াকলাপের নির্বিচার ঐকতান সৃষ্টিই কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য; ফৌজি নিয়মনিগড়ে ছোটবেলা থেকেই মানুষের মন গঠিত হয়। তাই শিক্ষায় সরকারি উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপকে মানবেন্দ্রনাথ বিপজ্জনক বলে মনে করেছেন। কারণ—

> Democracy will not be possible until people are taught to remember precisely their critical faculties which governments naturally fear, and apply them for the administration of their community. And this is not taught under government-sponsored systems of national education.[৭২]

মানবেন্দ্রনাথ মনে করতেন ইঁট কাঠ বালির মতো উপাদানের সাহায্যে সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় সামাজিক ইমারত নির্মাণে সহায়তা করে। কিন্তু গৃহনির্মাণের প্রধান উপাদানস্বরূপ সামাজিক সিমেন্ট যুগিয়ে থাকেন শিক্ষকেরা। অথচ শিক্ষকেরাই সমাজে সবচেয়ে বেশি অনাদৃত; তাঁরা না পান যশের ভাগ, না পান ন্যায়সঙ্গত পারিশ্রমিক। তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষকেরাই সমাজের প্রকৃত স্থপতি। সমাজ একদিন তাদের যথোচিত মানমর্যাদা দিতে বাধ্য হবে; শিক্ষক সম্প্রদায়কে নিজেদের ভূমিকা পালনের মধ্যে দিয়েই তা অর্জন করতে হবে। সে-ভূমিকা কলের পুতুলস্বরূপ আগামী দিনের নাগরিক সৃষ্টি করা নয়; মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে সঠিক চেতনার উন্মেষসাধন ও তার ভিত্তিতে জীবনাচারের নিশানা জানানোই শিক্ষকদের সামাজিক ভূমিকার আদর্শ।[৭৩]

বিনাবেতনে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বাধ্যতামূলক হওয়ার সঙ্গেই সরকারি আধিপত্য দেখা দেয়। বর্ণপরিচয়ের আগেই ছোটরা শেখে বিশেষ কোনো ছবি বা পতাকাকে সেলাম জানাতে; নির্ধারিত পাঠ্যবইয়ের বাইরের গ্রন্থজগৎ অগম্য। এ-ধরনের শিক্ষার ফল হয়ে দাঁড়ায় চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা, অন্ধ বিশ্বাস এবং প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার প্রতি নির্বিচার আনুগত্য। কাজেই সার্বিক (totalitarian) রাষ্ট্রেতো বটেই, অনুন্নত দেশের সংসদীয় ব্যবস্থাতেও মানুষের রুদ্ধ চিন্তাশক্তি ও মননশীলতা সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সরকারের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা অথবা অজ্ঞাতসারে যেখানে এই ধরনের অবস্থা বিরাজ করে সেখানে মানুষের সহজাত যাবতীয় সত্তার উন্মেষ ও গণতন্ত্রী চেতনা সঞ্চারকল্পে ব্যক্তিবিশেষের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে শিক্ষাদানের কাজে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া পথ নেই। তাই তিনি সরকারি শিক্ষার সঙ্গে বেসরকারি ব্যবস্থার সংস্থান থাকা আবশ্যক বলে মনে করতেন।

তাতে হয়তো অর্থের অনটন দেখা দেবে। সেজন্যে চাই সহৃদয় বিত্তবান ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা। এ বিষয়ে অনেক সময়ে তাঁদের খেয়ালখুশি ও উদ্ভট মনোভাব বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই বেসরকারি ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সেইসব লোকের উপর যাঁরা উপলব্ধি করেন যে সকল সামাজিক সমস্যার সমাধান ব্যক্তিমানুষের সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠায় নির্ভরশীল, যার ভিত্তি হল নতুন আদর্শে শিক্ষার ব্যবস্থা।[৭৪] মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাবিত সুগঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থানিক গণসমিতিই মানুষের স্বাধীন শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথ

মূলত মার্কসের ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ মানবেন্দ্রনাথ মার্কস-উত্তর বিশ্বে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভূতপূর্ব বিকাশের আলোয় মার্কসীয় দর্শনের বহুবিধ ত্রুটি ও অনুপযোগিতা উপলব্ধি করেন। বিরোধিতার পরিবর্তে তিনি মার্কসবাদকে অতিক্রম করে 'নবমানবতাবাদ' দর্শনে উপনীত হন। মার্কসের প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ মনোভাব বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হয় নি। সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মার্কসকে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রবক্তারূপে অভিহিত করেছেন।[৭৫] এবং মার্কসকে মূলত মানবতার পূজারী ও মুক্তির অনুরাগী হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে মার্কসীয় চিন্তাতেই নবমানবতাবাদের বহু উপকরণ ইতস্তত নিহিত। মার্কসবাদকে মানবেন্দ্রনাথ নবরূপ দিয়েছেন এই বলে—

> Freed from the falacy of economic determinism, the humanist, libertarian, moralist spirit of Marxism will go into the making of the new faith of our time.[৭৬]

মার্কসবাদের অধিকাংশ তত্ত্বকে তিনি হয় পরিবর্তন নয়তো বর্জন করেছেন। মার্কসের সঙ্গে তাঁর মিল ও অমিল কী কী বিষয়ে তার সামান্য আলোচনা করা যাক।*

ইতিহাসতত্ত্ব

মানবেন্দ্রনাথের মতে মার্কসের ইতিহাসতত্ত্ব নির্ভুল নয়। কারণ তাতে সমাজ-বিকাশের প্রক্রিয়ায় মানবমনের ভূমিকাকে আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি।

* মানবেন্দ্রনাথ যখন তাঁর *India in Transition* (১৯২২) গ্রন্থটি লেখেন তখনও মার্কসের 'নিউ ইয়র্ক ডেলি ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৫৩) ভারত সংক্রান্ত দুটি পত্র সুপরিজ্ঞাত ছিল না। স্বভাবতই মার্কসের পত্রদুটি পড়ার সুযোগ মানবেন্দ্রনাথ তখনও পান নি। প্রায় সত্তর বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত উভয়ের লেখায় দৃষ্টিগত বিশেষ মিল দেখা যায়।

ইতিহাসকে শুধুমাত্র বস্তুবাদী বিষয়মুখিতার দ্বারা বিশ্লেষণ করা অর্থহীন। সমাজবিকাশের পিছনে মানুষের মন ও বুদ্ধির স্থান এবং তার পুঞ্জীভূত ক্রিয়াক্ষমতা নগণ্য নয়। মার্কসের ইতিহাসতত্ত্বে চেতনাকে জড়ের বিকার ও তার পশ্চাদ্‌গামী বলে মনে করা হয়। মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদকে নতুনরূপে দেখেছেন—তাতে বস্তু ও ভাব উভয়েরই স্থান সমান। প্রাকৃতিক ও জৈব বিবর্তনধারায় ভাবের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর দ্বিমত নেই। তবে তাঁর মতে নিজরূপ পরিগ্রহ করে ভাব একটা নিজস্ব বিবর্তনপথে অগ্রসর হয়। বিষয়টি তিনি তাঁর *Reason Romanticism and Revolution* নামক সুবিপুল গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। বস্তু ও ভাব সম্পর্কে লিখেছেন—

Philosophically, the materialist conception of history must recognise the creative role of intelligence. Materialism cannot deny the objective reality of ideas···they are biologically determined ; priority belongs to the physical being, to matter, if the old fashioned term may still be used. But once the biologically determined process of ideation is complete, ideas are formed, they continue to have an autonomous existence, an evolutionary process of their own, which runs parallel to the physical process of social evolution. The two parallel processes, ideal and physical, compose history ''

মানবীয় বিবর্তনের নির্দিষ্ট কোনো ক্ষেত্রে ভাবের গতি ও ঐতিহাসিক ঘটনার কারণযুক্ত (causal) সম্পর্ক দেখা যায় না। ইতিহাসকে মার্কস যে অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদী প্রত্যয়ে (economic determinism) বিশ্লেষণ করেন মানবেন্দ্রনাথ তা বর্জন করেছেন। তাঁর মতে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য খোঁজার আদিম প্রবৃত্তির পিছনে অর্থনীতি অপেক্ষা জীববিদ্যাই প্রযোজ্য। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় মানুষ যে-সংগ্রাম সর্বপ্রথম শুরু করেছিল সেটা ছিল প্রকৃতির বিরুদ্ধে; তখন তার আকৃতি ও ক্রিয়াকলাপ ছিল জৈবতাড়না প্রসূত। বস্তুবাদী ইতিহাস-ব্যাখ্যায় আদিম মানবমনের প্রতি বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি; পরেও মানুষ অনেক কিছুতে স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে যা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদে বিশ্লেষিত হয় নি। তাই অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদকে বস্তুবাদী দর্শনে অঙ্গীভূত করা যায় না। তাঁর কথায়—

Economic determinism in social evolution and cultural history does not necessarily follow from Materialism...it is an error to conceive Historical Determinism as purely economic. History is determined, but there are more than one determining factor··· . Determinism is inherent in Materialism. But

Economic Determinism, being a dualist concept, cannot be necessarily related to Materialism.[৭৮]

বস্তুবাদী হয়েও ভিন্ন নির্দেশ্যবাদ গ্রহণ করা যায়। যেমন রাষ্ট্রশক্তির নির্দেশ্যবাদ, জলবায়ুর নির্দেশ্যবাদ, শারীরতাত্ত্বিক নির্দেশ্যবাদ—যা নিঃসন্দেহে বস্তুভিত্তিক। কাজেই বস্তুবাদী দর্শনে অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ আদৌ অপরিহার্য নয়।

দ র্শ ন

মার্কসের দ্বান্দ্বিক (dialectic) বস্তুবাদী বিচারপদ্ধতিকে মানবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ভাববাদী এবং তা তর্কশাস্ত্রের যুক্তিজালমাত্র। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস ও দর্শনের অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ ও দ্বান্দ্বিক বিচার পদ্ধতি দ্বারা মার্কস ঈশ্বরকে হটিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন বটে, কিন্তু সমগ্র বিচারে মানুষ উৎপাদনকারীর পরিবর্তে উৎপাদনকলে পরিণত হয়েছে। প্রগতির প্রবক্তা মার্কস তাঁর দর্শনে পরিণামবাদ (Teleology) সঞ্চারিত করেছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে প্রত্যয়টি তাঁর দৃষ্টিতে ছিল স্ববিরোধী। কারণ ডায়ালেকটিক কথাটি মূলত ভাববাদী এবং সেটা যুক্তিবিদ্যার (লজিক) অন্তর্গত একটি পদ্ধতিবিশেষ। আর বস্তুবাদ হল তত্ত্ববিদ্যার (ontology) অন্তর্গত। সেজন্যে প্রকৃতি ও ইতিহাসের কার্যকারণ সম্পর্কের বিশ্লেষণে প্রত্যয়টি খাপছাড়া ও বিভ্রান্তিকর। অবশ্য লজিক হিসেবে বস্তুবাদের আলোচনায় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডমে হেরাক্লিটাস, সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকেরা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিটি ব্যবহার করতেন। অ্যারিস্টটল সেটিকে লজিকের অবরোহী বিশ্লেষণে প্রয়োগের রীতি প্রবর্তন করেন। পরে ইউরোপের অন্যান্য দার্শনিকেরাও সেই রীতি অনুসরণ করেন। মার্কসের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে বস্তুবাদের সঙ্গে সংযুক্তির চূড়ান্ত পরিপূর্তি সাধন করেন এঙ্গেলস, প্লেখানভ, লেনিন, বুখারিন প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকেরা। প্রত্যয়টি মার্কস নিয়েছিলেন হেগেলের চিন্তা থেকে, আর হেগেল এ-ব্যাপারে ঋণী ছিলেন স্পিনোজার কাছে। প্লেখানভ বলতেন যে, ডায়ালেকটিকস হল বিপ্লবের বীজগণিত।

মানবেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, প্রত্যয়টি পরিণামবাদী (teleological) এবং তার সঙ্গে নৈতিকতার কোনো সঙ্গতি নেই। নীতিকথা খোলাখুলিভাবেই বর্জিত। বলা হয় যে লক্ষ্যই (end) বড়, মাধ্যম (means) গৌণ। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যে সবকিছুই অনুসরণীয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পিছনে ছিল মার্কসের ঐতিহাসিক বা অর্থনৈতিক নির্দেশ্যবাদ। তিনি মনে করতেন যে,

ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বিপ্লব ঘটে এবং সেজন্যে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। ইতিহাসে মানুষ যেন খেলার পুতুল। মানবেন্দ্রনাথ বলেন যে, ইতিহাসের ধারায় ফাঁক থাকে বিস্তর। তাই ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদ ও বিপ্লবের প্রয়োজনকে কার্য-কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা কঠিন। তাঁর মতে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী নয় এবং ইতিহাসের ধারা এবং সমাজের গতি পূর্বনির্ধারিত নয়। পরিবর্তে তিনি বলেন যে, মানুষের সৃজনশক্তি, অস্তিত্বের সংগ্রাম ও সহজাত সম্ভাবনা সমূহের উন্মেষের জৈব তাড়না হল প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস ও সামাজিক বিবর্তনের দ্যোতক।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বিভিন্ন অসঙ্গতির অন্যতম হল প্রকৃতি ও সমাজের সবকিছু পরিবর্তনশীলতার পশ্চাতে অন্তর্নিহিত স্ববিরোধের কারণ দর্শানো। সবের পিছনে এক ও অদ্বিতীয় স্ববিরোধের কারণ দর্শানো গোঁড়ামির নামান্তর। প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে নানা কারণই থাকে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ম্যাজিকে বিশ্বাসের দরুন লোকের প্রকৃত কারণ সন্ধানে কৌতূহল নষ্ট হয়ে যায়।[৭৯]

বস্তু সম্বন্ধে মার্কসের ধারণা তাঁর পরবর্তীকালে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে অচল হয়ে গিয়েছে। জড় ও চেতনার দ্বৈত অস্তিত্ব প্রত্যয় বর্তমানে অপসারিত হয়েছে। শারীরবৃত্ত ও মনস্তত্ত্বের মাঝে সেতুবন্ধ রচিত হওয়ায় মানবেন্দ্রনাথ জড় ও ভাবের অদ্বয় প্রত্যয়ে নতুন দৃষ্টিতে বস্তুবাদকে দেখেছেন; তাকে তিনি "Physical Realism" বলে উল্লেখ করেছেন।[৮০]

মার্কসীয় দর্শনে নীতিতত্ত্ব উপেক্ষিত হয়েছে বলে মানবেন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করেছেন। মার্কসের দৃষ্টিতে নীতি আপেক্ষিক; সংগ্রামকালে মানুষ তার নৈতিক আচরণকে খাপ খাইয়ে নেয়; স্থায়ী ও চিরন্তন মূল্যবত্তা বলে কিছু নেই তদনুসারে মনুষ্যপ্রকৃতিকে ছাঁচে ঢালা যায়। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ আঠার শতকের বস্তুবাদীদের মতো বিশ্বাস করতেন যে, মনুষ্য-চরিত্রে বহু কিছু গুণ আছে যা চিরন্তন। মানবমনের স্থায়ী প্রবণতাগুলির স্বীকৃতি ব্যতিরেকে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো রীতিনীতি গড়া যায় না। তাঁর মতে অধিকার ও দায়িত্ববোধের পশ্চাদ্‌ভূমি হল দৃঢ় ও স্থায়ী মূল্যবোধ। উৎপাদক শক্তি-নিচয়ের অধীনে (মার্কসীয় মতানুসারে) মানুষকে শৃঙ্খলিত রাখলে তার স্বাধিকার ও সৃজনসত্তা ক্ষুণ্ণ হয়; নৈতিক চেতনা অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থায় উদ্ভূত হয় না।[৮১] মানবেন্দ্রনাথের নীতিতত্ত্বে মানুষই সবকিছুর মাপকাঠি। মার্কসীয় দর্শনে মানুষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশ বিশেষ। মার্কস যেখানে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিতে নীতিতত্ত্বকে বিচার করেছেন মানবেন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে মানুষের কতকগুলি স্থায়ী নৈতিক মূল্যবত্তাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রাষ্ট্রতত্ত্ব

মার্কসের রাষ্ট্রচিন্তায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রেণী-সংগ্রামেরও মানবেন্দ্রনাথ সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, শ্রেণী-সংগ্রাম মার্কসবাদের যুক্তিবিমুখ এক অন্তর্বিরোধ। মার্কসের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ অনুসারে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় প্রগতি ও সভ্যতার পথ রচিত হয়; শ্রেণী-সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীদ্বয়ের দ্বন্দ্ব অনিবার্য। তারপর গড়ে উঠবে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা। এই বিশ্লেষণ যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে সামাজিক গতি নিশ্চল হয়ে পড়বে। কারণ তখন অর্থাৎ শ্রেণীহীন সমাজে সংগ্রামের দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি থাকবে না।[৮২]

মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে মানবেন্দ্রনাথ বলেছেন যে, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মাঝখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা ও সামাজিক গুরুত্ব বৃদ্ধিই পেয়েছে—মার্কসের মতানুসারে তারা লুপ্ত হয়ে যায় নি; ধনিকদের শোষণে নিষ্পিষ্ট হলেও তারা সর্বহারাদের মধ্যে অঙ্গীভূত হয় নি; বিশেষ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা স্বাতন্ত্র্য ও প্রাধান্য বৃদ্ধিই করেছে। মার্কস মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রতিক্রিয়াশীলরূপে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ তারাই করেছে সবচেয়ে বেশি, তারাই যুগিয়ে থাকে মননশীল ও বৈপ্লবিক নেতৃত্ব।[৮৩] মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী আছে; বিশেষ কোনো শ্রেণীর একনায়কতন্ত্র কাম্য নয়। শ্রেণী-সংগ্রাম ও সামাজিক সংঘাত ছাড়াও সমাজের ভিতরে সমন্বয় ও অচ্ছেদ্য বন্ধনও আছে; তাই দেখা যায় সমাজ পরস্পরবিরোধী শ্রেণীভিত্তিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি।

বিপ্লবতত্ত্ব সম্পর্কেও মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক। মার্কস দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় বিপ্লবকে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করতেন। পক্ষান্তরে এবিষয়ে মানবেন্দ্রনাথের বক্তব্য হল যে, বিপ্লবের পশ্চাতে মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সৃজনশীল এক রোমান্টিক আবেগ থাকে। সকলের সমষ্টিগত আবেগ বিপ্লবের পথে চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। পিছনে থাকে সামাজিক নবরূপায়ণের সৃজনধর্মী আদর্শ। মার্কসবাদী ইতিহাসতত্ত্বের এটা একটা স্ববিরোধ যে, সামাজিক বিবর্তনকে ছককাটা পথে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া সত্ত্বেও সেই বিবর্তন প্রসূত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। বস্তুবাদী নির্দেশ্যবাদের সঙ্গে পরমকারণবাদী বিপ্লবের সঙ্গতি নেই। মার্কসের বিপ্লবতত্ত্ব শ্রেণী-সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের ভিত্তিতে রচিত। মানবেন্দ্রনাথ বিপ্লবকে মানুষের সর্ববিধ বন্ধনমুক্তির দিক থেকে দেখেছেন।[৮৪]

প্রচলিত বৈপ্লবিক কর্মপন্থা অর্থাৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কেও মানবেন্দ্রনাথ

সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বর্তমানে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব-প্রচেষ্টা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৮৫] কমিউনিস্টরা পশ্চাৎপদ নিপীড়িত বিশেষ কোনো শ্রেণীর স্বার্থে সংগ্রাম করে, যাদের অর্থনৈতিক দুর্গতিই প্রাধান্য পায়। কিন্তু সকল শ্রেণীর মানুষের যুক্তিসম্মত শুভচেতনার ভিত্তিতে বিপ্লবের পথ রচিত হয় না। মানবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেন যে, নতুন জীবনদর্শনের আলোকে বিপ্লবের পথ রচিত হয় না। তাঁর মতে, নতুন জীবনদর্শনের আলোকে বিপ্লবের নিশানা দেখানো দরকার, যেখানে সর্বহারা শ্রেণীই শুধু নয়, সকল শ্রেণীর মানুষ একে অপরকে পদানত না করে সর্ববিধ প্রতিবন্ধকতা (অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, ও সাংস্কৃতিক) থেকে মুক্ত হয়ে স্বীয় সম্ভাবনার বিকাশসাধনে সমান সুযোগ পাবে। বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতি রচিত হবে সংশ্লিষ্ট দেশ ও তার অবস্থা অনুযায়ী।

মানুষের সমস্যাকে মানবেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র শ্রমিক ও মালিকের দ্বন্দ্ব কিংবা বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের সংঘাতরূপে দেখেন নি। তাঁর কাছে গণতন্ত্র বনাম ফৌজি একনায়কতন্ত্র, সর্বগ্রাসী যূথবাদী জাতি বা শ্রেণী বনাম মুক্তিকামী ব্যক্তিমানুষের বিরোধই বৃহদাকারে প্রতিভাত হয়েছে।

রাষ্ট্রের বিলুপ্তিও মার্কসবাদী রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম এক প্রধান অঙ্গ। মার্কস বলেছেন সর্বহারা একনায়কত্বে সাম্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর রাষ্ট্রের আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না; রাষ্ট্র নিপীড়নকারী একটি যন্ত্রবিশেষ। কী ভাবে রাষ্ট্র বিলুপ্ত হবে এবং তার পরবর্তীকালের অবস্থাই বা কী হবে সে-সম্পর্কে মার্কস সবিস্তারে কিছু বলেন নি। মানবেন্দ্রনাথ মার্কসের এই চিন্তাকে অলীক কল্পনা বলে মনে করেন। বিরোধী শক্তিকে দাবিয়ে রাখার জন্য ডিক্টেটরি শাসনের প্রশ্ন থাকবেই। তাঁর দৃষ্টিতে রাষ্ট্র সমাজবদ্ধ মানুষের কাছে একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। তার অবলুপ্তি অসম্ভব ও অকার্যকর।[৮৬]

মার্কস উদারতন্ত্রীদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে গ্রহণ করেন নি। এটি মানবেন্দ্রনাথের নব্যদর্শনের একটি অঙ্গ।

অর্থনীতি

মার্কসের দৃষ্টিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের (surplus value) উৎপাদন পুঁজিবাদের একটি প্রধান লক্ষণ। বস্তুত উৎপাদক অর্থাৎ শ্রমজীবীরা উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে শুধু যে পুঁজিবাদী সমাজেই বঞ্চিত হয় তা নয়. সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও হয়। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ এই উদ্বৃত্ত মূল্য একটি সামাজিক উদ্বৃত্ত—তারই উপর নির্ভর করে সমাজের অগ্রগতি। উদ্বৃত্ত ব্যতিরেকে রাশিয়ার দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশ সম্ভব হত না। উদ্বৃত্ত মূল্যই হল মূলধনের উৎস। মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি না পেলে উৎপাদনের সমৃদ্ধি ঘটে না।

মার্কস মনে করতেন শ্রমিকদের বঞ্চিত করে উদ্বৃত্ত মূল্য সঞ্চিত হয় ; অতএব সমাজতন্ত্রে ঐ উদ্বৃত্ত মূল্য শ্রমিকেরা পেলে তার যথোচিত নিষ্পত্তি হবে। তাঁর ভাষায় "expropriation of expropriators" হওয়া চাই। কার্যত রাশিয়ায় তা ঘটে নি। সেজন্যে মনে হতে পারে যে রাশিয়াতে 'Revolution Betrayed' হয়েছে ; এখন সেখানে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র চলেছে। মানবেন্দ্রনাথ এ-কথার বিরোধিতা করে বলেছেন যে, উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের অসংগতি ও অসম্পূর্ণতা লেনিন ও স্টালিনের দূরদর্শিতায় সংশোধিত হয়েছে।[৮৭]

গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথ

মার্কসীয় পথ পরিমার্জনা করে যেহেতু মানবেন্দ্রনাথ বিকেন্দ্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা, পার্টিহীন রাজনীতি, সত্য, নৈতিকতা ও মানবতার আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন সে-হেতু তাঁকে অনেকেই গান্ধীবাদী চিন্তার অনুসারী বলে মনে করেন। কিন্তু সেটা ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। কারণ গান্ধীর ও মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনাদর্শ তথা উভয়ের মানবতন্ত্রী দর্শনের মধ্যে রয়েছে এক দুস্তর ব্যবধান। উভয়ের দার্শনিক চিন্তার পশ্চাৎপট সম্পূর্ণ ভিন্ন ও পরস্পর-বিরোধী।*

গান্ধীদর্শন ভারতের সনাতন আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও জীবন সম্পর্কে বিশ্বাতীত প্রত্যয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। গান্ধীর সত্য ও নীতির উৎস মনুষ্যচরিতে নিহিত নয় ; অতিপ্রাকৃত ও অতিমানবিক শক্তিই হল তার উৎস। মানুষের স্থান সেখানে গৌণ। দিব্য ইচ্ছা ও আদেশ থেকে গান্ধীবাদ প্রেরণা সঞ্চার করেছে। স্বভাবতই গান্ধীর সমাজদর্শনও সেই অতীন্দ্রিয় শক্তির নিগড়ে আবদ্ধ। গান্ধীর অনুগামী বিনোবা ভাবে যে-দলবিহীন রাজনীতির কথা বলেছেন তাও সেই শক্তিতেই অনুপ্রাণিত।

গান্ধী রাজনীতিকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সত্য অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক—সেখানে একমাত্র 'ঈশ্বরই সত্য'। তাই যুক্তির পরিবর্তে তিনি স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যে সত্যের সন্ধান করেছেন। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি যে 'সত্যাগ্রহ' পদ্ধতির সৃষ্টি করেছেন স্বভাবতই যুক্তি সেখানে অনুপস্থিত। গান্ধীর যুক্তিনিরপেক্ষ নীতিনির্ভর রাজনীতিকে

* উল্লেখ্য, ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে জনচিত্তের বিকাশকল্পে গঠনমূলক মৌল চিন্তাভাবনার উপস্থাপনা একমাত্র গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথের মধ্যেই যাকিছু দেখা যায়। হিন্দ্ স্বরাজ থেকে সর্বোদয় আন্দোলন হল গান্ধীর পরিণত চিন্তার অভিব্যক্তি। আর মানবেন্দ্রনাথ সেই ত্রিশের দশক থেকেই রেনেসাঁস আন্দোলনের সূচনা করেন, যেটি উত্তরকালে বিকশিত হয়ে ওঠে তাঁর মানবতন্ত্রী রাষ্ট্রদর্শনে।

যুক্তিবাদী (rational) বলা যায় না।

গান্ধীর দর্শন মূলত জীবনবিমুখ। জীবনের উপভোগ সেখানে উপেক্ষিত। কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর জীবননির্বাহ, পার্থিব সুখ ও ভোগে নিস্পৃহা এবং বৈষয়িক ক্ষেত্রে নিম্নমানের সরল জীবনই ছিল তাঁর আদর্শ—এমনকি মননশীল (intellectual) জীবনযাপনেও তিনি বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না।

পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী মানবতন্ত্রী দর্শন সর্বার্থে বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে-দর্শনে মানুষকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করা হয়—তার সত্য ও নীতিতত্ত্ব মানুষের সহজাত যুক্তিপ্রবণ মনেই নিহিত—তাতে অতীন্দ্রিয় ও আধ্যাত্মিক শক্তির কোনো স্থান নেই। এবিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

যুক্তিপ্রবণতাকে সর্বোপরি স্থান না দেওয়ায় গান্ধীবাদে মানুষ হয়েছে খর্ব এবং মানুষকেই একমাত্র সত্যরূপে ঘোষণা না করায় মানুষের আত্মপ্রত্যয়ও বিনষ্ট হয়েছে। দুটি বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গান্ধী ও মানবেন্দ্রনাথের মতবাদ রচিত—সেজন্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও তাঁদের বৈপরীত্য সুপরিস্ফুট। মানবেন্দ্রনাথ চাইতেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, যেটা গান্ধীর দিব্য অভীপ্সা বা গুরুবাদী বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত। মানবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিমানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করেছেন; পক্ষান্তরে গান্ধীর অছিবাদে (trusteeship) ব্যক্তিমানুষের অধিকার সংকুচিত হয়েছে। গান্ধীর পার্টিহীন রাজনীতি তাই গণতান্ত্রিক নয়। রাষ্ট্রে ব্যক্তিমানুষকে শক্তিশালী করার জন্যে মানবেন্দ্রনাথ পার্টিহীন রাজনীতির পথে অগ্রসর হয়েছেন।

গান্ধী আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে ভয় ও ঘৃণার চোখে দেখেছেন। তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী, তাই আধুনিক সবকিছুই তাঁর কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। গান্ধী জাতীয়তাবাদকে বর্জন না করেও বিশ্বজনীনতাকে গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনথের মতো জাতীয়তাবাদের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বৈশ্বিক মানব সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রচার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত পরিচয় বা যোগাযোগের কথা জানা যায় না।* উভয়ের কর্মক্ষেত্র এবং দার্শনিক চিন্তার পৃষ্ঠপট ভিন্ন হলেও সামাজিক বিচারবিশ্লেষণের মধ্যে দুজনের বিস্তর মিল দেখা যায়।

* নির্মলকুমারী মহলানবিশ লিখেছেন যে, ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন বার্লিনে যান "শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়েরও সেই সময়ে আমাদের হোটেলে যখন তখন যাওয়া আসা। কবিকে কেন্দ্র

রবীন্দ্রদর্শনের ভিত্তিভূমি আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় ; মানবেন্দ্রনাথের দর্শন সম্পূর্ণ বস্তুবাদী। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শে রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা লাভ করেন ; পক্ষান্তরে মানবেন্দ্রনাথের মনে ভারতের প্রাচীনত্ব অপেক্ষা পাশ্চাত্ত্য দর্শনই অধিক প্রতিফলিত। উভয়ের দৃষ্টিতেই রাজনীতি ও নৈতিকতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী দর্শন আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় রচিত হলেও সেখানে দিব্য আদেশাধীনে মানুষকে না রেখে তাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া হয়েছে। যুক্তিকে রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষা করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ'-চিন্তায় রাষ্ট্র ও সমাজের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র সমাজদেহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ—রাষ্ট্রের কাজ কেবল প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এবং আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়, বিভিন্ন সামাজিক কর্মতৎপরতার মধ্যে সংযোগ ও সামঞ্জস্যবিধানও তার কাজ। প্রাচীনকালে এখনকার মতো সমাজের এত জটিলতা ছিল না বলেই হয়তো জনজীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল গৌণ ; কিন্তু বর্তমান সমাজ নানাভাবেই এত জটিল হয়ে পড়েছে যে রাষ্ট্রের প্রয়োজন অপরিহার্য বলেই মানবেন্দ্রনাথ অভিমত প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রকে অবশ্য মানবেন্দ্রনাথ অনাবশ্যক অগ্রাধিকার কিছু দিতে চান নি।

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চায়েতী সমাজব্যবস্থার সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের গণসমিতির পরিপূর্ণ সাদৃশ্য আছে। উভয়েই বিকেন্দ্রিত শাসনব্যবস্থায় ব্যক্তিমানুষের সক্রিয় উদ্যম ও সৃজনীশক্তির অবাধ বিকাশ চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পল্লী পঞ্চায়েতগুলিকে কিছুটা পরস্পর-বিচ্ছিন্নভাবে ও স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে গড়তে চেয়েছিলেন। সে-বিষয়ে মানবেন্দ্রনাথ অনেকটা পিরামিড আকারে ক্রমবিন্যস্ত এবং সুসংবদ্ধ গণসমিতির কাঠামোকে প্রশাসনের ভিত্তিরূপে কল্পনা করেন।

অর্থনৈতিক বিষয়েও দুজনের মিল যথেষ্ট। দুজনেই ছিলেন সমবায় প্রথার সমর্থক। আধুনিক যন্ত্রশিল্পকে রবীন্দ্রনাথ কিছুটা সমালোচনা করলেও মানবেন্দ্রনাথ তা করেন নি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী উভয়েই ছিলেন নিখাদ বৈশ্বিক মনোভাবাপন্ন। জাতীয়তাবাদের উপর উভয়েই তীব্র কশাঘাত করেছেন। ফ্যাসিজম ও কমিউনিজমের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে সাদৃশ্য দেখিয়েছেন উত্তরকালে তার কিছুটা দার্শনিক সামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মানবেন্দ্রনাথের রচনায়।

ক'রে বার্লিনে একটা চক্র যেন গড়ে উঠেছিল।" ('কবির সঙ্গে য়ুরোপে'। ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ। পৃ. ১৭৬।)

লেখিকা একটি পত্রে গ্রন্থকারকে জানান যে, তিনি ও প্রতিমা দেবী ভিতরের ঘরে থাকতেন। তাই বাইরের ঘরে রবীন্দ্রনাথ ও মানবেন্দ্রনাথের মধ্যে কি কথাবার্তা হত তা তাঁরা জানতে পারতেন না।

দেশের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংকীর্ণতা এবং চিন্তাহীনতাকে দুজনেই তীব্র সমালোচনা করেন। চিন্তায় ও ব্যবহারে উভয়েই ছিলেন আধুনিকতার পক্ষপাতী।

উপসংহার

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতা আবহমানকাল যাবৎ মূলত আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা থেকে প্রাণরস সঞ্চয় করে এসেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বস্তুবাদী চিন্তার উৎকর্ষ দেখা গেলেও তা জনমানসে স্থায়িত্ব ও বিস্তৃতি লাভ করে নি। আধুনিক কালেও এদেশের চিন্তানায়কদের প্রেরণার উৎস হয়েছে গীতা ও উপনিষদ। এ-যুগের ভারতীয় সাধনায় তাই বস্তুবাদী মানবেন্দ্রনাথ একজন নিঃসঙ্গ পথিক।

রামমোহনের বিশ্বজনীন আদর্শের শ্রেষ্ঠ পরিণতি দেখা যায় মানবেন্দ্রনাথের মানবতন্ত্রী দর্শনে। উনিশ শতকে নবাগত পশ্চিমী চিন্তার প্রভাবে বুদ্ধির স্বাধীন চর্চা, যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবতন্ত্রী জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ ডিরোজিও, নব্যবঙ্গদল, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়কদের নেতৃত্বে এদেশে যে রেনেসাঁসের সূচনা হয়েছিল, প্রায় শতাব্দীকাল পরে প্রকারান্তরে তারই সূত্র ধরে যেন মানবেন্দ্রনাথ অগ্রসর হয়েছেন।

অপরিণত প্রথম জীবনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সন্ন্যাসবৈরাগ্য থেকে ক্রমে তিনি বস্তুবাদী জীবনে প্রবেশ করেন; পর্যায়ক্রমে জাতীয়তাবাদ পরিহার করে বিশ্বজনীন আদর্শে আকৃষ্ট হন, মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব কাটিয়ে নবমানবতা দর্শন উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই মানসিক বিবর্তনের পিছনে দুটি আবেগ নিয়তই প্রেরণা সঞ্চার করত। একটি হল মুক্তির আদর্শ এবং অপরটি হল সত্যের প্রতি অটল নিষ্ঠা। মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যের সন্ধান পরিশেষে তাঁর নব্যদর্শনে সমন্বিত হয়েছে। এই দুটি প্রবণতার জন্যে তাঁকে আজীবনকাল অনেক ত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করতে হয়েছে; তাঁর সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, সেইসঙ্গে তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছে অশেষ কুৎসা।

এই দুটি আবেগের তাড়নাতেই তিনি প্রথমজীবনে সন্ত্রাসবাদী হয়েছিলেন। পরে সেই আদর্শের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে উচ্চতর মানবিক আদর্শ ও মুক্তির প্রেরণায় মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। মার্কসীয় দর্শনেও মুক্তি ও সত্যের বিশেষ স্থান খুঁজে পান নি। এ-ধরনের ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত হতাশায় ও নৈরাশ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু তা না করে তিনি আজীবনকাল সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যবহারিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই

মুক্তির দর্শন রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

মার্কস ও মানবেন্দ্রনাথ উভয়েরই দর্শনচিন্তা বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের উপর (materialistic cosmology) প্রতিষ্ঠিত। উভয়ের অন্তর্বর্তীকালে বৈজ্ঞানিক বিকাশ তাঁদের চিন্তার মাঝে এক বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে। মার্কসের আমলে পদার্থবিদ্যা ও মনস্তত্ত্বের ছিল শৈশব অবস্থা। পূর্বতন ভাববাদী দার্শনিক ধারাকে কাটিয়ে উঠতে গিয়ে মার্কস ভাবকে বস্তুর নিছক প্রতিফলন-রূপে বিশ্লেষণ করেন। মার্কসের দৃষ্টিতে মানুষ অর্থনৈতিক নির্দেশনায় ইতিহাসের অমোঘ লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলে। ফলে মানুষের কোনো স্বাধীন সত্তা বলে কিছু থাকে না; মুক্তির প্রয়োজন ঘটে বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে; নৈতিকতাও তাই সেই শ্রেণীস্বার্থের বিচারে আপেক্ষিক মাত্র; ইতিহাসের নির্দেশে যুক্তির সীমানাও সুচিহ্নিত; স্বাধীনসত্তাবিহীন ব্যক্তিমানুষ এই দৃষ্টিতে নিতান্তই অসহায়।

মানবেন্দ্রনাথ মার্কসের পূর্বকালীন ভাববাদী দর্শন গ্রহণ করেন নি; আবার মার্কসের বস্তুবাদও তাঁর কাছে যুক্তিসম্মত নয় বলে মনে হয়েছে। চিন্তনকে তিনি বস্তুর নিছক প্রতিফলনস্বরূপ বিচার করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে যুক্তি ও নীতিসম্মত চিন্তার উৎস হল physical reality। তাঁর মতে চিন্তা-শক্তির পিছনে যেমন বিশ্বাতীত কোনো দিব্য নির্দেশ নেই, তেমনি মানুষের পরিচিন্তন লেনিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী চলচিত্রের মতো নিষ্ক্রিয় একটি প্রতি-ফলনমাত্র নয়—অর্থাৎ, ভাব ও বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়, কোনোটিই কারো অগ্রবর্তী নয়। বস্তুবাদী বিশ্বতত্ত্বের সঙ্গে নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব (law-governed universe) প্রত্যয়ের বিশ্লেষণভঙ্গি মানবেন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে প্রকৃতি, মানুষ এবং নৈতিকতা অচ্ছেদ্যবন্ধনে আবদ্ধ। এ-দৃষ্টি মূলত বস্তুবাদী। মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ। যেহেতু প্রকৃতির গতিপথ নিয়ম-নির্দিষ্ট সেই কারণে মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্রিয়াশীলতা নিয়মনির্দিষ্ট। প্রকৃতির ধারায় যেমন এক শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য আছে, মানুষের অস্তিত্বেও তেমনি এক মৌল শৃঙ্খলা আছে।

মানুষের যুক্তিপ্রবণতার নিশ্চয়তা প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলায় সুচিহ্নিত। যুক্তি নিয়মশৃঙ্খলিত প্রাকৃতিক পরিবেশেরই যেন এক প্রতিধ্বনি। যুক্তিপ্রবণতা অর্জন সাপেক্ষ নয়—মানুষের তা একটা জৈবধর্ম। যুক্তিবোধের তাগিদেই মানুষ নীতিনিষ্ঠ এবং মুক্তির পিয়াসী হয়। কাজেই যুক্তি, নীতি ও মুক্তির আবেগ মানুষের একটা জন্মগত ধর্ম। তাই থেকে মানবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সারা বিশ্বের মানুষ একই মানবিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় নিখিল বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ পরিণতি। মানুষের নৈতিক আচরণের পিছনে কোনো আধ্যাত্মিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদই

নীতিতত্ত্বের একমাত্র উৎস। নীতিনির্ভর সমাজদর্শনই বর্তমান সভ্যতার সংকট থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে মানবেন্দ্রনাথের নব্যদর্শনে বস্তু অপেক্ষা ভাবেরই বেশি আতিশয্য এবং ব্যবহারিক দিক থেকে তা অকার্যকর। তাতে মনুষ্যপ্রকৃতির শুভসত্তার প্রতি অতি বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; মনুষ্যপ্রকৃতির দুর্বলতা ও পরিবেশের প্রতিকূলতাকে যথোচিত বিবেচনা করা হয় নি। বস্তুত মানবেন্দ্রনাথ নিজেও এ-সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। জলটুঙ্গির ঘরে বসে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে তিনি এই দর্শন উদ্ভাবন করেন নি। অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও বাস্তব বিশ্বের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সহযোগে তাঁর নব্যদর্শন রচিত হয়েছে। সারা জীবনের অনুপম অভিজ্ঞতাই মনুষ্যপ্রকৃতিতে তাঁর অটল আস্থা সৃষ্টি করে।

কোনো কোনো সমালোচকের মতে মানবেন্দ্রনাথের মননশীলতা ছিল বিশ্লেষণমূলক; দর্শনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো পথ তিনি সৃষ্টি করেন নি। এ-কথা যে নিতান্তই ভুল তা তাঁর সাম্প্রতিক কয়েকটি গ্রন্থই প্রমাণিত করে। 'Philosophical Consequences of Modern Science' নামে অমুদ্রিত বিশাল পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশিত হলে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার বিস্তৃততর পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। পূর্বতন চিন্তাধারার বিশ্লেষণের সঙ্গেই তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এক অভিনব দার্শনিক ধারার সূত্রপাত করেছেন। অবশ্য তাঁর চিন্তার কয়েকটি বিষয়ে অধিকতর বিশ্লেষণ ও বিস্তৃতিসাধনের দায়িত্ব ভবিষ্যৎ গবেষকদের উপর নির্ভর করছে।

ভারতীয় ভাবধারায় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যূথবাদী মনোভাব প্রবল। বস্তুনিষ্ঠ যুক্তিবোধ ও নৈতিকতার পরিসর সংকীর্ণ। মানবেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী দর্শন ও নীতিনিষ্ঠ রাষ্ট্রচিন্তায় স্বভাবতই দেশবাসী আকৃষ্ট হয় নি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানবেন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি সমসাময়িক প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত কর্ণপাত করেন নি। তাঁর 'ডিকলোনিজেশন থিওরি' এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম ও ভারতের স্বাধীনতার অনিবার্যতা সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অনেকে উপলব্ধি করেছেন।

মানবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতির যতই নির্ভুল বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকুন না কেন সাংগঠনিক প্রচেষ্টায় তিনি সফল হন নি। কারণ অবস্থাটা তাঁর আয়ত্তের অতীত ছিল। চিকিৎসক রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করলেও রোগীর সহযোগিতার অভাবে অনেক সময়ে চিকিৎসার বিধান নিষ্ফল হয়। কঠিন রোগেও যেমন মানুষ তাগাতাবিজ ও টোটকা চিকিৎসার ভরসায় বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাতে নিশ্চেষ্ট থাকে, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মানুষ ভাবাবেগ, অন্ধবিশ্বাস এবং অভ্যাসাশ্রয়ী দৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত না হওয়ায় বৈজ্ঞানিক রাজনীতিও নিষ্ফল হয়।

একমাত্র মানবেন্দ্রনাথই গান্ধীনীতির কাছে কোনো দিন নতি স্বীকার করেন নি। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর প্রভাব অপরিসীম। তাঁকে অস্বীকার করে ভারতীয় রাজনীতিতে টি'কে থাকা কঠিন। মানবেন্দ্রনাথ গান্ধীর শক্তিকে উপেক্ষা করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের উন্নত রাজনৈতিক ও সামাজিক ধারায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত তাঁর চিন্তা ও সাধনা এদেশের অপরিণত ও সংকীর্ণ রাষ্ট্রচেতনার পক্ষে অনুপযোগী প্রতিপন্ন হয়। জনচিত্তে সুলভ প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে কিছুটা আপস করে নিলে হয়তো তাঁকে কোনঠাসা হতে হত না। তিনি স'টকাট পথেও যেমন বিশ্বাসী ছিলেন না, তেমনি সত্য ও মিথ্যার মাঝে আপসের সেতুবন্ধ রচনারও বিরোধী ছিলেন। আশু কার্যকারিতার দৃষ্টিতে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বনে সুবিধাবাদী পন্থায় তাঁর রুচি ছিল না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাঁর সর্বাপেক্ষা অভিনবত্ব হল দলীয় রাজনীতি বর্জন। তিনি অনুভব করেন দলীয় রাজনৈতিক প্রথায় দলের সদস্যদের স্বাধীন চিন্তা ও মতামত উপেক্ষিত হয় দলেরই নির্দিষ্ট আদর্শের স্বার্থে। তাছাড়া কী ডিক্টেটরি, কী পার্লামেন্টারি প্রথায় সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার কোনো প্রত্যক্ষ সংবাদ থাকে না। মানবেন্দ্রনাথ প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য পরিপূরকস্বরূপ স্থানিক গণসমিতির (People's Committee) মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে ব্যক্তিমানুষই সার্বভৌমত্বের আধার ও উৎস। সে-সত্তা হস্তান্তরিত করা যায় না। প্রতিটি ভোটদাতা বা নাগরিকের দলনিরপেক্ষ শিক্ষা ও চেতনা গড়ে উঠলে তারা আর দলীয় রাজনীতির খেলার পুতুল হয়ে থাকবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাতেও কি শক্তিশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের প্রভাববিস্তার ও আধিপত্য বজায় রাখার সম্ভাবনা নির্মূল হয়?

তিনি দার্শনিক বা ভাববিপ্লবের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, যাতে মানুষ আত্মবিশ্বাস ও অসীম সৃজনসত্তার চেতনায় শক্তিসম্পন্ন হতে পারে। তাঁর দৃষ্টিতে সবকিছুর আশু পরিবর্তনের তাগিদে ক্ষমতা দখলকেই একমাত্র লক্ষ্য জ্ঞান করা অর্থহীন। রাজনৈতিক বিষয়ে মানুষের অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গি ও নিশ্চেতন মনোভাবের কারণ হল যথোচিত রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব। রাজনৈতিক শিক্ষায় তিনি চিন্তার স্বাধীনতা, যুক্তিবোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সমন্বিত মানবতন্ত্রী আদর্শসঞ্চারের প্রয়োজন অনুভব করেন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রশ্ন আজো বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে নি। মানবেন্দ্রনাথের বস্তুবাদী রাষ্ট্রদর্শনে এদুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মানুষ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অবিচার থেকে মুক্তি পায় নি। সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা অনুপস্থিত।

মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা হরণ নয়, জীবনের অবাধ বিকাশ ও পরিপূর্ণতার পথে সর্ববিধ প্রতিবন্ধকতা থেকে ব্যক্তিমানুষের মুক্তিই হল আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থার মানদণ্ড।

গান্ধীর সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিগত পার্থক্য থাকলেও দলীয় রাজনীতির অবসান, বিকেন্দ্রিত প্রশাসন, লক্ষ্য ও পদ্ধতির মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবহারিক দিক থেকে উভয়ের মিল অনস্বীকার্য। দৃষ্টিগত ত্রুটি সত্ত্বেও আন্দোলন, সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে গান্ধী কৃতকার্য হয়েছেন; মানবেন্দ্রনাথ হন নি। মানবেন্দ্রনাথের ছিল স্বচ্ছ চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি; পক্ষান্তরে গান্ধী ছিলেন সর্বাত্মক আন্দোলন ও সংগঠনশক্তির অধিকারী। তত্ত্বগত চিন্তা ও আলোচনায় মানবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি; ফলে তাঁর সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা দুর্বল থেকে যায়। অপরদিকে আন্দোলন, সংগঠন ইত্যাদি কাজে সময় অতিবাহিত হওয়ায় দার্শনিক ও তত্ত্বগত বিষয়গুলিকে তিনি বিস্তারিত করার অবকাশ পান নি।

মানবেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভূমিকা আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ফল বলে মনে হয়। কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্টবিরোধী সবাই তাঁকে সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু তাঁদের উপর তাঁর চিন্তার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁকে স্বীকৃতি না দিলেও তাঁরই চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি বিভিন্ন দল এবং জননেতা ক্রমে গ্রহণ করেছেন। বিশ্বের রাজনৈতিক ধারায় এখন এক সংকট দেখা দিয়েছে। সে-সংকটের কারণ সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের সম্ভাব্য সংঘর্ষ নয়। সে-সংকট মুক্তি ও মানবতার। কালোপযোগী এক সমাজদর্শনের সাহায্যেই তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। যুক্তি, নীতি ও মুক্তির আদর্শে রচিত মানবেন্দ্রনাথের সমাজদর্শন মননশীল মানবসমাজের কাছে একটি পথের সন্ধান দিয়েছে। সে-পথ উপযোগী ও কার্যকর কি-না তা ইতিহাসেই প্রমাণিত হবে।

উৎস নির্দেশ

১ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়। 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি'। ১৩৬৩। পৃ. ৬৫৮।
২. V. I. Lenin. *Selected Works.* Moscow. 1947. vol. 2. p. 658.
৩. Quoted from the Text of the Debate in: Helene Carrere d'Encausse and Stuart R. Schram. *Marxism and Asia* London. 1969. p. 154.
৪. V. I. Lenin. *Collected Works.* Moscow. 1966. v. 31. p. 242.
৫. *Ibid.*
৬. Jane Degras (ed). *The Cammunist International; 1919-22 Documents.* London, 1956. v. I. p. 139.

৭. Gangadhar M. Adhikari. *Communist Party and India's Path to National Regeneration and Socialism*. New Delhi. 1964. pp. 55-57.

৮. G. Adhikari. *Documents of the History of the Communist Party of India*. 1972. v. I. p. 231.

৯. Cecil Kaye. *Communism in India*. 1971. pp. 27, 50.

১০. Muzaffar Ahmad. *Myself and the Communist Party of India*. 1970. p. 413.

১১. *The Communist International between the Fifth and Sixth World Congresses*; 1924-28. London. CPGB. p. 473.

১২. M. N. Roy. *Selected Works*. 1988. v. II. pp. 608, 610, 612.

১৩. *International Press Correspondence*. v. 9, n. 69, 13 December 1929. p. 1470.

১৪. M. N. Roy. *New Humanism*. 1953. p. 39.

১৫. — · *Reason Romanticism and Revolution*. 1955. v. 2. p. 309.

১৬. — — *From Savagery to Civilisation*. 1940. p. 14.

১৭. ——— *Memoirs*. 1964. pp. 549-551.

১৮. Phillip Spratt and M. N. Roy. *Beyond Communism*. 1947. pp. 61-62.

১৯. M. N. Roy. "Humanism, Rationalism and Science", *Independent India*. v. I. n. 49. 21 December, 1947 and v. 12. n. 1, 4 January 1948. M. N. Roy. Editorial Notes, *The Marxian Way*. v. 3. n. 2. 1948-49. pp. 166-172.

২০ M. N. Roy. *Materialism*. p. 5. (footnote)

২১. ——— *Reason Romanticism and Revolution*. v. 1. p. 11.

২২. J. Stalin. 'Dialectical and Historical Materialism', in *Selected Works of Karl Marx*. Moscow. 1946. v. 2. p. 75.

২৩. Karl Marx. *Selected Works*. Moscow. 1946. v. 1. p. 300.

২৪. M. N. Roy. *Reason Romanticism and Revolution*. v. 1. p. 13.

২৫. Phillip Spratt and M. N. Roy. *op. cit*. p. 61.

২৬. M.N. Roy. *New Humanism*. p. 103.

২৭. *Ibid*. ২৮. *Ibid*. p. 105.

২৯. ——— *Reason, Romanticism and Revolution*. v. 2. p. 288.

৩০. *Ibid*. p. 307.

৩১. ——— *New Humanism*. p. 37.

৩২. ——— *Politics Power and Parties*; 1960; p. 34.

৩৩. ——— *New Humanism*. pp. 106-107.

৩৪. ——— *Politics Power and Parties*. p. 34.

৩৫. *Ibid*. pp. 33-40.

৩৬. Phillip Spratt and M. N. Roy. *op. cit*. 1947. p. 132.

৩৭. M. N. Roy. *Scientific Politics*. 1947. p. vii. ৩৮. *Ibid*. p. 55.

৩৯. ——— *New Orientation.* 1946. p. 56.
৪০. ——— *Scientific Politics.* 1947. pp. 16-17.
৪১. ——— *Politics, Power and Parties.* pp. 184-185.
৪২ *Ibid.* pp. 62-63. ৪৩. ——— *New Humanism.* pp. 34-35.
৪৪. ——— *Politics Power and Parties.* pp. 48-52.
৪৫. *Ibid.* pp, 58-60. M. N. Roy. *New Humanism.* pp. 44-45.
৪৬. *Ibid.* p. 95, ৪৭. *Ibid.* p. 70. ৪৮. *Ibid.* p. 97.
৪৯. ——— *New Humanism.* pp. 46-47.
৫০ ———*Fascism ; Its Philosophy, Professions and Practice.* 1938. p. 5. ৫১ *Ibid.* ৫২. *Ibid.*
৫৩. ——— *Materialism.* 1951. p. 237.
৫৪. ——— *Reason, Romanticism and Revolution.* v. 2. p. 249.
৫৫ ——— *Communist International.* 1943. p. 60.
৫৬ ——— *Fascism ; Its Philosophy, Professions and Practice.* p. 73.
৫৭. ——— *New Humanism.* p. 75.
৫৮. ——— *Indian Labour and Post-War Reconstruction.* 1943, pp. 7-8.
৫৯. *Ibid.* p. 23 ৬০. ——— *Politics Power and Parties.* p. 159.
৬১. *Ibid.* p. 160, ৬২. *Ibid.* p. 161. ৬৩. *Ibid.* p. 163.
৬৪. ——— *New Humanism*, pp. 56-57. ৬৫. *Ibid.* p. 75.
৬৬. V. I. Lenin. *Selected Works.* Moscow, 1947. p. 674.
৬৭. M. N. Roy and V. B, Karnik. *Our Differences.* 1938. p. 48.
৬৮. Phillip Spratt and M. N. Roy. *op. cit.* p. 87.
৬৯. M, N. Roy. *Politics Power and Parties.* p. 121.
৭০. *Ibid.* p. 118, ৭১. *Ibid.* p, 136. ৭২. *Ibid.* p. 59.
৭৩. M. N. Roy, 'Education of the Educators', *The Radical Humanist.*, 25 January, 1965. p. 37. ৭৪. *Ibid.* p. 38.
৭৫. ——— *Reason Romanticism and Revolution.* v. 2. pp. 219, 259.
৭৬. ——— *New Humanism.* pp. 18-29.
৭৭. ——— *Reason, Romanticism and Revolution*, v. 1. p. 11.
৭৮. *Ibid.* p. 10.
৭৯. M. N. Roy. *New Humanism.* pp. 16-17. M. N. Roy Editorial Notes. *The Marxian Way.* v. 2. n. 4. 1946-47. pp. 356-367: Editorial Notes, *The Marxian Way.* v. 1. n 3. pp. 273-276.
৮০. ——— *Reason, Romanticism and Revolution.* v. 2. pp. 304-305.
৮১. *Ibid.* pp. 212-213.
৮২. ——— *Politics, Power and Parties.* pp. 25-26.
৮৩, ——— *New Humanism.* pp. 26-31.
৮৪. ——— *Politics, Power and Parties.* p. 153.
৮৫. ——— *New Humanism.* p. 31.
৮৬. ——— *Politics, Power and Parties.* p. 73.
৮৭. ——— *New Humanism.* p. 25.

নির্ঘণ্ট